Rājendra Miśra Kṛta Abhirājasaptaśatīr(a) Kāvyatāttvik(a) Samīkṣā

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University
in partial fulfilment for the Award of the Degree of Ph.D. in Sanskrit

Submitted by

Aditya Narayan Barman

Registration No: A00SA1201218

Under the Supervision of

Dr. Shiuli Basu

Professor, Department of Sanskrit,
Jadavpur University

Jadavpur University

Kolkata

2024

Certificate

Certified that the Thesis entitled রাজেন্দ্র মিশ্র কৃত অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা, submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Shiuli Basu**, Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:
Shiuli Basu
Dated: 19.07.2024.

Professor, Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata- 700032

Candidate:
Aditya Narayan Barman
Dated: 19.07.2024

काश्मीरमस्तकवती हिमवत्किरीटा

गङ्गाकलिन्दतनयोभयनेत्रपद्मा।

देवप्रिया तमिलकेरलपादयुग्मा

भूर्भारती दिशतु मे नवसुप्रभातम्॥

----प्रभातमङ्गलशतक

ঋণ স্বীকার

এই গবেষণা-প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অবশ্য প্রয়োজন। এব্যাপারে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণা-কর্মের তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা ডঃ শিউলী বসু মহাশয়াকে। যাঁর পরামর্শ ব্যতীত এই কাজ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর শান্ত সুলভ উপদেশ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অভয় দান আমাকে প্রতিনিয়ত সাহস যুগিয়েছে। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম সহকারে কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ দেবার্চনা সরকার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা ডঃ মণিদীপা দাস, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ দীধিতি বিশ্বাস মহাশয়াকে। এই গবেষণা কর্মে তাঁদের পরামর্শ আমাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করেছে। মুরলীধর গার্লস কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায় মহাশাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কয়েক মাস আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরমধামে আশ্রয় নিয়েছেন। গবেষণা কর্মে তিনি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর ঋণ অনস্বীকার্য।

ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় প্রধান অশোক কুমার মাহাত মহাশয়কে। বিভাগীয় অধ্যাপিকা ডঃ কাকলী ঘোষ, ডঃ দেবদাস মণ্ডল এবং ডঃ চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়ের প্রতি সম্মননা পূর্বক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক শ্রুতি মল্লিক এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক নিমাই সরদার মহাশয়কে।

যিনি আমার প্রতিটি ব্যর্থতার সময় পাশে থেকে স্নেহের হাত বাড়িয়ে বলেছেন- গতস্য শোচনা নাস্তি। সাফল্যকে উদযাপন করেছেন অসীম আনন্দে, তিনি আমার বাবা স্বর্গীয় কমলাকান্ত বর্মন। মা সারথী দেবীর সুশীতল স্নেহস্পর্শ আমাকে এই কর্মে সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁদেরই সাফল্যের নামান্তর। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ধৃষ্টতা করব না। দিদি সন্তোষী, বড়দা দেব নারায়ণ, ছোটদা হরি নারায়ণ এরা সর্বদাই আমার শিক্ষাজীবনের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের চরণে প্রণতি জানাই। মাথাভাঙ্গা কলেজের সহকারী অধ্যাপক অগ্রজ প্রতীম বিশ্বজীৎ বর্মন (বিশ্বদা) কে ধন্যবাদ জানাই। তৎসঙ্গে নিকট আত্মীয় বর্গের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বয়স্য বর্গের মধ্যে ডঃ অধীর চন্দ্র দাস, ডঃ বিষ্ণুচন্দ্র বর্মন, ডঃ মহাদেব দাস, ডঃ বিশ্বজীৎ বর্মন এবং বিহার মহাত্মাগান্ধী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ বিশ্বজীৎ বর্মনকে যথাস্থানীয় সমাদর সহকারে ধন্যবাদ জানাই।

সব শেষে ধন্যবাদ জানাই চন্দ্রাণীকে। আমার দুঃসময়ে তার সহযোগিতা গবেষণা-কর্মকে অব্যাহত রাখতে প্রতিনিয়ত সাহস জুগিয়েছে।

ভবিষ্যতেও আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা লাভ করব। এই প্রত্যাশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে

আদিত্য নারায়ণ বর্মন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
সার্টিফিকেট	
ঋণ স্বীকার	
ভূমিকা	১-৯
প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১০-৮১
১.১ 'শত' সংখ্যার তাৎপর্য	১১
১.২ শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১২
১.৩ শতককাব্যের বিবর্তন	১৫
১.৪ শতককাব্যের শ্রেণীবিভাগ	২০
১.৫ শতককাব্যের উদ্দেশ্য	২১
১.৬ শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য	২১
১.৭ শতককাব্যের গুরুত্ব	২৪
১.৮ শতক সাহিত্যের ইতিহাস (খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত)	২৭
১.৯ শতক সাহিত্যের ইতিহাস: (খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতক – বিংশ/একবিংশ শতক)	৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা	৮২-১১৬
২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়	৮২
২.২ শিক্ষা	৮৩
২.৩ কর্মজীবন	৮৩
২.৪ সারস্বত সাধনা	৮৪

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু ১১৭-১৩৬

৩.১ নব্যভারতশতক ১১৭

৩.২ মাতৃশতক ১১৯

৩.৩ প্রভাতমঙ্গলশতক ১২২

৩.৪ সুভাষিতোদ্ধারশতক ১২৫

৩.৫ চতুর্থীশতক ১২৮

৩.৬ ভারতদণ্ডক ১৩০

৩.৭ সম্বোধনশতক ১৩২

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা ১৩৭-২৪৯

৪.১ ছন্দো বিশ্লেষণ ১৩৭

৪.২ অলংকার সমীক্ষা ১৫৫

৪.৩ রীতি বিচার ১৭৯

৪.৪ রস বিচার ১৯৬

৪.৫ ধ্বনি বিচার ২২৪

৪.৬ অভিরাজসপ্তশতীতে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার ২৩৩

৪.৭ ‘অভিরাজসপ্তশতী’ নামকরণের তাৎপর্য বিচার ২৩৫

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার ২৫০-২৬২

উপসংহার: ২৬৩-২৭০

গ্রন্থপঞ্জি: ২৭১-২৭৮

ভূমিকা

ভূমিকা

এই মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। সে শ্রেষ্ঠ তার চিন্তন ও মননশক্তির জন্য, উত্তরোত্তর উন্নততর অগ্রগতির জন্য। সভ্যতার আদি লগ্নে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতোই ছিল অসহায়। ধীরে ধীরে তারা বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদেরকে টিকিয়ে রেখেছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংকুলান করেছে। বিপদসংকুল প্রকৃতিকে বাসস্থানের উপযোগী করে তুলেছে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে যে, মানুষ শুধু খাওয়া-পরার জন্য বাঁচে না। চিন্তনশক্তিসম্পন্ন মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় নানান রহস্য। জীবনকে উপলব্ধি করেছে ভিন্নতর বিশিষ্টতায়। অন্বেষণ করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সত্য-পরম সত্যের, সৌন্দর্যের।

অপ্রকাশকে প্রকাশিত করার, অজানাকে জানার, আত্মবুদ্ধিকে পরার্থে উন্মোচিত করার জন্য প্রয়োজন শব্দ বা ভাষার। অর্থহীন শব্দ নিরর্থক। আবার শব্দ ছাড়া জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাই মানুষ আবিষ্কার করল ভাষা। মানবসভ্যতায় মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হল তার মুখের ভাষা। এই ভাষা মানুষকে দিয়েছে ব্যক্তিনিষ্ঠ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের বন্ধন। ভাষা হয়ে উঠেছে তার সার্বিক সত্তার প্রকাশক।

প্রকৃতির বিবিধ শক্তি মানুষের মনে জন্ম দিয়েছিল অপার বিস্ময়। প্রকৃতির বিধ্বংসী রূপ একাধারে যেমন ভয়ের জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে তার নয়নলোভনীয় সৌন্দর্যে মানুষ হয়েছে আপ্লুত। কালক্রমে তাদেরই সৃষ্ট ভাষা ধ্বনিমাধুর্য লাভ করেছে। জন্ম হয়েছে বৈদিক স্তোত্রসমূহের। জন্ম হয়েছে প্রথম পদ্যের। ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-

অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥[১]

বস্তুত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা সর্বমঙ্গলময়, সকলের নিয়ন্তা, বিশ্বের অধিদেবতার অন্বেষণ করেছে। তার স্তুতি করেছে। এস্কিমোরা শিকারে যাওয়ার সময় পশুর জন্য প্রার্থনা করত। আর্যরা ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার নিকট জগৎ ও জীবনের সার্বিক কল্যাণ কামনা করতেন। প্রাচীন ইজিপ্ট ও গ্রীসেও সূর্যের দেবত্ব সূচিত হয়েছে। এভাবেই এই

মহাবিশ্ব, তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী, নক্ষত্র-চন্দ্রালোকখচিত আকাশ, নদীর কলতান, বিহঙ্গের কাকলি, অরণ্যের মর্মরধ্বনি, হিংস্র পশুর গর্জন, চকিত প্রাণীর আর্তনাদ, ঋতুপরিবর্তনে প্রকৃতির বিচিত্র সমারোহ, সুখ-দুঃখ, উদ্বেগ-প্রশান্তি, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে।

একদিন মানুষ তার মুখের ভাষাকে লিখিতরূপ দিল। তারপর থেকে তারা তাদের চিন্তা-চেতনাকে লিখিত আকারে প্রকাশ করতে লাগল। কালক্রমে কাব্যের লিখিত রূপের সূচনা হল। তবে সমস্ত লেখাই কাব্যপদবাচ্য নয়। কাব্যগুণ সমন্বিত লেখাই কাব্য। শব্দ ও অর্থের মিলনে ভাবব্যঞ্জক ও চারু রচনাই কাব্য। তাই আচার্য কুন্তক বলেছেন- শব্দস্য শব্দান্তরেণ বাচ্যস্য বাচ্যান্তরেণ চ সাহিত্যং পরস্পরস্পর্ধিত্বলক্ষণমেব বিবক্ষিতম্।[২]

কাব্য বা সাহিত্যের বিষয় কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস হতে পারে না। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক সমালোচক সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত ইতিহাসকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করেননি। হয়ত তা প্রামাণিক বলাও সমীচীন নয়। কবির ভাষা হল মননের মহত্তম আকুতি। ঋষিপ্রজ্ঞার গরিমময় বাণী। কবির চিত্ত ভাবের তুরীয় রাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো বিচরণ করে। তাই বলা হয়েছে-

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।

যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥[৩]

একইভাবে মম্মট তাঁর *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলেছেন-

নিযতিকৃতনিযমরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।

নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জযতি॥[৪]

সদসৎ, সুন্দর-অসুন্দর, ভাল-মন্দ, বাস্তব-অতিবাস্তব- এই সমস্তকিছু নিয়েই কাব্যজগৎ। তাই মহর্ষি ভরত বলেছেন-

ন তচ্ছিল্পং ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।

জাযতে যন্ন নাট্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥[৫]

অর্থাৎ এমন কোনো শিল্প নেই, এমন কোনো শাস্ত্র নেই, এমন কলা ও বিদ্যা নেই যা নাট্যের (কাব্যের) বিষয় হতে পারে না। হায়! কবির দায়িত্ব বড়ই কঠিন।

বস্তুবাদীরা সমাজের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন সাহিত্যকে একদেশদর্শী সৃষ্টিরূপে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে আনন্দপ্রাপ্তি বা রসাস্বাদনই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। একইভাবে মার্ক্সবাদীরা সাহিত্যে রসের আস্বাদনকে গৌণ করে দেখেছেন। তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে সাহিত্যের বিষয় বা তত্ত্বের সামাজিক মূল্যবিচার। এই চিন্তা অবশ্য নতুন নয়। সাহিত্যকে ধর্ম, দর্শন, নীতির মানদণ্ডে বিচার করার ধারা প্লেটোর সময়কাল (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) থেকেই চলে এসেছে।

অলঙ্করণ বা বর্ণনকৌশল কাব্যকে ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি থেকে পৃথক করেছে। আচার্য ধনঞ্জয় তাঁর *দশরূপক* গ্রন্থে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সাহিত্য কখনই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস নয় এবং প্রত্যক্ষ সামাজিক আদর্শের দ্বারা সাহিত্য অনুপ্রাণিত হয় না। তাই তিনি তির্যক ভঙ্গিতে বলেছেন-

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু ব্যুতপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।

যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুস্তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়॥[৬]

অর্থাৎ যে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আনন্দের ধারা স্বরূপ রূপকে (কাব্যে) ইতিহাসাদির মতো কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তির অন্বেষণ করে থাকে, রসাস্বাদনে বিমুখ সেই ব্যক্তিকে নমস্কার।

সংস্কৃত কবি ও আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁদের মতে কাব্যে রসই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কবিগণ কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তাই আচার্য বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ করেছেন- *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।* অর্থাৎ রসোত্তীর্ণ বাক্য বা বাক্যসমষ্টিই হল কাব্য।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ এই রসময় কাব্যকে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা ও শ্রুতিগ্রাহ্যতা ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন- দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্যে রামপ্রভৃতি চরিত্রে রূপের আরোপ করা হয়। তাই একে রূপক বলা হয়। রূপকের দশটি ভাগ- নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন।[৭] অন্যদিকে উপরূপক অষ্টাদশ প্রকার। যথা-

নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ এবং ভাণিকা।[৮]

শ্রব্যকাব্য তিনপ্রকার- গদ্য, পদ্য ও মিশ্র। গদ্যকাব্য কথা ও আখ্যায়িকা ভেদে দু'প্রকার। ছন্দোবদ্ধ পদকে পদ্য বলা হয়। একক পদ্যকে বলা হয় মুক্তক। দুটি পদ্যের সমন্বয়কে যুগ্মক অনুরূপভাবে তিনটির সমন্বয়কে সন্দানিতক, চারটির সমন্বয়কে কলাপক এবং পাঁচটি মুক্তকের সমন্বয়কে কুলক বলা হয়। সর্গবন্ধ পদ্যকাব্যকে বলা হয় মহাকাব্য।[৯] যে কাব্য সর্গাদি দ্বারা বিভক্ত নয়, মুক্তকের দ্বারা সন্নিবেশিত, সেই কাব্যকে বলে মুক্তককাব্য। আচার্য বামন মুক্তক, যুগ্মকাদির প্রয়োগানুসারে কাব্যকে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।[১০] মহাকাব্য প্রভৃতির শ্লোকগুলি পরস্পর সাপেক্ষ হয়। তাই এগুলিকে বলা হয় নিবদ্ধকাব্য বা প্রবন্ধকাব্য। শতককাব্য, কোষকাব্য, অষ্টকাদি পরস্পর নিরপেক্ষ বা মুক্তক শ্লোকের দ্বারা বিন্যস্ত হয়। তাই এগুলিকে বলা হয় অনিবদ্ধকাব্য। গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে রচিত মিশ্রকাব্যকে বলা হয় চম্পূ। নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি রূপকে গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পদ্যাংশও থাকে। তাই আচার্য দণ্ডী এগুলিকেও মিশ্রকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন- *মিশ্রাণি নাটকাদীনি তেষামন্যত্র বিস্তরঃ*।[১১] আচার্যগণ ভাষাভেদে কাব্যকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা- সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং মিশ্র।[১২]

আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধের মূল গ্রন্থ *অভিরাজসপ্তশতী* গ্রন্থটি মূলত একটি কাব্যসংকলন। এই সংকলনে ছয়টি শতককাব্য ও একটি দণ্ডক রয়েছে। কাব্যগুলি যথাক্রমে- *নব্যভারতশতক*, *মাতৃশতক*, *প্রভাতমঙ্গলশতক*, *সুভাষিতোদ্ধারশতক*, *চতুর্থীশতক*, *ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতক*। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিভিন্ন সময়ে লিখিত এই কাব্যগুলিকে একত্রে *অভিরাজসপ্তসতী* নামে সংকলিত করেছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: *অভিরাজসপ্তসতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলির আলংকারিক সমীক্ষাই এই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সংস্কৃতপ্রেমী তথা সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের স্বল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। মহাকবি ভাস থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকীয় নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, মধুসূদন সরস্বতী, পন্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রমুখের কাব্য সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তৎপরবর্তী কালেও সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্রচর্চা অব্যাহত ছিল। কিন্তু সেই ধারার খোঁজ অনেকেই রাখেননি। অষ্টাদশ শতক ও তৎপরবর্তী কালের কাব্যসম্ভার সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম ধারণা রয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই

সংস্কৃত কাব্যচর্চার গতিশীলতা সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করবেন না। স্নাতকোত্তরে কাব্য বিষয়ে পড়ার সময়ে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে জানার অবকাশ ঘটে। সীতানাথ আচার্য, তারাপদ ভট্টাচার্য, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, ক্ষমা রাও, দীপক ঘোষ, প্রমুখ কবিগনের কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাই। ধীরে ধীরে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি জিজ্ঞাসা জন্ম নেয়। তার ফলস্বরূপ *অভিরাজসপ্তশতীর* সমীক্ষামূলক গবেষণার সূত্রপাত।

আলোচ্য শতককাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ, রীতি, রস, ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা এই গবেষণা-প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে সামাজিক মূল্য বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। এই গবেষণা-প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক সমাজ কবির অন্যান্য শতককাব্য তথা দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য (মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্য-গীতিকাব্য) সম্বন্ধেও জানতে পারবেন।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে 'আধুনিক' শব্দের দ্বারা বিংশ-একবিংশ শতক পর্যন্ত কালসীমাকে ধরা হয়েছে।

শতককাব্য বিষয়ক পূর্ববর্তী সমীক্ষা কর্ম: শতককাব্য রচনার ধারা যেহেতু সুপ্রাচীন, তাই স্বাভাবিকভাবেই শতককাব্য অবলম্বনে ইতিপূর্বে অনেক গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়েছে। শতক-সম্বন্ধীয় কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করা হল-

১. Quackenbas, *The Sanskrit Poems of Mayura*, Columbia University, 1917. এই গবেষণা-প্রবন্ধে কবি ময়ূর রচিত *সূর্যশতক* বিষয়ক আলোচনা করেছে। সূর্যশতকের কাব্য-সুষমা, ছন্দো, অলংকার, শব্দপ্রয়োগ, রসময়তা প্রভৃতির সমীক্ষা করা হয়েছে।

২. Ramamurti K.S, *Satakas in Sanskrit Literature*, Sri Venkateshwar University Journal, vol.I, 1958. ডঃ রামমূর্তি কৃত এই গবেষণায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শতককাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা রয়েছে।

৩. Bhattacharji, Sukumari, *A survey of Sataka Poetry*, Sahitya Akademi Journal, vol. 23, No. 5, 1980. এই প্রবন্ধে সুকুমারী ভট্টাচার্যি মূলত স্বল্প পরিসরে সংস্কৃত শতককাব্যগুলির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগত রূপরেখা অংকন করার চেষ্টা করেছেন। এখানে বিভিন্ন শতককাব্যের উল্লেখযোগ্য শ্লোকগুলির রসময়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

৪. Chakraborty, Aparna, *A Critical Study of Govardhana's Aryasaptasati*, University of Burdwan, 1982. এই প্রবন্ধে আচার্য গোবর্ধন বিরচিত *আর্যাসপ্তশতীর* আংকারিক সমীক্ষা যথা শব্দ প্রয়োগ, ছন্দো, অলংকার, রসের সমীক্ষা করা হয়েছে।

৫. Paraddi, M.B, Satak in Sanskrit Literature, Karnataka University, 1983. মল্লিকার্জুন পরাড্ডি কৃত এই গবেষণা-প্রবন্ধে হালের *গাহাসত্তসঈ* থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের আধুনিক প্রেক্ষাপটে রচিত শতককাব্যগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৬. রাই, নারায়ণ, *গাথাসপ্তশতী অউর বিহারী সতসই: প্রেরণা অউর প্রভাব সাম্য কী দৃষ্টি সে তুলনাত্মক অধ্যয়ন,* বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯. হালের *গাহাসত্তসঈ* যেমন প্রাকৃত কবিতা-সংকলনরূপে কাব্যরসিকদের আনন্দ দিয়েছে, তেমনই বিহারীলাল রচিত *বিহারী সতসইও* হিন্দী কাব্য-সংকলন হিসেবে বিখ্যাত। উভয় কাব্যই শৃঙ্গার রসাত্মক এবং উভয়ের শ্লোকসংখ্যা ও বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় *গাহাসত্তসঈ* ও *বিহারী সতসই* এর তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে।

৭. মণ্ডল, রণবীর, *হালের গাথাসপ্তশতী: একটি সমীক্ষা,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

৮. মিশ্র, রুদ্রনারায়ণ, *শ্রীজগন্নাথসম্বন্ধানাং শতককাব্যানাং সমীক্ষণম্,* রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, তিরুপতি, ২০১৬. এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহিমা অবলম্বনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ও অর্বাচীন শতককাব্যগুলির সমীক্ষা করা হয়েছে। এখানে বিংশ এবং একবিংশ শতকে রচিত শ্রীজগন্নাথ বিষয়ক শতককাব্যগুলিরও আলোচনা করা হয়েছে।

রাজেন্দ্র মিশ্রের শতককাব্য অবলম্বনে বিশদে কোনো গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য তথা কথাকাব্য বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় কবিকর্মের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে শতকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু সেগুলির আলংকারিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। এই গবেষণা-প্রবন্ধে তাঁর রচিত শতককাব্যগুলির অন্তর্গত নির্বাচিত শতক-সংকলন *অভিরাজসপ্তশতী* সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন:

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু।

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা।

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্য বিচার।

উপসংহার

অধ্যায় ভিত্তিক বিষয়বস্তু:

প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: এই অধ্যায়ে শতককাব্যের ধারণা, শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং কোষকাব্যের সঙ্গে শতককাব্যের বৈসাদৃশ্য, শতককাব্যের শ্রেণীবিভাগ, গুরুত্ব তথা প্রাচীন ও অর্বাচীন শতককাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা: এই অধ্যায়ে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন তথা সারস্বত সাধনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু: তৃতীয় অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, ভারতদণ্ডক* তথা *সম্বোধনশতকের* বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা: এই অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ, রীতি, রস ও ধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আলোচ্য শতককাব্যগুলির বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার: এই অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীতে* প্রতিফলিত কবির সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার: উপসংহার অংশে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: রাজেন্দ্র মিশ্র রচিত শতককাব্যের সংখ্যা অদ্যাবধি প্রায় ষাটটিরও বেশী। গবেষণার বিষয়কে নাতিদীর্ঘ রাখার জন্য আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে কেবলমাত্র *অভিরাজসপ্তশতীতে* সংকলিত কাব্যগুলি গৃহীত হয়েছে। আলংকারিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ-রীতি, রস ও ধ্বনির আলোচনা করা হয়েছে। কাব্যগুলির ব্যাকরণগত ও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা হয়নি।

গবেষণা পদ্ধতি ও লিখন প্রণালী: তিরুপতি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে *অভিরাজসপ্তশতী* শীর্ষক কাব্যসংকলনটির একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীকালে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের সঙ্গে দূরভাষ মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পন্ন হয় এবং তিনি ডাকযোগে গ্রন্থটির একটি মুদ্রিত কপি পাঠিয়ে দেন।

অভিরাজসপ্তশতী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি তিথিতে, এলাহাবাদের বৈজয়ন্ত প্রকাশনী থেকে।

গ্রন্থে সংকলিত কাব্যগুলির যথাসাধ্য অধ্যয়ন ও অনুশীলন করে সেগুলির কাব্যতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ছন্দো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আচার্য গঙ্গাদাস কৃত *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের লক্ষণ গৃহীত হয়েছে। কেবল দণ্ডকের লক্ষণসঙ্গতির জন্য কেদারভট্ট কৃত *বৃত্তরত্নাকর* গ্রন্থের সহায়তা গৃহীত হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের লক্ষণানুসারে *অভিরাজসপ্তশতীতে* প্রযুক্ত অলংকার, গুণ, রীতি ও রসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামগ্রিক বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণ করে বিভিন্ন শতককাব্যগুলির সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রবন্ধটি লিখনের ক্ষেত্রে ইউনিকোড বাংলা টাইপিং এবং কালপুরুষ ফন্ট ব্যবহৃত হয়েছে। মূল লেখার ক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ ১৪ এবং তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১২ ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত লিখনের ক্ষেত্রে বাংলা লিপি ব্যবহৃত হয়েছে এবং য়, ড়, ঢ় এই বর্ণগুলি বর্জিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধটি MLA Handbook, 8th Edition এর নিয়মানুসারে লিখিত হয়েছে। তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে অন্ত্যটীকা ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে কোনো গ্রন্থের সাংকেতিক নাম ব্যবহৃত হয়নি। তাই সংকেতসূচী সংযোজিত হয়নি।

অন্ত্যটীকা

---

১. ঋগ্বেদ-সংহিতা ১. ১. ১

২. বক্রোক্তিজীবিত ১. ২০

৩. অগ্নিপুরাণ ৩৩৯. ১০

৪. কাব্যপ্রকাশ ১. ১

৫. নাট্যশাস্ত্র ১. ১১৬

৬. দশরূপক ১. ৬

৭. নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যাযোগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥ সাহিত্যদর্পণ ১. ৩

৮. নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকং চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥ তদেব, ১. ৪-৫

৯. ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেন মুক্তেন মুক্তকম্।
দ্বাভ্যাং তু যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিরিষ্যতে॥
কলাপকং চতুর্ভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্।
সর্গৰন্ধো মহাকাব্যং॥ তদেব, ৬. ৩১৪-১৫

১০. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ৩. ২৭

১১. কাব্যাদর্শ ১. ৩১

১২. তদেতদ্বাঙ্ময়ং ভূযঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রং চেত্যাহুরার্যাশ্চতুর্বিধম্॥ তদেব, ১. ৩২

প্রথম অধ্যায়

শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায় : শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

গাহাসত্তসঈ এর গাথায় 'শতক' (সপ্তশতক) শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। *গাহাসত্তসঈ* এ প্রতিটি শতকের শেষে- *রসিকজনহৃদযদযিতে কবিবত্সলপ্রমুখসুকবিনির্মিতে। সপ্তশতকে সমাপ্ত.....* প্রভৃতি গাথাটি পাওয়া যায়। আবার, *অমরুশতকের* বিখ্যাত টীকাকার বেমভূপাল তাঁর *শৃঙ্গারদীপিকা* টীকায় *শতককাব্য* নামটির অবতারণা করেছেন। *শতককাব্য* বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি; তা হল একশত বা তার বেশি শ্লোকের দ্বারা নিবদ্ধ মুক্তককাব্য অর্থাৎ যে পদ্যকাব্যগুলি সর্গাদির দ্বারা বিভক্ত না হয়ে একশত বা ততোধিক মুক্তকে বিন্যস্ত হয়; তাকে শতককাব্য বলে। তবে *অমরুশতকের* প্রাচীন টীকাকার রবিচন্দ্র তাঁর *কামদা* টীকায় শতক বলতে একশত শ্লোকবিশিষ্ট মুক্তককাব্যকেই বুঝিয়েছেন।[১] আবার ডঃ সুশীলকুমার দে'র মতে শতকের অর্থ হল সাধারণত কোনো একজন কবির রচিত ১০০টি মুক্তকের সমন্বয়।[২] এই বৈশিষ্ট্য একাধিক কবির মুক্তকের সংকলন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শতককাব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

তবে, শতককাব্যে একশত শ্লোকই যে থাকবে- তা দাবী করা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রাচীন শতকেরই শ্লোকসংখ্যা একশতের বেশি। *গাহাসত্তসই, শৃঙ্গার-নীতি-বৈরাগ্যশতক, অমরুশতক* প্রভৃতি শতকগুলিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। এই মতের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিও রয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে এই শতকগুলির শ্লোকের ক্রম ও ক্রমসংখ্যা বিভিন্ন। উদাহরণরূপে *অমরুশতকের* বিভিন্ন সংস্করণের শ্লোকসংখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। *অমরুশতকের* পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণে ৯৯ টি শ্লোক, দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে ১০১ টি শ্লোক, উত্তর ভারতীয় সংস্করণে ১০০ টি শ্লোক এবং মিশ্র সংস্করণে ১১৪ টি শ্লোক পাওয়া যায়। এই যুক্তিকে পাথেয় করে অনেকে মনে করেছেন যে, মূল শতকগুলি হয়ত একশত শ্লোকেই নিবদ্ধ ছিল, কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে সেগুলির ক্রম ও সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে হালের শতক প্রসঙ্গে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন- *although it is probable that Hala's seven centuries, in the main form an anthology. The form, however, allows easy interpolation; and most of the early Satakas contain much more than a hundred stanzas. It is not always possible, however, for several reasons to separate the additions with certainty, and arrive at a definitive text……*[৩]

প্রাচীন শতকসমূহের ক্ষেত্রে কালক্রমে শ্লোকের সংযোজন ও বিয়োজন যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও অর্বাচীন শতকগুলির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ-একবিংশ শতকে রচিত শতককাব্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে এমন অনেক আধুনিক শতককাব্য রয়েছে যেগুলির শ্লোক সংখ্যা একশতের বেশী।

১.১ 'শত' সংখ্যার তাৎপর্য:

এখন প্রশ্ন হল, শতককাব্যের শ্লোকে যদি শত সংখ্যার তারতম্য থাকে, তবে এই 'শত' সংখ্যাটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী? এই প্রশ্নের কোনো অলংকারশাস্ত্রীয় উত্তর নেই। শত সংখ্যার মাধ্যমে কাব্যিক সৌন্দর্য যে বৃদ্ধি পাবে- এরকমও কোনো যুক্তি নেই, কারণ শতককাব্যের শ্লোকগুলি প্রত্যেকটি মুক্তক শ্লোক। এই মুক্তক শ্লোকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্থাৎ মুক্তকের রসময়তা প্রায়শই পূর্বাপর কোনো প্রসঙ্গ বা বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। মণি-মানিক্যের মতোই মুক্তক সর্বদা স্বয়ংপ্রভ ও সমুজ্জ্বল।

'শত' সংখ্যার তাৎপর্য প্রসঙ্গে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেছেন- *It should be noted that wherever we find Satakas like Srngara-sataka, Amaru-sataka and the like the number may be 100, less or more, the word "hundred" being used in the sense of many.*[৪]

তিনি বস্তুত প্রাচীন শতককাব্যগুলির শ্লোকসংখ্যার অনির্দিষ্টতা দেখে মনে করেছেন যে, *শত* শব্দটি অনেকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সংখ্যার ভিত্তিতে শতক নামকরণ করা হলেও অধিকাংশ শতকে নির্দিষ্ট মাত্রায় একশত শ্লোক পাওয়া যায় না। এ থেকে মনে হয় 'শত' শব্দটি একটি অনুমানযোগ্য শ্লোকসংখ্যাকে বোঝানোর জন্য অথবা এককরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে-

পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্। নন্দাম শরদঃ শতম্। মোদাম শরদঃ শতম্। ভবাম শরদঃ শতম্। শৃণবাম শরদঃ শতম্। প্রব্রবাম শরদঃ শতম্। অজীতাঃ স্যাং শরদঃ শতম্। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে॥[৫]

এখানে *শতম্* শব্দের দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপীত্বকেই বোঝানো হয়েছে, নির্দিষ্ট করে শত বৎসরকে বোঝানো হয়নি। অনুরূপভাবে কাব্যে অপশব্দ প্রয়োগে মাঘ ও ভারবির তুলনা করতে জনৈক কাব্যসমালোচকের সেই উক্তি- *অপশব্দং শতং মাঘে ভারবে তু শতত্রয়ম্*। বলাই বাহুল্য, এখানে 'শত' শব্দটি একটি আনুমানিক সংখ্যাকে বোঝাচ্ছে, যার দ্বারা অপশব্দ প্রয়োগে মাঘ ও ভারবির তুলনা করা হয়েছে মাত্র।

কোনো কোনো গবেষক ও কাব্যসমালোচক মনে করেন, যেহেতু *শত* সংখ্যাটি পবিত্র সংখ্যারূপে পরিচিত। তাই এর অবতারণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যির মত উল্লেখযোগ্য- *Seven was a holy number signifying completeness (cf. Saptarsi, saptadvipa, saptasamudra, etc) and hundred was another holy number of completeness, hence the Saptasati.*[৬]

লৌকিক ব্যবহারেও আমরা এর প্রমাণ পেয়ে থাকি। যেমন বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বয়ঃকনিষ্ঠ বা শিষ্য-পুত্রের প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপে শতবর্ষ জীবিত থাকার কথা উচ্চারণ করেন অথবা গৃহবধূকে শত সন্তান লাভের আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। এবিষয়ে গবেষক মল্লিকার্জুন পরাড্ডি (Dr. Mallikarjun Paraddi) সুকুমারী ভট্টাচার্যির মতের অনুকূল মত প্রকাশ করেছেন এবং সমকালোপযোগী উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন– *Sata (hundred) is usually an ideal number. Even today a cricket-player, scoring hundred or more runs is very much extolled.*[৭]

১.২ শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

মুক্তক সংকলনের ধারণা অনেক প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বিভিন্ন ঋষি-প্রোক্ত বিভিন্ন সময়ের মন্ত্র ও সূক্তের সমন্বয় রয়েছে। সামবেদে কেবল গীতিধর্মী 'ঋক্' সমূহের সংগ্রহ রয়েছে। আবার অথর্ববেদে ঋক, যজু ও সামবেদের মন্ত্র সংগৃহীত রয়েছে।

নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক শতককাব্যের উৎস বৈদিক সাহিত্যের নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক মন্ত্রসমূহ। বেদের বিভিন্ন সূক্তে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, ঊষা, বরুণ প্রমুখ দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে উপনিষদে বিপুল সংখ্যক মন্ত্র রয়েছে যেগুলি কেবল আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনাতেই নয়, উপরন্তু সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধনেও

অদ্বিতীয়। পরবর্তীকালে বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু মন্ত্র সুভাষিতাকারে সংকলিত হয়েছে। অনেকে ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডল, অথর্ববেদের শতরুদ্রীয় প্রভৃতিকে শতশ্লোক বিশিষ্ট মুক্তককাব্য রচনার প্রেরণা মনে করেছেন।

মুক্তকের প্রধান এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা। পুরাণ, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূকাব্য তথা দৃশ্যকাব্যে অনেক শ্লোক রয়েছে যেগুলি স্বসংসম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ। শ্লোকগুলি প্রসঙ্গের দিক থেকে মুক্তক হিসেবে বিবেচিত না হলেও বিষয়বস্তুর নিরিখে মুক্তকের বৈশিষ্ট্য বহন করে। অধুনা লব্ধ অনেক সুভাষিত-সংগ্রহে বিভিন্ন দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের শ্লোক সংকলিত হয়েছে। বস্তুত যে শ্লোকগুলি দেশ, কাল ও ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতির উপরে গিয়ে সার্বজনীন ও সর্বকালীন অবদান রাখে; সেগুলিকে বলা যেতে পারে যথার্থ মুক্তক শ্লোক। আবার সেই শ্লোকগুলি যখন দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যগুলির বিষয়কে ভাবোত্তীর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়; তখন সেগুলিকে মুক্তক বলা যায় না। তাই মুক্তককাব্য রচনার প্রবণতা কোনো বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র বিষয় নয়। রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসায়* বলেছেন-

মুক্তকে কবযোঽনন্তাঃ সংঘাতে কবযঃ শতম্।

মহাপ্রৰন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ বা দুর্লভাস্ত্রয়ঃ*॥[৮]

অর্থাৎ মুক্তক রচয়িতা কবি অসংখ্য, সংঘাত রচয়িতা প্রায় শতসংখ্যক। মহাপ্রবন্ধ বা মহাকাব্য রচয়িতা কবি এক-দু'জন, তিনজন অতি দুর্লভ।

রাজশেখরের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে *গাহাসত্তসঈ* বা তার পূর্ববর্তীকালে অনেক কবি ছিলেন যারা মুক্তক রচনা করতেন। তাছাড়া *গাহাসত্তসঈ* শতককাব্যে অনেক অখ্যাত কবির মুক্তকের সংকলন এই ধারণাটিকে আরও সুদৃঢ় করে। *গাহাসত্তসঈ* এর একটি গাথা এবিষয়ে প্রামাণ্য হতে পারে-

সপ্তশতানি কবিবৎসলেন কোটের্মধ্যে।

হালেন বিরচিতানি সালংকারাণাং গাথানাম্॥[৯]

অতএব, খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক বা তার পূর্ববর্তী সময় ধরে মুক্তক রচনার প্রবণতা বর্তমান ছিল।

মহাকবি কালিদাসের জীবনীসংক্রান্ত একটি কিংবদন্তী রয়েছে যে, সিংহলরাজ কুমারদাস তাঁর জনৈকা রক্ষিতার বাড়ির দেওয়ালে *কমলে কমলোৎপত্তি শ্রুযতে ন চ দৃশ্যতে।* এই শ্লোকাংশটি লিখে দেন এবং ঘোষণা করেন, যে এই শ্লোকাংশটি সম্পূর্ণ করতে পারবে, রাজা তাকে পুরস্কারস্বরূপ অর্থ দান করবেন। পরে কালিদাস তা সম্পূর্ণ করেন- *বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বযম্॥* যা থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা প্রবন্ধজাতীয় পদ্য রচনায় কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও হতো। অধিকাংশ সময় রাজারা হতেন সেই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপক।

শ্লোকসংখ্যার ভিত্তিতে কাব্যের বা কাব্যাংশের নামকরণও প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষ করে উপনিষদ, পুরাণ, মহাকাব্য, বিবিধ দেব-দেবীর স্তুতি, শক্তিবর্ণন, নামকীর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পঞ্চক, অষ্টক, দণ্ডক, শতনাম, অষ্টোত্তরশতনাম, সহস্রনাম, অষ্টোত্তরসহস্রনাম প্রভৃতি সংখ্যাভিত্তিক শ্লোকবিন্যাস ও নামকরণের প্রমাণ মেলে। বাল্মীকীয় *রামায়ণে* চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে; তাই *রামায়ণকে চতুর্বিংশতিসাহস্রীসংহিতা* বলা হয় এবং একই নিয়মে বৈয়াসিক *মহাভারত শতসাহস্রীসংহিতা* নামে পরিচিত। হতে পারে, এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুক্তক রচয়িতাগণ শতশ্লোক সমন্বিত মুক্তককাব্যের নামকরণ করেছেন শতক। অনুরূপভাবে দ্বিশতী, ত্রিশতী, পঞ্চাশতী, সপ্তশতী ইত্যাদি নামকরণ করেছেন।

বৌদ্ধসাহিত্যের *ধম্মপদ* মুক্তক-সংগ্রহের একটি বড় নিদর্শন। 'ধম্ম' শব্দের অর্থ নীতি বা জীবনধারণের নীতি। 'পদ' শব্দের অর্থ পথ বা উপায়। এই সংগ্রহে ভগবান বুদ্ধের বাণীগুলি পদ্যাকারে সংকলিত হয়েছে। *ধম্মপদ* খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে। তার লিখিতরূপ দেওয়া হয় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে।

তৎকালীন ভারতবর্ষ ব্যতীত প্রাচীন গ্রিস ও চিনে মুক্তক রচনা ও সংকলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। ৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রাচীন গ্রিসে ছোট ছোট কবিতা (Epigram) সংকলনের রীতি প্রচলিত ছিল। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি হল *Garland of Meleagar*। প্রাচীন রোমেও ক্ষুদ্র কবিতা-সংকলিত হতো। দুটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল *Epigrammata et Poemata Vetera* এবং *Anthologia Latina*। এই সংকলনগুলির কিছু কিছু ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম অজ্ঞাত থাকত। সেগুলিকে বলা হতো *Fragmenta adespota (Fragments of unknown Poets)*।[১০]

খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে চিনে স্বয়ংসম্পূর্ণ মুক্তক রচনার প্রচলন ছিল। এই মুক্তকগুলি একাধারে জীবনধর্মী ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন। রাজা টেং (T'ang) এর রাজত্বকালে এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময় ভারত ও চিনের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক ছিল। এজাতীয় মুক্তক সংস্কৃত কবিগণকে শতককাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।[১১]

১.৩ শতককাব্যের বিবর্তন:

শতককাব্যের রচনাকাল অনেক বিস্তৃত। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য কাব্যধারার মতো শতককাব্যের ধারা অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত এই ধারা বিস্তৃত। তাই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক- এই বিস্তৃত কালপরিক্রমায় শতকগুলির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়েছে কি না- তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শতক *গাহাসত্তসঈ* (খ্রিস্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) শৃঙ্গার রসাত্মক। এই শতকের শ্লোকে শ্লোকে নর-নারীর অনুরাগ, প্রেম, প্রেমজনিত ঈর্শা, পরকীয়া, মান-অভিমান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে ভর্তৃহরি রচিত *শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক* ও *বৈরাগ্যশতকে* প্রেম, নৈতিকতা ও অধ্যাত্মচিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। আবার এই সময়ের কবি বাণের *চণ্ডীশতক* ও আনন্দবর্ধনের (নবম শতক) *দেবীশতকে* মা চণ্ডিকার স্তুতি এবং কবি ময়ূরভট্টের *সূর্যশতকে* সূর্যদেবের স্তুতি রয়েছে। অষ্টম শতকের *অমরুশতক* এবং একাদশ শতকের *আর্যাসপ্তশতী* শৃঙ্গাররসাত্মক। বস্তুত সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রাচীন শতকগুলিতে প্রেমমূলক, ভক্তিমূলক ও নীতিমূলক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই ধারা তৎপরবর্তীকাল থেকে আধুনিক কালের বিভিন্ন শতকেও বর্তমান রয়েছে। যেমন ষোড়শ শতকীয় কবি অপ্পয্য দীক্ষিতের *বৈরাগ্যশতক,* সপ্তদশ শতকীয় কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের *সভারঞ্জনশতক* এবং অষ্টাদশ শতকীয় কবি গুণমণি বা গুমাণির *উপদেশশতকে* নীতি উপদেশমূলক মুক্তকের সমন্বয় দেখতে পাই।

উপদেশমূলক শতককাব্যের মধ্যে একটি বিশেষ ধারা হল অন্যোক্তিমূলক শতককাব্য। কবির বক্তব্য যখন প্রস্তুত বিষয় বা বস্তুকে অতিক্রম করে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুতে প্রযুক্ত হয়; তখন তাকে অন্যোক্তি বলা হয়। অধ্যাপক ডেনিয়েল হেনরি হোমস ইংগলস (Daniel Henry Holmes Ingalls) অন্যোক্তিমূলক পদ্যগুলি সম্বন্ধে বলেছেন- *The characteristic of these verses is that the persons or situation expressly described serve to suggest some*

other persons or situation which are not mentioned but to which the moral or point of the verse applies.[১২]

অর্থাৎ এই পদ্যগুলির বৈশিষ্ট্য হল কোনো অন্য অপ্রস্তুত বিষয় বা বস্তুকে দ্যোতিত করার জন্য প্রস্তুত ব্যক্তি বা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়। পদ্যে যার উল্লেখ থাকে না অথচ তার জন্যই ভাবাত্মক পদ্যটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যোক্তিমূলক বাক্য, বাক্যাংশ অথবা শ্লোকের ব্যবহার অনেক প্রাচীন। বিশেষ করে রূপকের পতাকাস্থানক বা পতাকাস্থান নামক নাট্যোক্তির ক্ষেত্রে অন্যোক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। আচার্য ধনঞ্জয় পতাকাস্থানের লক্ষণ করেছেন-

প্রস্তুতাগন্তুভাবস্য বস্তুনোঽন্যোক্তিসূচকম্।

পতাকাস্থানকং তুল্যসংবিধানবিশেষণম্॥[১৩]

অর্থাৎ যেখানে প্রস্তুত বস্তু বা বিষয়ের সমান বৃত্ত বা সমান বিশেষণ দ্বারা অন্যোক্তিময় বস্তু বা বিষয়ের সূচনা করা হয়; তাকে পতাকাস্থান বলা হয়। যেমন *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকে হংসপদিকার সেই গান-

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো
মধুকর বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্॥[১৪]

এখানে প্রস্তুত বিষয় মধুকর। অপ্রস্তুত বিষয় হল রাজা দুষ্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে এখানে ভ্রমরের মধুকরবৃত্তির দ্বারা দুষ্যন্তের চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই অন্যোক্তিকে অবলম্বন করে বেশ কিছু শতককাব্য রচিত হয়েছে, যেগুলি অন্যোক্তি, অন্যাপদেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত। হাল রচিত *গাহাসত্তসঈ* কিংবা গোবর্ধনের *আর্যাসপ্তশতীতে* অন্যোক্তির প্রয়োগ কদাচিত দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম অন্যোক্তিমূলক শতককাব্য হল নবম শতকীয় (৮৮৩-৯০২ খ্রিস্টাব্দ) কবি ভল্লটের *ভল্লটশতক*। অন্যোক্তিমূলক শতক রচয়িতাগণের মধ্যে নারায়ণ দাস, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, গির্বাণেন্দ্র দীক্ষিত (নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের

তৃতীয় পুত্র) মধুসূদন, রুদ্রমাণিক্য, শ্রীনিবাস, মোহনশর্মা, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, রঘুবীর, সোমনাথ, শম্ভুকবি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথ পণ্ডিত বিরচিত *ভামিনীবিলাস* বা *অন্যোক্তিবিলাস* অথবা *প্রাস্তাবিকবিলাস* অন্যোক্তিমূলক শতককাব্যের অন্তর্ভুক্ত। যদিও হাল রচিত *গাহাসত্তসঈ* এ অন্যোক্তির প্রয়োগ রয়েছে কিন্তু একনিষ্ঠ অন্যোক্তিমূলক মুক্তককাব্যের সূচনা খ্রিস্টিয় নবম শতক থেকে শুরু হয়। এই অন্যোক্তিমূলক শতককাব্য রচনার ধারা আধুনিক কালেও বর্তমান রয়েছে। আধুনিক কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের *চতুর্থীশতক* একটি অন্যোক্তিমূলক শতককাব্য।

রামচন্দ্র কবির (ত্রয়োদশ শতক) *ভক্তিশতক*, আচার্য গঙ্গাদাসের (ত্রয়োদশ- পঞ্চদশ শতক) *কংশারিশতক*, অজ্ঞাতনামা কবির (পঞ্চদশ শতক) *গোরক্ষশতক*, একবিংশ শতকের কবি মহেশ ঝা রচিত *চণ্ডিকাশতক* প্রভৃতি শতকগুলি ভক্তিমূলক।

জনার্দন ভট্ট (ত্রয়োদশ শতক) ও ধনদরাজ (পঞ্চদশ শতক) বিরচিত *শৃঙ্গারশতক*, নীলকণ্ঠ শুক্লা (সপ্তদশ শতক) বিরচিত *অধরশতক* বা *ওষ্ঠশতক*, মল্লভট্ট (সপ্তদশ শতক) বিরচিত *স্তনশতক*, পরমানন্দ (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) বিরচিত *শৃঙ্গারসপ্তশতিকা* শৃংগার রসাত্মক শতককাব্য।

এই শতকগুলির বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে শতক রচনার প্রথম সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রেম-নীতি-স্তোত্রমূলক শতককাব্য রচিত হয়ে এসেছে।

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী সময়কালকে অনেক কাব্যসমালোচক কৃত্রিমতার যুগ বলেছেন। এই সময়ে অনেক কবি তাঁদের কাব্যে শাস্ত্রীয় বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। যার ফলে ভাস, কালিদাস প্রমুখ কবিগণের কাব্যের যে স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা ছিল; তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে। শতককাব্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ময়ূরভট্ট রচিত *সূর্যশতকে* এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও কবি শম্ভু রচিত *অন্যোক্তিমুক্তালতা*, জনার্দন ভট্ট রচিত *শৃঙ্গারশতক* অবতারকবির *ঈশ্বরশতক* প্রভৃতি এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

শতককাব্যের বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক। প্রেমমূলক, স্তোত্রমূলক, নীতি-উপদেশমূলক প্রভৃতি শতককাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্তোত্রমূলক শতককাব্যে কালক্রমে কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন শতকগুলিতে মহাদেব, চণ্ডী, সূর্য, বিষ্ণু প্রমুখ দেবতার স্তুতি পাওয়া যায়। তার কিছু পরবর্তী কালে পৌরাণিক দেবতার স্তুতিমূলক শতককাব্য রচিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপে ত্রয়োদশ শতকীয় শ্রীসোমেশ্বরের *রামশতক*, আচার্য গঙ্গাদাসের *কংসারিশতক*,

অজ্ঞাতনামা কবির *গোরক্ষশতক*, সপ্তদশ শতকীয় কবি রামভদ্র দীক্ষিতের *শ্রীরামপ্রতিপত্তিশতক*, *রামচাপস্তব* ও *রামবাণস্তব*, অষ্টাদশ শতকীয় কবি বুক্কপত্তনম ভেংকটাচার্যের *কৃষ্ণভাবশতক*, ঊনবিংশ শতকীয় কবি মল্লভট্টের *গৌরালংকার*, কৃষ্ণশর্মার *কালিকামন্দাক্রান্তাশতক*, শ্রীনিবাসাচার্যের *জানকীচরণচামর* প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের কবি রাম পিশারকের *রামবর্মশতক* নউবংশীয় রাজা রামবর্মার প্রশস্তি সম্বলিত। এই শতকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কবি রাম পিশারক তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা রামবর্মাকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ-বিংশ শতকে স্তোত্রমূলক শতকে স্থান পেয়েছে পণ্ডিত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমী ব্যক্তিবর্গের প্রশস্তি। সেগুলির মধ্যে উনবিংশ শতকীয় কবি ব্রহ্মানন্দ শুক্লার *গান্ধীচরিত*, শ্রীধর ভাস্কর বার্ণেকরের *জবাহরতরঙ্গিনী* বা *ভারতরত্নশতক*, বিংশ শতকীয় কবি রমেশচন্দ্র শুক্লার *ইন্দিরাযশস্তিলক*, জয়রাজ পাণ্ডের *বিবেকশতক* ও *গান্ধীগৌরব*, গঙ্গাধর বিরচিত *ইন্দিরাযশস্তিলক*, রতিনাথ ঝা বিরচিত *মালবীযশতক* (মদনমোহন মালব্যের প্রশস্তি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিছু কিছু আধুনিক শতককাব্যে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন তীর্থস্থান, মনোরম পর্যটনক্ষেত্র তথা ভ্রমণকাহিনী। এই শতকগুলিকে বর্ণনামূলক শতককাব্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মানাংক রচিত *বৃন্দাবনশতক* তীর্থস্থান সম্বন্ধীয় শতককাব্য।

বিখ্যাত বৈয়াকরণ তথা আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দ্বাদশ শতকীয় বোপদেব একটি শতক রচনা করেন, যার নাম *বোপদেববৈদ্যশতক*। এই শতকে আদ্যোপান্ত আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রবহমান শতককাব্য রচনার ক্ষেত্রে ছন্দোপ্রয়োগের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একক ছন্দে বিধৃত শতকের পাশাপাশি মিশ্র ছন্দে বিন্যস্ত শতকও পাওয়া যায়। হালের *গাহাসত্তসঈ* এবং গোবর্ধনাচার্যের *আর্যাসপ্তশতী* একক ছন্দে রচিত শতককাব্য। একক ছন্দে রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শতকগুলি হল উৎপ্রেক্ষাবল্লভ (ত্রয়োদশ শতক) রচিত *সুন্দরীশতক* (আর্যা ছন্দো, কিছু শ্লোকে অন্য ছন্দোও রয়েছে), নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের *আনন্দসাগরস্তব* ও *অন্যাপদেশশতক* (যথাক্রমে বসন্ততিলক ও শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দো), ষড়ক্ষরদেব (সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ) রচিত *শিবস্তবমঞ্জরী*

(শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দো), জম্বুকবির *জিনশতক* (স্রগ্ধরা ছন্দো), সোমনাথ বিরচিত *অন্যোক্তিমুক্তাবলী* (মালিনী ছন্দো), গুমাণি রচিত *উপদেশশতক* (আর্যা ছন্দো), পণ্ডিত কৃষ্ণ শর্মা ধর্মাধিকারী (উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ) রচিত *কালিকামন্দাক্রান্তাশতক* (মন্দাক্রান্তা ছন্দো) প্রভৃতি। এছাড়াও বিংশ-একবিংশ শতকের অনেক শতককাব্যেও একক ছন্দো ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কবি মহেশ ঝা (২০০৩ খ্রিস্টাব্দ) বিরচিত *চণ্ডিকাশতক* ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে বিন্যস্ত। বর্তমানের কবি কেশবরামশর্মা রচিত শতকচতুষ্টয়ের অন্তর্গত *মাতৃভূমিশতক, দর্শনার্ণবরত্নশতক, ভারতশতক* এবং *সংস্কৃতশতকে* যথাক্রমে মন্দাক্রান্তা, বসন্ততিলক, ইন্দ্রবজ্রা, এবং উপজাতি (ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা সহযোগে) ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে।

ছন্দোপ্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সাম্যগুলির পাশাপাশি প্রাচীন ও অর্বাচীন শতককাব্যগুলির মধ্যে কিছু বৈষম্যও রয়েছে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কালের নিয়মেই অন্যান্য ভাষাসাহিত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বিষয়বস্তু, শব্দ ও শব্দবন্ধ, কাব্যের প্রকার প্রভৃতির পাশাপাশি ছন্দের ব্যবহারেও নবীনতা লাভ করেছে। এই নবীন সংযোজন শতককাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রমোদকুমার নায়ক বিরচিত *দারিদ্র্যশতক* আদ্যোপান্ত গদ্যছন্দে বিন্যস্ত শতককাব্য। উদাহরণরূপে একটি কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

নৈব কদা সুখদাতা ভবতি ঈশ্বরঃ।
ন দদাতি কদা সোঽপি দরিদ্রায কিঞ্চিত্,
মিথ্যা সর্বে অবতারাঃ,
স্বামি-ৰাৰাগণঃ
জগন্মিথ্যা, ব্রহ্মমিথ্যা,
মিথ্যা শাস্ত্রং, মিথ্যা প্রভুগৃহং,
মিথ্যা প্রবচনং, সখি!
মিথ্যা প্রভুবাণী
মিথ্যা ভক্তিরাত্মসমর্পণম্।[১৫]

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে প্রযুক্ত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের ভাণ্ডার বহুব্যাপক ও সর্বপ্রাচীন। সংস্কৃত শতককাব্যে প্রায় সমস্ত রকমের শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যোক্তিমূলক শতককাব্যে ব্যাজোক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন বশতই হয়ে থাকে। অন্যান্য শতককাব্যে যমকানুপ্রাসাদি শব্দালংকার তথা উপমা প্রভৃতি অর্থালংকারের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। হাল সংকলিত *গাহাসত্তসঈ* শতককাব্যেই সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রায় সমস্ত রকমের অর্থালংকার দেখা যায়।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শতককাব্যেও কালক্রমে কৃত্রিমতা প্রদর্শিত হয়েছে। বিভিন্ন শতককাব্যে প্রযুক্ত শব্দালংকারগুলি তার যথাযোগ্য প্রমাণ। কবি আনন্দবর্ধনের *দেবীশতকের* একটি শ্লোক এবিষয়ে উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

মেনে নূনমনেন মাননমুমানামা নু মেনোন্মনা
নুন্নে নোমমনে নিমানমমুনা নো নাম নানানুমে।
মৌনে নামমমান নিম্নমননান্নানামিনা নূনিমে
মুন্মিন্নানমা নমী মুনিমনো মানাননোন্নমিনি॥[১৬]

অনুরূপ একটি দ্ব্যক্ষরশ্লোক পাওয়া যায় অবতার কবির *ঈশ্বরশতকে* -

নূনং নমন্মে নমনিম্নমেন্নমুমামনোমান ননুন্ন মোনম্।
মানং মিমানং মুনিমানিনামনূন নামানমিনং নমামি॥[১৭]

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আলোচিত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের অতিরিক্ত কোনো নবীন অলংকারের ধারণা আধুনিক শতককাব্যে পাওয়া যায় না।

১.৪ শতককাব্যের শ্রেণীবিভাগ:

প্রাচীন শতকগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত- প্রেমমূলক বা শৃঙ্গারমূলক, স্তোত্রমূলক ও নীতিমূলক। পরবর্তীকালে শতককাব্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেগুলিকে এই তিনটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এবিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন শতকগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে-

(ক) নীতি উপদেশমূলক শতক (Didactic)

(খ) প্রেমমূলক শতক (Erotic)

(গ) স্তোত্রমূলক শতক (Panegyric)

(ঘ) বর্ণনামূলক শতক (Narrative)

(ঙ) অন্যান্য (Miscellaneous)

১.৫ শতককাব্যের উদ্দেশ্য:

বিদ্বদ্ সমাজে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে- *শতশ্লোকেন পণ্ডিতঃ*। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি একশত বা ততোধিক শ্লোক রচনা করেন; তাহলে তিনি বিদগ্ধদের দ্বারা পণ্ডিত আখ্যা লাভ করে থাকেন। সেই কারণে হয়ত মুক্তককারগণ পরস্পর নিরপেক্ষ একশত শ্লোক সন্নিবেশিত করতেন। বস্তুত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বা বর্ণনার সপক্ষে কবি যখন কোনো সামান্য বা নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা শ্লোকাকারে পরিবেশিত করেন; তখন তা হয়ে ওঠে প্রবন্ধধর্মী শ্লোক, যা দৃশ্যকাব্য, মহাকাব্য তথা খণ্ডকাব্যে বিদ্যমান থাকে। আর কবির কল্পনা যখন কোনো বিচ্ছিন্ন একক বিষয় বা বস্তুর বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে; তখন তা হয়ে ওঠে মুক্তক। এইরকম মুক্তকের সমন্বয়ই হল শতককাব্য। গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কথা ও আখ্যায়িকার থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় রচনা কথানিকা যেমন পাঠকগণের মনোরঞ্জন করে, তেমনি পদ্যকাব্যের অন্তর্গত মহাকাব্য তথা খণ্ডকাব্যের তুলনায় ক্ষুদ্রকায় রচনা মুক্তক বা শতককাব্য পাঠক-চিত্তে তাৎক্ষণিক আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটায়, বুদ্ধিকে চমৎকৃত করে।

আধুনিক কালে এই ক্ষুদ্রকায় রচনার ও পাঠের প্রবণতা অনেক বেশি। যার ফলে দেশীয় ও বিদেশী ভাষাসাহিত্যের অনুরূপ সংস্কৃত সাহিত্যেও ছোট ছোট কবিতার সংকলন বর্তমান সময়ে অনেক বেশি দেখা যায়।

১.৬ শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য:

আলংকারিকগণ শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। খণ্ডকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন- মহাকাব্যের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে যে কাব্য রচিত হয়; তাকে বলা হয় খণ্ডকাব্য।[১৮] প্রসঙ্গক্রমে তিনি কোষেরও লক্ষণ করেছেন- পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহ হল কোষ।[১৯] খণ্ডকাব্যের শ্লোকগুলি শতককাব্যের মতোই অংশত

পরস্পর নিরপেক্ষ হলেও সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ নয়। খণ্ডকাব্যে আদ্যোপান্ত একটি ঘটনাক্রম থাকে, কিন্তু শতককাব্যে একক বিষয় অবলম্বনে রচিত শ্লোক থাকলেও সেগুলি প্রায়শই নিরপেক্ষ। জীবনচরিতমূলক বা প্রশস্তিমূলক শতককাব্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে বিষয়ীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ থাকে, নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাক্রম থাকে না।

শতককাব্যের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্র বহুব্যাপক। বর্ণনীয় বিষয় অতিক্ষুদ্র ও ভাবব্যঞ্জক। মানুষের প্রেম ও প্রেমজনিত বিভিন্ন অনুভূতি, ঈশ্বর সাধনা, উপাস্য দেবতা, মহাপ্রাণদের কীর্তি, বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে এককভাবে অথবা একাধিক বিষয়ের সমন্বয়ে শতককাব্য রচিত হতে পারে।

শতককাব্যের সর্গাদির বিভাগ বিষয়ে কোনো নিয়ম নেই, শতককারগণও কোনো গতানুগতিক নিয়ম অনুসরণ করেননি। অনেকের মতে *গাহাসত্তসঈ* এর গাথাগুলি ব্রজ্যাক্রমে রয়েছে। কিন্তু কাব্যের কোথাও সেরকম কোনো সংকেত নেই। ব্যাধ, কৃষক, প্রোষিতভর্তৃকা, বারবনিতা প্রভৃতি সংক্রান্ত গাথাগুলি এককভাবে সংকলিত হয়েছে মাত্র। আবার ভর্তৃহরির শতকত্রয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির নামকরণ রয়েছে। যেমন- *নীতিশতকে* অজ্ঞপদ্ধতী (শ্লোক নং ৩-১৪), বিদ্বৎপদ্ধতী (১৪-২৮), মানশৌর্যপদ্ধতী (২৯-৩৮), অর্থপদ্ধতী (৩৯-৫১), দুর্জনপদ্ধতী (৫২-৬১), সুজনপদ্ধতী (৬২-৬৯), পরোপকারপদ্ধতী (৭০-৭৯), ধীরপদ্ধতী (৮০-৮৯), দৈবপদ্ধতী (৯০-৯৮), কর্মপদ্ধতী (৯৯-১০৮)। অনুরূপভাবে *শৃঙ্গারশতক* ও *বৈরাগ্যশতকে* বস্তুভিত্তিক ব্রজ্যাক্রম দেখা যায়। তবে এই বর্গীকরণ ভর্তৃহরির নয় বলেই অনেকের ধারণা। *গাহাসত্তসঈ* এর মতো *শতকত্রয়ের* বর্গীকরণও কোনো টীকাকার প্রদত্ত হতে পারে। অকারাদি ব্রজ্যাক্রমে বিন্যস্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন শতকও রয়েছে। তবে অধিকাংশ শতকেই সর্গাদির বিভাগ দেখা যায় না।

শতককাব্যের রস মুখ্যত শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত হয়ে থাকে। মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যে মূখ্যরসের সঙ্গে সঙ্গে গৌণ রসগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু শতককাব্যে গৌণ রস তেমন গুরুপূর্ণ নয় এবং শতককাব্যে প্রায়শ গৌণ রস দেখা যায় না।

সম্ভবত প্রাচীন শতককাব্যের শ্লোকগুলি স্বতন্ত্রভাবেই রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেগুলিকে একত্রিত করে শতককাব্যের রূপ দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে

শতককাব্যকে কোষকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যেতেও পারে। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্যও রয়েছে। হালের শতকে বিষয়বস্তু এক হলেও তা একক কবির মুক্তকের সংকলন নয়। তাই *গাহাসত্তসঈ* একাধারে শতককাব্য ও কোষকাব্য। শতক ও কোষের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল-

শতককাব্য মূলত একক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোষের বিষয় বিভিন্ন হতে পারে।

শতককাব্য একক কবির এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের রচনা। কোষকাব্য বিভিন্ন কবির ও বিভিন্ন সময়ের রচনা হতে পারে।

শতক যেহেতু একক কবির রচনা তাই এর মুক্তকগুলি প্রায়শই একই রকম বিষয় ও বিন্যাসের (শব্দচয়ন, গুণ-রীতি, ছন্দো প্রভৃতির) দ্বারা নিবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে কোষকাব্যে এই সাম্য থাকে না।

আলংকারিকগণের মতে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের মুখ্যরস শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত হবে। অন্যদিকে শতককাব্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই তিনটি রসের দ্বারা নিবদ্ধ শতককাব্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের সঙ্গে শতককাব্যের কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্যণীয়-

মহাকাব্যে ও খণ্ডকাব্যের সমস্ত শ্লোকে এই রসগুলি থাকে না। বিশেষ বিশেষ স্থানে রসের প্রতীতি হয়ে থাকে। অন্যদিকে শতককাব্যের প্রায় সমস্ত শ্লোকেই রসের প্রতীতি হয়ে থাকে।

মহাকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে একটি মুখ্যরস থাকে এবং তার পরিপোষক কিছু গৌণরস থাকে। অন্যদিকে অধিকাংশ শতককাব্যে গৌণরস থাকে না।

মহাকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে আদ্যোপান্ত একটি কাহিনী বিন্যস্ত থাকে। যার ফলে কিছু কিছু শ্লোক কেবলমাত্র ঘটনাক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেগুলি ভাবব্যঞ্জক বা সারগর্ভ শ্লোকের পর্যায়ভুক্ত নয়। অন্যদিকে শতককাব্যে সমস্ত শ্লোকই ভাবব্যঞ্জক হয়ে থাকে।

মহাকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে মুক্তকের পাশাপাশি যুগ্মক, কুলক প্রভৃতি পরস্পর সাপেক্ষ শ্লোক থাকে। শতককাব্যের সব শ্লোকই পরস্পর নিরপেক্ষ।

অভিনবগুপ্ত প্রবন্ধকাব্য ও শতককাব্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেছেন- *মুক্তমন্যোনানালিঙ্গিতং তস্য সজ্ঞাযাং কন্। তেন স্বতন্ত্রতযা পরিসমাপ্তনিরাকাঙ্খার্থমপি প্রৰন্ধমধ্যবর্তি ন মুক্তকমিত্যুচ্যতে।..... যদি বা প্রৰন্ধেঽপি মুক্তকস্যাস্তু সদ্ভাবঃ, পূর্বাপরনিরপেক্ষেনাপি হি যেন রসচর্বণা ক্রিযতে তদেব মুক্তকম্।*[২০]

শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে এভাবে দেখানো যেতে পারে-

(ক) শতককাব্যের বর্ণনীয় বা উপজীব্য বিষয়ের ক্ষেত্র বহুব্যাপক।

(খ) শতককাব্যের প্রতিটি শ্লোকে ভাবের দ্যোতনা অনেকটাই বিস্তৃত ও সুগভীর।

(গ) শতককাব্যের শ্লোকগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র হয়।

(ঘ) শতককাব্যের সর্গাদির বিভাগ কবির স্বেচ্ছাধীন।

(ঙ) শতককাব্য ব্রজ্যাক্রমে বিন্যস্ত হতে পারে আবার নাও পারে।

(চ) শতককাব্যের রস হয় শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত। কিছু আধুনিক শতকে করুণ রসও দেখা যায়।

(ছ) একক কবির রচনা। তাই আদ্যোপান্ত বিষয় ও বিন্যাসের (শব্দচয়ন, গুণ-রীতি, ছন্দো) মধ্যে সাম্য থাকে।

১.৭ শতককাব্যের গুরুত্ব:

শতককাব্যের গুরুত্ব পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সংস্কৃত আলংকারিকগণ শতককাব্য বা মুক্তককাব্যকে কী দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

অষ্টম শতকীয় আলংকারিক আচার্য বামন মুক্তক প্রসঙ্গে বলেছেন-

নানিৰদ্ধং চকাস্ত্যেকতেজঃপরমাণুবত্

অসংকলিতরূপাণাং কাব্যানাং নাস্তি চারুতা।

ন প্রত্যেকং প্রকাশন্তে তৈজসা পরমাণবঃ॥[২১]

অর্থাৎ একক তৈজস পরমাণু যেমন নিরবচ্ছিন্ন স্ফুলিংগের প্রকাশ ঘটাতে পারে না, তেমনই একক মুক্তকগুলিও উৎকৃষ্ট কাব্যের চারুত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। তাই তিনি কবিযশপ্রার্থীকে

প্রথমে অনিবদ্ধ বা মুক্তককাব্য রচনায় দক্ষতা লাভের পরে নিবন্ধ বা প্রবন্ধকাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি রচনায় মনোনিবেশ করতে বলেছেন, ঠিক যেমন করে একক ফুলের সমন্বয়ে মালা এবং মালার দ্বারা পুষ্পমুকুট নির্মাণ করতে হয়।[২২]

আচার্য রাজশেখরের মতে-

মুক্তকে কবযোঽনন্তাঃ সংঘাতে কবযঃ শতম্।

মহাপ্রৰন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ বা দুর্লভাস্ত্রয়ঃ॥[২৩]

রাজশেখর ও বামনের বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, তাঁরা মুক্তক রচয়িতাগণকে প্রবন্ধকাব্য বা মহাকাব্য রচয়িতাগণের সমমর্যাদা দিতে চাননি।

নবম শতকীয় কবি তথা আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধন কিন্তু মুক্তককারদেরকেও গুরুত্বসহকারেই দেখেছেন। তাঁর মতে- *"মুক্তকেষু প্রৰন্ধেষ্বিব রসৰন্ধাভিনিবেশিনঃ কবযো দৃশ্যন্তে। যথা হ্যমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রৰন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।"*[২৪]

অমরুশতকের টীকাকার অর্জুনবর্মদেব আনন্দবর্ধনের বক্তব্যের অনুরূপ একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন- *"কিং চামীষাং শ্লোকানাং তাবতী রসোপকরণসামগ্রী যাবতী প্রৰন্ধেষু ভবতি। অতঃ এবোক্তং ভরতটীকাকারৈঃ- 'অমরুককবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রৰন্ধশতায়তে' ইতি।"*[২৫] দেখা যাচ্ছে যে, *অমরুশতকের* প্রাচীন টীকাকার ভরত অমরুর মুক্তকগুলিকে প্রবন্ধের মতোই উচ্চমার্গে স্থান দিয়েছেন। আচার্য বামনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য রয়েছে *অগ্নিপুরাণে*। এখানে মুক্তক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- একক মুক্তকগুলি কাব্যিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে।[২৬] আর কাব্যের মূল প্রয়োজনই হল রসনিষ্পত্তির মাধ্যমে সহৃদয়ের চিত্তকে চমৎকৃত করা।

মুক্তককারগণকে সংযতভাবে শব্দের ব্যবহার করতে হয়। শব্দের পরিমিত আধারে ভাবকে পরিপূর্ণ ও রসসিক্ত করে প্রকাশ করতে হয়। তাই *সভারঞ্জনশতকে* শোভন উক্তিময় মুক্তকের গুরুত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে-

শাস্ত্রেষু দুর্গহোঽপ্যর্থঃ স্বদতে কবিসূক্তিষু।

দৃশ্যং করগতং রত্নং দারুণং ফণিমূর্ধনি॥[২৭]

অর্থাৎ সর্পের মস্তকস্থিত দুষ্প্রাপ্য মণি লাভের মতো বিবিধ শাস্ত্রের দুরূহ বিষয়কে আস্বাদযোগ্য করে তোলে সূক্তিসমূহ।

বলদেব উপাধ্যায়ের মতে- মুক্তক হল রসময় মোদকের মতো যা আস্বাদনমাত্র সহৃদয়ের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে।[২৮]

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত আলংকারিকগণ তাঁদের গ্রন্থে প্রসঙ্গবিশেষে বিভিন্ন শতকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। আনন্দবর্ধন, মম্মট, উদ্ভট, বিশ্বনাথ, ভোজরাজ, বামন, কুন্তক, জগন্নাথ প্রমুখ আলংকারিকের গ্রন্থে বিবিধ শতককাব্যের শ্লোক পাওয়া যায়।

আচার্য মম্মট উত্তমকাব্যের উদাহরণরূপে *অমরুশতকের* একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন-

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেযং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি ৰান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীডাগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্॥[২৯]

এছাড়া *গাহাসত্তসঈ*, আনন্দবর্ধনের *দেবীশতক*, ভর্তৃহরির শতকত্রয়, *ভল্লটশতক*, *সূর্যশতক*, *সদুক্তিকর্ণামৃত* প্রভৃতি শতককাব্যের শ্লোক *কাব্যপ্রকাশে* পাওয়া যায়।

আনন্দবর্ধনও তাঁর *ধ্বন্যালোকে গাহাসত্তসঈ*, *অমরুশতক*, *ভল্লটশতক*, *সূর্যশতক* প্রভৃতি শতকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। *ধ্বন্যালোকের* প্রথম উদ্যোতে-

ভম ধম্মিয বীসত্থো সো সুণও অজ্জ মারিও দেণ।
গোলাণইকচ্ছকুডঙ্গবাসিনা দরিঅসীহেণ॥[৩০]

এই জনপ্রিয় শ্লোকটি *গাহাসত্তসঈ* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণের* চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধ্বনির আলোচনা প্রসঙ্গে *গাহাসত্তসঈ* এর উপরোক্ত শ্লোকটির প্রয়োগ করেছেন।

আচার্য বামন *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিতে* বিভিন্ন শতককাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। পাঞ্চালী রীতির উদাহরণ (১.২.১৩), শ্লেষগুণের উদাহরণ (৩.২.৪), বিরোধালংকারের উদাহরণ (৪.৩.১২) প্রভৃতি প্রসঙ্গে বামনের অলংকারশাস্ত্রে *অমরুশতকের* শ্লোক পাওয়া যায়।

সংস্কৃত মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যগুলি নাগরিক সভ্যতা, রাজা, রাজ্যপাট, দেব-দেবী প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্যে পরিপূর্ণ। সেগুলিতে কদাচিত গ্রামীণ জীবনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় মাত্র। শতককাব্যগুলি সে তুলনায় অনেক বেশি গ্রামকেন্দ্রিক। বিশেষ করে প্রেমমূলক শতককাব্যে গ্রামীণ জনজীবন, তাদের জীবিকা, সুখ-দুঃখ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

মুক্তক হয়ত আয়তনের দিক থেকে বিরাটত্বের দাবী রাখতে পারে না, কিন্তু অনুভূতির বিশালতা রয়েছে তার মধ্যে। বিশেষ করে শৃঙ্গারমূলক শতককাব্যে শব্দের পরিমিত আধারে মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য বলেছেন- *"মুক্তকের কবিকে অত্যন্ত সংযত হয়ে কথা বলতে হয়। ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য দীর্ঘ অবকাশ নেই। ওই একটু অবকাশের মধ্যেই ভাবকে পূর্ণাঙ্গ এবং নিটোল করে রূপ দিতে হয়। এই সংযম এবং শৃঙ্খল কবিকে নিয়ন্ত্রিত করে বলেই অসাধারণ কবি না হোলে মণির মত উজ্জ্বল এক একটি মুক্তক রচনা সম্ভব নয়।"*[৩১]

১.৮ শতক সাহিত্যের ইতিহাস (খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত)

১.৮.১ গাহাসত্তসঈ: (খ্রিস্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) প্রাকৃত কবি হাল কর্তৃক সংকলিত শতককাব্য হল *গাহাসত্তসঈ* বা *গাথাসপ্তশতী*। সংকলিত বলার কারণ হল এই সম্পূর্ণ মুক্তক কাব্যটি কবি হালের নিজস্ব রচনা নয়। এই বিষয়ে *গাহাসত্তসঈ* এর একটি গাথা বা শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

সত্ত সতাই কইবচ্ছলেণ কোডীঅ মজ্ঝআরম্মি।
হালেণ বিরইআইং সালংকারাণঁ গাহাণম্।।
(সপ্তশতানি কবিবত্সলেন কোটের্মধ্যে।
হালেন বিরচিতানি সালংকারাণাং গাথানাম্।।[৩২]

অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে অসংখ্য মুক্তক লোকমুখে বা লিখিত আকারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মহারাজ হাল সেগুলির মধ্যে সাতশো শ্লোক নিয়ে *গাহাসত্তসঈ* সংকলন করেন। অনেকে মনে করেন যেহেতু তিনি অনেক কবির রচনাকে সংগ্রহাকারে প্রকাশ করেছেন তাই 'কবিবৎসল' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া তিনি তাঁর রাজত্বকালে অনেক কবির (মূলত প্রাকৃত কবিদের) আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাই *গাহাসত্তসঈ* একটি কোষকাব্য। অনেকের মতে *গাহাসত্তসঈ* এর প্রাচীন নাম ছিল *গাথাকোশ*। *গাহাসত্তসঈ* এর কিছু প্রাচীন পুঁথিতে অন্তিম গাথায় বলা হয়েছে-

এসো কইণামংকিঅগাহাপডিবদ্ধবড্ঢিআমোঅো।

সত্তসঅঅো সমত্তো সালাহণবিরইঅো কোসো।।

(এষ কবিনামাঙ্কিতগাথাপ্রতিবদ্ধবর্ধিতামোদঃ।

সপ্তশতকঃ সমাপ্তঃ শালবাহনবিরচিতঃ কোষঃ।।)

তাই গাথাগুলির সাথে সাথে ষষ্ঠী বিভক্তিতে উক্ত গাথা-রচয়িতার নামও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম শতকের ২১ থেকে ৯৩ এবং ৯৫ নং শ্লোকের রচয়িতার নাম নেই তাছাড়া অন্যান্য শতকের অন্তিম গাথায় 'কবইচ্ছল' অর্থাৎ কবিবৎসল হালের নাম চিহ্নিত রয়েছে,[৩৩] পঞ্চম শতকের অন্তিম গাথায় তা নেই। যেহেতু উক্ত গাথা ও তার রচয়িতাদের নাম টীকাকারগণ পরম্পরাক্রমে পেয়েছেন। তাই হতে পারে, তারা সেগুলি ভুলে গেছেন অথবা *গাহাসত্তসঈ* সংকলনের আদিকাল থেকেই সেগুলি অজ্ঞাতনামা কবির রচনা হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। কিছু গাথায় সাতবাহনরাজ হালের নামও উল্লিখিত আছে। তাঁর নামাংকিত ৪৫ টি (মতান্তরে ৪৪ টি) শ্লোক পাওয়া যায় এই সংকলনে। তাই অনামী গাথাগুলি যে হালেরই রচনা তা দাবী করা অনুচিত হবে।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনাথ মাণ্ডলীক একটি পুরোনো পুঁথি প্রকাশ করেন, যার নাম *শালিবাহনসপ্তশতী*। এই পুঁথি থেকে জানা যায় পুঁথিটির সংকলনে হাল ব্যতীত আরও ছয় জন কবির নাম ছিল, তাঁরা হলেন ১. বোদিত (বোদিস) ২.চল্লুহঃ ৩. অমররাজ ৪. কুমারিল ৫. মকরন্দসেন ৬. শ্রীরাজ।[৩৪]

গাহাসত্তসঈ সংকলন গ্রন্থটির সময়কাল বা হালের সময়কাল ঠিক কত- এই বিষয়ে পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে খ্রিস্টিয় প্রথম শতককে হালের সময়কাল ধরেছেন। কিন্তু এ. বি কীথ, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি গবেষক এ কথা অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে ভাণ্ডারকর মূলত দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রথমত *গাহাসত্তসঈ* এর একটি গাথায় রাধা-কৃষ্ণের কথা রয়েছে।[৩৫] ভাণ্ডারকরের মতে পঞ্চম শতকীয় কাব্য *পঞ্চতন্ত্রে* প্রথম রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত একটি গাথায় মঙ্গলবারের প্রয়োগ রয়েছে।[৩৬] কিন্তু তাঁর মতে বুধগুপ্তের *এরণ* অভিলেখে প্রথম তিথি প্রয়োগের উদাহরণ পাওয়া যায়। তাই সাতবাহনরাজ হালের সময়কাল খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের আগে নয় বলে ভাণ্ডারকরের অভিমত।

ডঃ রাজবলী পাণ্ডেয় তাঁর *বিক্রমাদিত্য* গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য পাল্টা যুক্তি দিয়ে ভাণ্ডারকরের মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন পঞ্চম শতকে রাধার কথা উল্লিখিত হয়েছে মানে এই নয় যে তৎপূর্ববর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণের কথা বিদ্যমান ছিল না, উপরন্তু বলা যেতে পারে পঞ্চতন্ত্রের আগে রাধা-কৃষ্ণের কথা লোকমুখে চর্চিত ছিল বলেই তা কাব্যে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া ভাণ্ডারকর যে দাবী করেছেন বুধগুপ্তের *এরণ* অভিলেখে প্রথম তিথির প্রয়োগ করা হয়েছে; তাও অমূলক। তাঁর মতে বুধগুপ্তের আগেই শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অভিলেখে শক সংবত্ ৫২ (১৩০ খ্রিস্টাব্দ) এবং গুরুবার উল্লিখিত হয়েছে।[৩৭]

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজবংশ তথা হালের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতবৈষম্যের শেষ নেই। ঐতিহাসিকগণের মতে সাতবাহন রাজবংশের সময়কাল খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে। অতএব *গাহাসত্তসঈ* এর গাথাগুলির রচনাকাল সঠিকভাবে অনুমান করা না গেলেও সাতশো শ্লোক বা গাথা বিশিষ্ট *গাহাসত্তসঈ* খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যেই সংকলিত হয়েছিল। *গাহাসত্তসঈ* এর সংকলকের নাম বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ গবেষক তথা সংস্কৃত কবি সাতবাহনরাজ হালের কথাই স্বীকার করেছেন।

বাণ তাঁর *হর্ষচরিতে* *সুভাষিতকোষের* রচয়িতারূপে যে সাতবাহনের নামোল্লেখ করেছেন,[৩৮] তাকেই *গাহাসত্তসঈ* এর সংকলক বলে অনেকে মনে করেছেন। *গাহাসত্তসঈ* এর গাথাসমূহ ও অন্যান্য কবির প্রশস্তি থেকে *গাহাসত্তসঈ* বা *গাথাকোষ* অথবা *সুভাষিতকোষের* কর্তৃত্বভাগী হিসেবে কমপক্ষে ৪০ টি ভিন্ন নামের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের মতে

'সাতবাহন' শব্দটিই যথাক্রমে শালিবাহন >সালাহণ >হালাহণ এবং পরবর্তীকালে সংক্ষেপে 'হাল' রূপে পরিবর্তিত হয়েছে।

সাতশোর অধিক গাথাবিশিষ্ট এই *গাহাসত্তসঈ* প্রাকৃত (মহারাষ্ট্রী) ভাষায় রচিত আদিরসাত্মক মুক্তককাব্যের একটি বিখ্যাত নিদর্শন। তৎকালীন গ্রাম্য জীবনযাত্রাকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছে এই গাথাগুলি। গ্রামীণ জনজীবনের চিত্র অংকিত হয়েছে *গাহাসত্তসঈ এ*। প্রথম প্রেমের উন্মাদনা, তারুণ্যে প্রেমের প্রগাঢ়তা, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে প্রেম-বিরহ-অভিমান-উৎকণ্ঠা, কুলরমণীর পরকীয়া, অবৈধ প্রেমের লীলাখেলা, নারীহৃদয়ের গোপন ভাষা, নারীর শরীরিক সৌন্দর্যের অকপট বর্ণনা, শরীর সম্ভোগের উপকরণ, প্রোষিতভর্তৃকার অন্তরের অনুভূতি, কৃষক, ব্যাধ, গ্রামপ্রধান প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার মানুষের বিচিত্র বর্ণনায় গ্রামীণ জীবনের এক সামগ্রিক চিত্রপট অংকিত হয়েছে এই সাতশো শ্লোকের মাধ্যমে।

অধ্যাত্মচিন্তা থেকে অনেক দূরে ঐহিক ও শরীরসর্বস্ব ভোগবাসনার পরিচয় দেয় এই গাথাগুলি। তবে এই সবের পাশাপাশি পারস্পরিক মূল্যবোধ, সহমর্মিতার চিত্রও ফুটে উঠেছে আলোচ্য কাব্যে। শত্রুর দ্বারা বন্দি কোনো এক রমণী তাঁর পতির ধনুষ্টংকারের শব্দ শুনে বন্দীগৃহের অন্যান্য রমণীদের চোখের জল মুছে সান্ত্বনা দেয়, কারামুক্তির জন্য আশ্বস্ত করে।[৩৯] এক নায়িকা কোনো এক প্রিয় বিরহে কাতরা প্রোষিতভর্তৃকাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে প্রেমিক-প্রেমিকার অনুভূতি, ছলনা, বঞ্চনা প্রভৃতির বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।[৪০] রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার সংকেত সর্বপ্রথম এখানেই পাওয়া যায়-

মুহ-মারুএণ তং কণ্ হ গো-রঅং রাহিআএঁ অবনেন্তো।

এতাণঁ বল্লবীণং অপ্পাণ বি গোরঅং হরসি।।[৪১]

পতিপ্রাণা রমণী সর্বদা স্বামীকে অন্য রমণীর থেকে দূরে রাখতে চায়, স্বামীর প্রতি তাদের একটা সন্দেহ কাজ করে যে- এই বুঝি স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত হয়েছে। *গাহাসত্তসঈ* এর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিব ও পার্বতীর এরকমই একটি মুহূর্তের চিত্র রয়েছে। শিব প্রভাতকালীন সন্ধ্যোপাসনার জন্য অঞ্জলি ভরে জল নিয়েছেন কিন্তু পার্বতীর মনে হয়েছে শিব সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তাই তার উপাসনা করছেন। ফলে ক্রোধে তাঁর মুখশ্রী রক্তাভ হয়ে যায়। সেই রক্তাভ মুখশ্রীর প্রতিবিম্ব শিবের হস্তধৃত জলে পতিত হয়ে রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করে।[৪২]

গাহাসত্তসঈ এর গাথাগুলি মানব মনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুভূতিগুলিকে সুচারুরূপে প্রকাশ করেছে। তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্ণ ও স্ত্রীদের ভাষা ছিল প্রাকৃত। সেইজন্যই হয়তো এই প্রাকৃত গাথাগুলিতে গ্রাম্য মানুষের সরল মনের অভিব্যক্তিগুলি এমন সাবলীল, এমন অকপট, এমন সবিশেষরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এক গ্রাম্যবধূ হাত ও পায়ের আঙুল গুনে প্রবাসী স্বামীর ঘরে ফেরার দিন হিসেব করছে। আঙুল গোনা শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্বামী ঘরে ফেরে না-

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলিগণণাই অইগআ দিঅহা।

এণিহং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণেউ রুঅই মুদ্ধা।।[৪৩]

মহাকবি কালিদাস বলেছেন-

দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।

সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিৰন্ধনেন।।[৪৪]

'সুখগ্রাহ্যনিবন্ধন' বলেই হয়তো প্রাকৃত কবিতার অভিব্যক্তিগুলি এতো ব্যক্তিনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহ্য। তাই টীকাকার বলেছেন- "সুখেন গ্রাহ্যং সুৰোধং নিৰন্ধনং রচনা যস্য তেন বাঙ্ময়েন, প্রাকৃতভাষযেত্যর্থঃ।" তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভাষার ব্যবহার আলংকারিকগণের দ্বারা স্বীকৃত। *গাহাসত্তসঈ* এর গাথাগুলি সংস্কৃত আলংকারিকগণের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। কাব্যসমালোচনায় তাঁরা এই গাথাগুলিকে অকপটে ব্যবহার করেছেন। বাণভট্ট, উদ্যোতন সূরি, রাজশেখর, অভিনন্দ, জিনপ্রভসূরি, মেরুতুঙ্গ, হেমচন্দ্র, সোড্ঢল, রাজশেখর সূরি প্রমুখ কবিগণ *গাহাসত্তসঈ* এর প্রশংসা করেছেন।

১.৮.২ অমরুশতক: (খ্রিস্টিয় অষ্টম শতক) শতাধিক শ্লোক সমন্বিত শৃঙ্গার রসাত্মক মুক্তককাব্য *অমরুশতক* বা *অমরুকশতক*। শতককারের নাম ও সময়কাল বিষয়ে বিদ্বদমহলে মতবৈষম্য বিদ্যমান। জনশ্রুতি রয়েছে যে শ্রীশংকরাচার্য *অমরুশতকের* রচনাকার। এই বিষয়ে তিনটি ভিন্ন মত শোনা যায়। প্রথমত, শংকরাচার্য মণ্ডনমিশ্রকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করে তার পত্নী সরস্বতীকে শাস্ত্রালোচনার জন্য আহ্বান করেন। বিভিন্ন বাকযুদ্ধের পর সরস্বতী শংকরকে কামশাস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচারী শংকর কামশাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে তার কাছে একমাস সময় প্রার্থনা করেন। এক মাস অবসরে শংকর তাঁর প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যোগশক্তিবলে নিজ শরীর ত্যাগ করে রাজা অমরুর মৃত শরীরে প্রবেশ করেন।

তিনি রাজোচিত জীবন যাপন পূর্বক বাৎসায়নের কামসূত্রসহ অন্যান্য কামশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন এবং একটি শৃঙ্গার বিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করেন। যেহেতু এই জ্ঞানলাভে রাজা অমরু বা অমরুকের শরীরমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে; তাই এই প্রবন্ধটিকে অনেকে শংকরাচার্যের বলে মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, দিগ্বিজয়ে ভ্রমণকালে শংকরাচার্য কাশ্মীরে উপস্থিত হলে স্থানীয় লোকজন তাঁর কাছে কামশাস্ত্র বিষয়ে জানতে চায়। শংকর জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য মৃত রাজা অমরুর শরীরে প্রবেশ করে রাজমহিষীগণের সঙ্গে সম্ভোগ ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞানাহরণ করে কামশাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা *অমরুশতক* নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে লৌকিক উপহাসের কারণে গ্রন্থটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করেন।

তৃতীয়ত, শংকরাচার্য দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে কাশ্মীরে উপস্থিত হলে কাশ্মীর অধিপতি অমরুক রাজধানীর একশত সুন্দরী রমণীর সঙ্গে সম্ভোগক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে জনগণ শংকরের কাছে শৃঙ্গার বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তার ব্যাখ্যা করেন কিন্ত জনগণের দ্বারা উপহাসাস্পদ হওয়ায় যোগ বলে রাজা অমরুর শরীরে প্রবেশ করে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এর ফলে রাজা ও সভাসদগণ এই জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীকালে শংকরাচার্যের ব্যাখ্যাটিই অমরুর মুখ থেকে নির্গত হয়ে *অমরুশতক* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

উপর্যুক্ত এই ব্যাখ্যাগুলি অধিকাংশ কাব্যসমালোচক অস্বীকার করেছেন। শংকরাচার্যের *অমরুশতকের* কর্তৃত্ব ও আধ্যাত্মিকতা- এই উভয় ক্ষেত্রেই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার অর্জুনবর্মদেব তাঁর *রসিকসঞ্জীবনী* টীকায় স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে *অমরুশতক* কোনো আধ্যাত্মিক কাব্য নয়, নায়িকাপ্রধান কাব্য- *রহস্যং চৈতত্ পরমার্থসহৃদযা মন্যন্তে- যং রসমুপনিৰদ্ধুমেষ কবিঃ প্রবৃত্তঃ স যদ্যপ্যকৃত্রিমানুরাগস্ত্রীপুংসপরস্পরানুরাগকল্লোলিতঃ পরাং কোটিমধিরোহতি তথাপি নাযিকাযাঃ প্রাধান্যম্। তত্-প্রাধান্যপ্রকাশনপরশ্চাযমৌচিত্যাত্-কটাক্ষমুখ্যত্বেনাভীষ্টদেবতাশংসনশ্লোকোঽপি প্রথমং লিখিতঃ*।[৪৫] বরং মঙ্গলাচরণ শ্লোকে অম্বিকার কটাক্ষপাতের দ্বারা কামিনীকুলের নয়নের অব্যর্থ কটাক্ষকেই বোঝানো হয়েছে। বেমভূপালও তাঁর *শৃঙ্গারদীপিকা* টীকায় *অমরুশতককে* শৃঙ্গারকাব্য বলেছেন।[৪৬] তাছাড়া আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ, ভোজরাজ প্রমুখ আলংকারিক তথা

ম্যাকডোনেল, কীথ, এস্. কে. দে প্রমুখ গবেষকগণও *অমরুশতককে* শৃঙ্গারকাব্য বলে স্বীকার করেছেন। এই *অমরুশতক* কার রচনা; তা স্পষ্টভাবে বলা না গেলেও কাব্যটি যে শংকরাচার্যের রচনা নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমরুর সময়কাল বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় নি। ব্যক্তিপরিচয় বিষয়ে সন্দিগ্ধতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সময়কাল বিষয়ে পণ্ডিতমহল তেমন সুরাহা করতে পারেন নি। তবে তাঁর মুক্তকগুলি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে অন্যান্য কবি-আলংকারিকগণ সেগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। সর্বপ্রথম আচার্য বামনের *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে অমরুশতকের* শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে। বামনের সময়কাল খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। আবার *ধ্বন্যালোক* রচয়িতা আনন্দবর্ধনও অমরুর শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর সময়কাল খ্রিস্টিয় নবম শতক। কিন্তু উভয়ের কেউই উদ্ধৃতিগুলিতে কবি বা কাব্যের নামোল্লেখ করেন নি। তবে গবেষকগণ বিভিন্ন সংস্করণের গ্রন্থ ও সুভাষিতসংগ্রহ দেখে শ্লোকগুলি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এই বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে ডঃ এস্. এন্. দাসগুপ্ত অমরুর সময়কাল খ্রিস্টিয় অষ্টম শতক বলে মনে করেছেন।[৪৭] ডঃ কীথের মতে অমরু ছিলেন মহাকবি কালিদাসের পরবর্তী এবং শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরির পূর্বকালীন।[৪৮] আবার ডঃ এস্. কে. দে অমরুর সময়কাল নবম শতকের মাঝামাঝি বলে মনে করেন।[৪৯] যেহেতু বামন ও আনন্দবর্ধন তাঁদের অলংকারশাস্ত্রে *অমরুশতকের* শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তাই তর্ক-বিতর্ক যা'ই থাক না কেন অমরুর সময়কাল খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের পরে নয়- একথা বলা চলে।

প্রকৃত *অমরুশতকে* সর্বসমেত কতগুলি শ্লোক ছিল- এ বিষয় নিয়ে মতান্তর আছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন শ্লোক সংখ্যা বিদ্যমান। অনেক সংস্করণে কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। *অমরুশতকের* সমস্ত সংস্করণের মধ্যে থেকে চারটি সংস্করণকে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয় যথা-

(ক) অর্জুন বর্মদেবের ব্যাখ্যাসহ পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণ (৯৯ টি শ্লোক)

(খ) বেম-ভূপালের ব্যাখ্যাসহ দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণ (১০১ টি শ্লোক)

(গ) রবিচন্দ্রের ব্যাখ্যাসহ উত্তর ভারতীয় সংস্করণ (১০০ টি শ্লোক)

(ঘ) রুদ্রমদেবকুমারের ব্যাখ্যাসহ মিশ্র সংস্করণ (১১৪ টি শ্লোক)

বিভিন্ন সংস্করণের মূল শ্লোক, প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রভৃতির পর্যালোচনা করে *অমরুশতকের* শ্লোক সংখ্যা একশোর অধিক বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে প্রতিটি সংস্করণে যে শ্লোকগুলির অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়, তার সংখ্যা মাত্র ৫১। এই কাব্যটির উপরে কৃত টীকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। *অমরুশতকের* অনেকগুলি টীকার মধ্যে অন্যতম ছয়টি টীকা হল ১. অর্জুনবর্মদেবের *রসিকসঞ্জীবিনী* ২. বেমভূপালের *শৃঙ্গারদীপিকা* ৩. রুদ্রমদেবের টীকা ৪. রবিচন্দ্রের টীকা ৫. সূর্যদাসের *শৃঙ্গারতরঙ্গিণী* ৬. শেষরামকৃষ্ণের *রসিকসঞ্জীবনী*।

অমরুশতকের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এবং হালের *গাহাসত্তসঈ* এর মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মধ্যে বিষয়গত একপ্রকার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। হাল মঙ্গলাচরণে মহাদেবের প্রতি সন্দেহ বশতঃ অম্বিকার রক্তিম মুখপদ্মের উল্লেখ করেছেন, অমরু উল্লেখ করেছেন অম্বিকার কটাক্ষপাতের। উভয় ক্ষেত্রেই মঙ্গলাচরণের অন্তরালে জাগতিক নর-নারীর প্রণয়-ব্যবহারের আভাস পাওয়া যায়। তবে অমরু তাঁর রচনায় পূর্ববর্তী কাব্যের উপাদান ব্যবহার করলেও কবির প্রয়োবিন্যাস ও কাব্যিক বৈদগ্ধ্যে সেগুলি নবীভূত হয়ে সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দ বিধান করেছে। নর-নারীর মান-অভিমান, মিলনের আনন্দ, বিরহব্যথা, অনুরাগ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, নববধূর অভিমান, প্রথম প্রেমের অনুরাগ, সপত্নীর প্রণয়-কলহ, অবৈধ প্রেম, নারী-পুরুষের চারিত্রিক স্খলন, দীর্ঘ অভিমানের পর পুনঃ অনুরাগ, প্রেমে হতাশা ইত্যাদি শৃঙ্গাররসের অনুভূতিগুলি কবিপ্রতিভার স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মিলন ও বিরহ কিভাবে নায়িকার শরীরে ও মনে প্রভাব বিস্তার করে; কবি তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন-

ম্লানং পাণ্ডু কৃশং বিযোগবিধুরং লম্বালোকং সালসং
ভূযস্তত্-ক্ষণজাতকান্তি রভসপ্রাপ্তে ময়ি প্রোষিতে।
সাটোপং রতিকেলিকালসরসং রভ্যং কিমপ্যাদরা-
দ্যত্পীতং সুতনোর্মযা বদনকং বক্তুং ন তত্পার্যতে।।[৫০]

সম্ভোগে নায়ক-নায়িকার আত্মজ্ঞানহীন অবস্থার একটি বর্ণনা দিয়েছেন-

সুপ্তা কিং নু মৃতা নু কিং মনসি কিং লীনা বিলীনা নু কিম্।।
কান্ত তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বযং ৰন্ধনা-
দ্বাসো বিশ্লথমেখলাগুণধৃতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্।

এতাবত্ সখি! বেদ্মি সাম্প্রতমহং তস্যাঙ্গসঙ্গে পুনঃ

কোঽযং কাস্মি রতং নু বা কথমিতি স্বল্পাপি মে ন স্মৃতিঃ।।[৫১]

একই শয্যায় শায়িত নায়ক ও নায়িকার মান-অভিমান অথচ উভয়ই মিলনের জন্য ব্যাকুল কিন্তু কে প্রথমে অভিমান ভাঙাবে?– কবি এই অবস্থারও এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন-

একস্মিঞ্শযনে পরাঙ্মুখতযা বীতোত্তরং তাম্যতো-

রন্যোন্যং হৃদযস্থিতেঽপ্যনুনযে সংরক্ষতোগৌরবম্।

দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনান্মিশ্রীভবচ্চক্ষুষো-

র্ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসং ব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহঃ।।[৫২]

সমগ্র কাব্যশরীরে সাধারণ মানব-মানবীর অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে কবি আপন কল্পনায় মূর্ত করে তুলেছেন। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, যতদিন প্রেম থাকবে, বিরহ থাকবে, মান-অভিমান থাকবে; ততদিন এই কবিতাগুলির অনুরণন মানুষের অন্তঃস্থলে হতে থাকবে।

১.৮.৩ শতকত্রয়: (খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক) সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত শতকগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভর্তৃহরি বিরচিত শতকত্রয় অর্থাৎ *শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক* ও *বৈরাগ্যশতক* । কবির ব্যক্তিগত জীবন ও রচনাকাল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য তেমন পাওয়া যায় না। তবে ভর্তৃহরির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জনসমাজে একটি কিংবদন্তি রয়েছে, যার সারমর্ম হল এই- ভর্তৃহরি জীবনের চরম ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে সাংসারিক ভোগ-বাসনা বিষয়ে অন্তরের অনুভূতি প্রকাশের জন্য এই শতকত্রয় রচনা করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতারূপে ভর্তৃহরির নাম পাই যথা- *বাক্যপদীয়*-রচয়িতা ভর্তৃহরি, *রাবণবধ* বা *ভট্টিকাব্যের* রচয়িতা বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি এবং শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরি। এখন প্রশ্ন হল এই তিনটি গ্রন্থের রচয়িতা ভর্তৃহরি কী একই ব্যক্তি নাকি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি? এই বিষয়ে প্রথমে *রাবণবধ* বা *ভট্টিকাব্যের* রচয়িতা ভর্তৃহরির সঙ্গে শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরির প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করা যাক। *ভট্টিকাব্য*-কার কাব্যের শেষে জানিয়েছেন যে তিনি রাজা শ্রীধরসেন শাসিত বলভীপুরীতে এই কাব্যটি রচনা করেছেন।[৫৩] বলভী অধিপতি চারজন শ্রীধরসেনের নাম পাওয়া যায়। এদের সময়কাল ৪৯৫

খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ। অতএব এই ভট্টি বা ভর্তৃহরির সময়কাল ষষ্ঠ শতক থেকে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ। তবে বিনায়ক নারায়ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও পণ্ডিত শিবদত্ত সম্পাদিত *ভট্টিকাব্যের* এই শ্লোকে *শ্রীধরসেননরেন্দ্র* স্থানে *শ্রীধরসূনুনরেন্দ্র* গৃহীত হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায় রাজা শ্রীধরের পুত্র নরেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন। কিন্তু *ভট্টিকাব্যের* শব্দচয়ণ ও কাব্যসুষমা শতকত্রয়ের চেয়ে অনেক উপরে। শতকত্রয়ে অলংকার প্রয়োগের বৈচিত্র্য থাকলেও *ভট্টিকাব্যের* মতো উচ্চতর পর্যায়ে তা যেতে পারেনি। তাছাড়া শতকত্রয়ের কিছু কিছু শ্লোকে প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উভয়ের উপাস্য দেবতাও ভিন্ন। শতককার মূলত শিবের উপাসক ছিলেন, তবে তিনটি কাব্যে তিনি যথাক্রমে পরব্রহ্ম, কামদেব ও শিবের স্তুতি করেছেন[৫৪], অন্যদিকে *ভট্টিকাব্য*-কার স্তুতি করেছেন বিষ্ণুর।[৫৫]

চৈনিক পরিব্রাজক ইসিং (Yi-tsing বা I-tsing) সপ্তম শতকে ভারতে আসেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির দেহাবসান ঘটে। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে ভট্টি যে বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী ছিলেন না, বিষ্ণুই যে তাঁর একমাত্র উপাস্য সে বিষয়টি ভট্টিকাব্যের মঙ্গলাচরণে স্পষ্ট।

এবার প্রশ্ন হল শতককার ও বাক্যপদীয়কার কী একই ব্যক্তি? এই বিষয়েও তেমন কোনো সদর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় না। শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরির বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কোনো অনুরাগ ছিল- এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল এই যে, উভয়ই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন। জানা যায়, শতককার পরবর্তীকালে গোরক্ষনাথ নামক এক যোগীর কাছ থেকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। অপরদিকে ডঃ এস্. কে. দে জানিয়েছেন ইসিং এর বিবরণীতে রয়েছে যে, বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি সংসার ও বৈরাগ্য- উভয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, সেই বিষয়ে বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসত্ব অবলম্বন করেন।[৫৬] আবার শতককার *নীতিশতকের* মঙ্গলাচরণে পরব্রহ্মের স্তুতি করেছেন; যা *বাক্যপদীয়ের* মঙ্গলাচরণের সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ।

এই সমস্ত দিকের তুলনা করে অনুমান করা যায় যে *বাক্যপদীয়* রচয়িতা এবং শতকত্রয় রচয়িতা ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের কোনো এক সময়ে শতকত্রয় রচনা করেছেন।

শতকত্রয়ের বেশিরভাগ শ্লোক ভর্তৃহরির রচিত হলেও অন্যান্য কবির শ্লোকও এখানে পাওয়া যায়। কোনো কোনো সংস্করণে *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* একটি শ্লোক হুবহু রয়েছে।[৫৭] আবার কিছু সংস্করণে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। শতকত্রয়ে বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার থাকায় অন্যান্য কাব্যের শ্লোকের সংমিশ্রণ আরও সহজ হয়েছে। শতকত্রয়ের ১২টির মতো টীকা পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইন্দ্রজীৎ, গুণবিনয়, মীননাথ, রামচন্দ্রের টীকা উল্লেখযোগ্য।

কবি *নীতিশতকে* মানব জীবনের কর্তব্য, অসৎ সংসর্গের কুপ্রভাব, সৎসঙ্গের সুফল, জীবনের লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা, জ্ঞানলাভের সুফল, আত্মসম্মানবোধ, চরিত্রের নিষ্কলুষতা, স্বকার্য সাধনে সততা, পরোপকার, অর্থ বা বিত্তের সুফল ও কুফল, দুর্জনের চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। কবি তাঁর *নীতিশতকে* বর্ণনীয় বিষয়গুলিকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন; সেগুলিকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে- অজ্ঞপদ্ধতী (শ্লোক নং ৩-১৪), বিদ্বৎপদ্ধতী (১৫-২৮), মানশৌর্যপদ্ধতী (২৯-৩৮), অর্থপদ্ধতী (৩৯-৫১), দুর্জনপদ্ধতী (৫২-৬১), সুজনপদ্ধতী (৬২-৬৯), পরোপকারপদ্ধতী (৭০-৭৯), ধীরপদ্ধতী (৮০-৮৯), দৈবপদ্ধতী (৯০-৯৮), কর্মপদ্ধতী (৯৯-১০৮)। ভর্তৃহরি মানব জীবনে কর্মকেই শ্রেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু কর্মফলের জন্যই জীব সুখ ও দুঃখভাগী হয়, তাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় একমাত্র পুণ্যকর্ম। বৃথা যশ বা গুণের প্রতি আসক্ত না হয়ে সৎকর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন তিনি।[৫৮] জীবনের চরম প্রবঞ্চনায় ব্যথাতুর কবি পার্থিব প্রেম-প্রীতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এইভাবে-

যাং চিন্তযামি সততং মযি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ।।[৫৯]

আমি যে রমণীর কথা সর্বদা চিন্তা করি, সে আমার প্রতি অনুরক্ত নয়। সে রমণী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত। সেই পুরুষ আবার তার প্রতি আসক্ত নয়, অন্য এক নারীতে আসক্ত। অন্য কোনো রমণী আবার আমায় কামনা করে পরিতৃপ্ত হয়। এমতাবস্থায় আমার কাম্য নারীকে, তার কাঙ্খিত পুরুষকে, কামদেবকে এবং আমার প্রতি অনুরক্তাকে ধিক্কার।

কবি ভর্তৃহরির দ্বিতীয় শতককাব্য *শৃঙ্গারশতক*। এই শতকেও কবি বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেছেন যথা- কামিনীপ্রশংসা (২-২১), সম্ভোগবর্ণনা (২২-৪১), কামিনীনিন্দা (৪২-৬২), সুবিরক্ত-দুর্বিরক্ত বর্ণনা (৬৩-৮২), ঋতুবর্ণনা (৮৩-১০২)।

গাহাসত্তসঈ বা *অমরুশতক* শুধুই ভোগের উপকরণের কথা বলেছে। শরীরসর্বস্ব নর-নারীর কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-হতাশা এইসব বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী সুখ আর সুদীর্ঘ দুঃখ, হতাশা থেকে নিষ্কৃতির খবর মেলে না সেখানে। ভর্তৃহরির *শৃঙ্গারশতক* কিন্তু অন্য কথা বলে। তিনি নারী-প্রাপ্তিকে একদিকে যেমন পুণ্যের ফল বলেছেন, তেমনই নারীর মৃদুহাস্য, লাস্যময়ী ভঙ্গী, কটাক্ষপাত- এই সকলকে বলেছেন পার্থিব বন্ধনের কারণ।[৬০] তিনি নারী-সৌন্দর্যের অকপট প্রশংসাও করেছেন-

দ্রষ্টব্যেষু কিমুত্তমং মৃগদৃশঃ প্রেমপ্রসন্নং মুখং
ঘ্রাতব্যেষ্বপি কিং তদাস্যপবনঃ শ্রাব্যেষু কিং তদ্বচঃ।
কিং স্বাদ্যেষু তদোষ্ঠপল্লবরসঃ স্পৃশ্যেষু কিং তদ্বপু-
র্ধ্যেয়ং কিং নবযৌবনং সহৃদয়ৈঃ সর্বত্র তদ্বিভ্রমাঃ॥[৬১]

রসিকের কাছে প্রকৃষ্ট দর্শনীয় বস্তু কি?- হরিণনয়নার প্রেমমধুর মুখমণ্ডল। ঘ্রাণযোগ্য উত্তম পদার্থ কি?- তার মুখ নিঃসৃত নিঃশ্বাসবায়ু। শ্রবণীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু কি?- তার বাণী। আস্বাদযোগ্য বস্তুর মধ্যে কি উৎকৃষ্ট?- তার পল্লবতুল্য কোমল অধরের সুধা। স্পর্শযোগ্য সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু কি?- তার দেহ। ধ্যানযোগ্য অভিলষণীয় বস্তু কি?- তার অভিনব যৌবন ও তার বিভ্রম।

শৃঙ্গারশতকের শ্লোকগুলিতে কবির এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা থেকে নারী-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতীতি হয়। যেন প্রেমে প্রতারিত কবি আর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চাইছেন না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহসৌন্দর্যও অস্বীকার করতে পারছেন না। বিষয়টি আরও বেশি করে পরিস্ফুট হয় কাব্যের অন্তিম দুটি শ্লোকে-

বৈরাগ্যে সঞ্চরতি একঃ নীতৌ ভ্রমতি চাপরঃ
শৃঙ্গারে রমতে কশ্চিদ্ ভুবি ভেদাঃ পরস্পরম্॥
যদ্যস্য নাস্তি রুচিরং তস্মিংস্তস্য স্পৃহা মনোজ্ঞেঽপি।

রমণীযেঽপি সুধাংশৌ ন মনঃকামঃ সরোজিন্যাঃ॥

একজন বৈরাগ্য আশ্রয় করে বিচরণ করছেন, অপরজন নীতিমার্গ অবলম্বন করছেন, কেউ আবার শৃঙ্গার রসের অনুভূতিতে আনন্দ লাভ করছেন। পৃথিবীতে মানুষগণ পরস্পর ভেদবিশিষ্ট। যে বস্তু যার প্রীতিকর নয়, সে বস্তু অতি মনোহর হলেও তাতে তার কোনো আকাঙ্খা থাকে না। চন্দ্র রমণীয় হলেও তার প্রতি পদ্মের কোনো আকর্ষণ নেই। মনে হয়, তিনি বোঝাতে চাইছেন- যার নারীর প্রতি আসক্তি আছে তিনি সে সুখ উপভোগ করুন, কিন্তু কবির আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নেই।

বৈরাগ্যশতকে কবি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- এই চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্মসাধনা ও মোক্ষের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে মোক্ষের পথে অগ্রসর হয়েছেন। এখানে বিষয়ের পরম্পরাক্রমে আলোচ্য দিকগুলির কথা বলেছেন- তৃষ্ণাদূষণ (৩-১১), বিষয় পরিত্যাগ বিড়ম্বনা (১২-২১), যাচ্ঞা দৈন্য (২২-৩১), ভোগের অস্থিরতা (৩২-৪১), কালমহিমা (৪২-৫১), যতিনৃপতি সংবাদ (৫২-৬১), চিত্তসম্বোধন (৬২-৭১), নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক (৭২-৮১), শিবার্চনা (৮২-৯১), অবধূতচর্যা (৯২-১০১)।

এই শতকের শুরুতে কবি তাঁর অতীত জীবনের নিষ্ফলতার জন্য বিলাপ করেছেন। তিনি অহেতুক কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, অন্যের দুর্ব্যবহার, কটুক্তি, অপমান নির্বিবাদে সহ্য করেছেন কিন্তু সুখলাভ হয়নি। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন-

ক্ষান্তং ন ক্ষমযা গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
সোঢো দুঃসহশীতবাততপনক্লেশো ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিযমিতপ্রাণৈর্ন শম্ভোঃ পদং
তত্তত্কর্ম কৃতং যদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতাঃ॥[৬২]

আমরা (পরদত্ত) দুঃখ সহ্য করেছি, তবে ক্ষমার জন্য নয়। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ ত্যাগ করেছি, সন্তুষ্টির জন্য নয়। শীত-বায়ু-রৌদ্রজনিত অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু তপশ্চরণ করিনি। দিবা-রাত্রি অর্থের কথা চিন্তা করেছি, কিন্তু প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করে শিবের চরণ ধ্যান করিনি। মুনিগণ যেসকল কর্ম করে থাকেন, আমরা সেসকল কর্ম করেও কর্মের ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাই যখন কবির মনে চৈতন্যের উদয় হল তখন তিনি অকপটে বললেন- *ন*

সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলম্ অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে কুশল আছে বলে আমি আর মনে করি না। এ যেন সাংসারিক জীবনের অসারতা পর্যবেক্ষণের পর বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হওয়া। এখন তাঁর হৃদয়ে শুধু ভক্তি ভাবনা। তিনি জীবনোৎসর্গ করে দিতে চান শংকরের পদপ্রান্তে। নির্জন গুহায় তাঁর সাধনায় ব্যাপৃত হতে চান-

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃ পযোভিঃ শুচিকুসুমফলৈরর্চযিত্বা বিভো ত্বাং

ধ্যেযে ধ্যানং নিযোজ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবপর্যঙ্কমূলে।

আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বত্প্রসাদাৎস্মরারে

দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুত্থম্॥[৬৩]

শৃঙ্গার-নীতি-বৈরাগ্য এই শতক তিনটি সাংসারিক মোহে আচ্ছন্ন মানুষের ক্রমে ক্রমে আত্মিক সমোন্নতির প্রতীকস্বরূপ। সংস্কৃত কবিগণের দৃষ্টিতে কাম শুধু কাম নয়, এই কাম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়ে শুদ্ধ আত্মচৈতন্যে পর্যবসিত হয়। এই দার্শনিক চিন্তাটি *শৃঙ্গারশতকে* প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধে কবির এই শতকত্রয় বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। অনুষ্টুভ্, আর্যা, পৃথ্বী, উপজাতি, শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, শিখরিণী প্রভৃতি ছন্দো ও উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে কবি শতকত্রয়ের শ্লোকগুলিকে বৈচিত্র্যময় ও উপাদেয় করে তুলেছেন।

১.৮.৪ চণ্ডীশতক: (খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক) কবি বাণভট্ট বিরচিত একটি মুক্তককাব্য হল *চণ্ডীশতক*। কবি বাণভট্ট মূলত তাঁর *কাদম্বরী* কথাকাব্য ও *হর্ষচরিত* আখ্যায়িকার রচয়িতারূপেই প্রসিদ্ধ। বাণের অন্যান্য রচনাগুলি হল *শিবশতক* বা *শিবস্তুতি, মুকুটতাড়িতক, শারদচন্দ্রিকা, পার্বতীপরিণয়*। এগুলির মধ্যে *চণ্ডীশতক* ও *শিবশতক* স্তোত্রকাব্য এবং *মুকুটতাড়িতক, শারদচন্দ্রিকা* ও *পার্বতীপরিণয়* হল নাটক। সমস্ত রচনাগুলি অধুনা লব্ধ নয় কিন্তু কোনো কোনো কবি-আলংকারিকের গ্রন্থে এগুলির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। অধিকাংশ গবেষক *চণ্ডীশতককে* বাণের রচনা বলে মান্যতা দিয়েছেন।

কান্যকুব্জ বা কনৌজের (বর্তমান কানপুরের ৮০ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীরে) বাৎস্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে বাণভট্টের জন্ম। পিতা চিত্রভানু ও মাতা রাজ্যদেবী। বাণ *হর্ষচরিতের* প্রথম ও দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে তথা তৃতীয় উচ্ছ্বাসের প্রথমার্ধে আত্মজীবনী সম্পর্কে

সংক্ষেপে বলেছেন। এছাড়াও *কাদম্বরীর* ভূমিকা অংশেও নিজের সম্পর্কে দু-এক কথা বলেছেন। তিনি স্থাণ্বীশ্বরের বা স্থানেশ্বরের রাজা শ্রীহর্ষের রাজসভাকবি ছিলেন।

আলোচ্য কাব্যের বিষয়বস্তু হল মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীচণ্ডিকার স্তুতি। বৈয়াসিক *মহাভারতের* শল্যপর্বের ৪৪ তম অধ্যায় থেকে ৪৬ তম অধ্যায় পর্যন্ত চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। পরবর্তীকালে পৌরাণিক সাহিত্যেও শ্রীচণ্ডিকার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। *মার্কণ্ডেয় পুরাণের* ৫১ তম অধ্যায় থেকে ৯৩ তম অধ্যায় পর্যন্ত দুর্গার অসুর বধের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি বাণ স্রগ্ধরা ছন্দে বিধৃত ১০২ টি শ্লোকের মাধ্যমে এই শতকে চণ্ডীর মহিমা কীর্তন করেছেন। শ্রীচণ্ডিকার পাশাপাশি শিব, কার্তিকেয়, গণেশ, মহিষ, জয়া, বিজয়া প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পৌরাণিক চরিত্রগুলির সম্বন্ধেও বলেছেন। দেবগণকে কবি তাঁর কাব্যে উত্তম পুরুষে সম্ভাষিত করেছেন।

২৫, ৪৫ এবং ৫৪ নং শ্লোকে যোগমায়ার সঙ্গে দেবী দুর্গার অভিন্নত্ব সূচিত হয়েছে। যোগমায়া বা মহামায়া সকল প্রপঞ্চের কারণ, আদ্যাশক্তির রূপ, যে রূপ সর্বগুণান্বিত ও অব্যয়। কবি চণ্ডীকে অযোনিসম্ভূতা ও সকল দৈবশক্তির ঊর্ধে স্থাপিত করেছেন। সকল দেবতা যখন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণের সাত্ত্বিক তেজোপুঞ্জের সমন্বয়ে দুর্গার আবির্ভাব হল।[৬৪] বাণ এই কাব্যে সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেছেন। তাই তিনি মঙ্গলাচরণ শ্লোকে মহিষাসুরের মর্দনকারী মা চণ্ডিকার সৌম্যমূর্তির বন্দনা করেছেন এবং পাঠক-শ্রোতাগণকে ক্রোধাদি মানসিক বিকার সংবরণের উপদেশ দিয়েছেন।[৬৫]

আমাদের অন্তরের সাত্ত্বিক জ্ঞানসমূহকে তমোরূপ মহিষাসুর আবৃত করে রাখে। এই অজ্ঞান অপসৃত হলে মানুষের আত্মিক সমোন্নতি সম্ভব হয়। দুর্গা শুধু অবলীলায় এই তমোরূপ অসুরকে নিহত করলেন। তাই অসুর নিধনকালে তাঁর কোনো শারীরিক বিকৃতি ছিল না অর্থাৎ তাঁর অবয়বে ক্রোধের প্রকাশ ছিল না।[৬৬]

বাণের কল্পনাশক্তির স্পর্শে অতি সামান্য বিষয়ও সহৃয় সামাজিকের চিত্তে চমৎকৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। চণ্ডী যখন ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুরকে আঘাত করলেন তখন অসুরের শরীর থেকে ত্রিধারায় রক্ত নির্গত হতে থাকে- এই স্বাভাবিক চিত্রপটে কবি উৎপ্রেক্ষার সহযোগে একাধিক বিষয়ের কল্পনা করেছেন। রক্তের এই তিনটি ধারা দেখে দেবতারা মনে মনে

ভাবছেন- (ক) ত্রিলোককে গ্রাস করার ইচ্ছায় মৃত্যু (যমরাজ) কী একই সঙ্গে তিনটি রক্তিম জিহ্বা বের করেছেন! (খ) বিষ্ণুর চরণ-পদ্মের অরুণাভ কান্তির দ্বারা বিষ্ণুর পদ-পুণ্যতোয়া গঙ্গার তিনটি ধারা (জাহ্নবী, অলকানন্দা, গঙ্গা) রক্তিম হয়েছে। (গ) ত্রিসন্ধ্যোপাসক শিবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ত্রিসন্ধ্যা একত্রে উপস্থিত হয়েছেন।[৬৭]

সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা যেকোনো নারীর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। মহিষাসুর বধের পর শিব ও পার্বতীর কথোপকথনে এই বিষয়টিকে কবি সরস বাগভঙ্গীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। পার্বতী গঙ্গাকে তাঁর সপত্নী মনে করে মহাদেবকে কৌতুকের সঙ্গে তিরস্কার করেছেন এইভাবে-

মেরৌ মে রৌদ্রশৃঙ্গক্ষতবপুষি রুষো নৈব নীতা নদীনাং
ভর্তারো রিক্ততাং যত্তদপি হিতমভূন্নিঃসপত্নোঽত্র কোঽপি।
এতন্নো মৃষ্যতে যন্মহিষ কলুষিতা স্বর্ধুনী মূর্ধ্নি মান্যা
শম্ভোর্ভিন্দ্যাদ্ধসন্তী পতিমিতি শমিতারাতিরীতীরুমা বঃ॥[৬৮]

অন্যদিকে, পত্নীর দ্বারা পতির নাম উচ্চারণ যেহেতু তৎকালীন সময়ে প্রথাসিদ্ধ ছিল না, তাই *অভূন্নিঃসপত্নোঽত্র কোঽপি* এই বাক্যাংশের মাধ্যমে মহাদেবকে প্রকারান্তরে নির্দেশ করা হয়েছে। এইরকম আরও কিছু শ্লোক রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে কবি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত লোকব্যবহার, সংস্কৃতি, নারী-সুরক্ষা ও তাদের বিবিধ অঙ্গভূষণের সঙ্গে পাঠকগণকে পরিচয় করিয়েছেন।

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিবাহিতা নারী পতি ও পুত্রগণের দ্বারা রক্ষিত হতেন। তাই মহিষাসুর যুদ্ধে অবতীর্ণ দুর্গাকে দেখে বিদ্রূপপূর্ণ ভঙ্গিতে শিব ও গণেশ-কার্ত্তিকেয়কে এইভাবে তিরস্কার করেছেন-

ৰালোঽদ্যাপীশজন্মা সমরমুড্ডপভৃত্ভস্মলীলাবিলাসী
নাগাস্যঃ শাতদন্তঃ স্বতনুকরমদাত্ বিহ্বলঃ সোঽপি শান্তঃ।
ধিগ্যাসি ক্বেতি দৃপ্তং মৃদিততনুমদং দানবং সংস্ফুরোক্তং
পাযাদ্বঃ শৈলপুত্রী মহিষতনুভৃতং নিঘ্নতী বামপার্শ্ব্যা॥[৬৯]

কাব্যশরীর জুড়ে শ্লেষ, অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার তথা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অর্থালংকারের প্রয়োগ-চাতুর্যে কবি চমৎকৃতি সৃষ্টি করেছেন। তবে, শ্লোকগুলির অর্থ উদ্ধার করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। তাই অনেক ক্ষেত্রে রসোপলব্ধির অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। কবির কল্পনাশক্তি অনেক সময় রসাভাসের কারণও হতে পারে। সমালোচকগণের মতে *চণ্ডীশতক* কবির প্রথম দিকের রচনা। তাই এই কাব্যে বাণের স্বভাবসিদ্ধ শব্দসন্ধানের প্রয়োগ থকলেও *কাদম্বরী* অথবা *হর্ষচরিতের* মতো রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেনি। কিংবদন্তী রয়েছে যে, কবি বাণ তাঁরই সমসাময়িক কবি তথা তাঁর শ্যালক অথবা শ্বশুর ময়ূরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বশত *চণ্ডীশতক* রচনা করেন। তাই শাস্ত্রীয় বৈদগ্ধ্য প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা কাব্যটিকে রসোত্তীর্ণ হতে দেয়নি।

১.৮.৫ সূর্যশতক: (খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক) কবি ময়ূরভট্ট ভগবান সূর্যের স্তুতি বিষয়ক ১০১ টি শ্লোকে *সূর্যশতক* বা *ময়ূরশতক* রচনা করেন। সম্পূর্ণ কাব্যটি স্রগ্ধরা ছন্দে বিধৃত। বৈবাহিক সম্বন্ধে ময়ূরভট্ট বাণের শ্বশুর বা শ্যালক ছিলেন। অতএব ময়ূরের সময়কালও খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক। কিংবদন্তি রয়েছে যে কবি ময়ূর *ময়ূরাষ্টক* শীর্ষক এক কবিতায় আটটি শ্লোকে আপন দুহিতা বা ভগিনী তথা বাণের স্ত্রীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনা এতটাই অশোভন ছিল যে বাণের স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। সেই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই কবি *সূর্যশতক* রচনা করেন। আবার অন্যত্র এরকম কাহিনী পাওয়া যায় যে, একদা বাণের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কলহ হয়, বাণ অভিমান ভাঙানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু অভিনামিনী তুষ্ট হন না উপরন্তু প্রণত বাণকে পদাঘাত করেন। এই বিষয়টি ময়ূরের নজরে পড়ে এবং মেয়ের এই ব্যবহারে দুঃখ পান। পরবর্তীকালে বাণ স্ত্রীর অনুনয়মূলক একটি শ্লোক রচনা করেন-

গতপ্রাযা রাত্রিঃ কৃশতনু শশীযত ইব

প্রদীপোঽযং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণত ইব।

প্রণামান্তে মানং ত্যজসি ন যথা ত্বং ক্রুধসহ

কুচপ্রত্যাসত্ত্যা হৃদযমপি তে সুভ্রু কঠিনম্॥

ক্রোধান্বিত ময়ূর শ্লোকটির প্রত্যুত্তর করে বসলেন – 'এমন হৃদয়হীনাকে সুভ্রু না বলে চণ্ডী বলাই সমীচীন।' পতি-পত্নীর কলহে পিতার এইরকম অনাকাঙ্খিত যোগদানে বাণের পত্নী রুষ্ট

হন এবং ময়ূরকে শাপ দেন- 'আমার মুখ থেকে নিঃসৃত তাম্বুলরসের স্পর্শে তোমার কুষ্ঠ হবে।' কোনো প্রকারে এই অভিশাপ বাস্তবায়িত হয় এবং ময়ূরের সারা শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

বাণ ও ময়ূরের মধ্যে বন্ধুত্ব-সংঘাত, রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি বিষয়ে ছোট ছোট কাহিনী বিবিধ গ্রন্থে (*নবসাহসাঙ্কচরিত, প্রবন্ধচিন্তামণি, কাব্যপ্রকাশ*) তথা লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে। (বিশদ তথ্যের জন্য গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* দ্রষ্টব্য) *সূর্যশতকের* গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে কিছু মতবৈষম্য রয়েছে, যেমন *সূর্যশতকের* অন্তিম শ্লোকে[৭০] 'শ্রীময়ূরেণ' পদের স্থানে কিছু পাণ্ডুলিপিতে 'শ্রীময়ূখেন' পাঠান্তরটি গৃহীত হয়েছে, যার ফলে আলোচ্য কাব্যটির রচয়িতা বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাছাড়া রচনারীতির দিক থেকে *ময়ূরাষ্টক* ও *সূর্যশতকের* মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই অনেকের মতে *ময়ূরাষ্টক* কবি ময়ূরের রচনা হলেও *সূর্যশতক* অন্য কোনো কবির রচনা। তবে অধিকাংশ কাব্যসমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ *সূর্যশতককে* ময়ূরের রচনা বলে স্বীকার করেছেন।

সূর্যোপাসনা শুধু ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বহির্ভারতেও বিভিন্ন নামে সূর্যের স্তুতি করা হয়েছে। মেক্সিকো, ইজিপ্ট, ইরাণ, দক্ষিণ ইউরোপ, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ও মহাদেশেও সূর্যের উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। (বিশদে জানার জন্য ভুবনেশ্বর কর শর্মা সম্পাদিত *সূর্যশতকম্* এর কমললোচন করের ইংরেজি ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য) অনেকের মতে আপাতদৃষ্টিতে কবির ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে *সূর্যশতক* রচিত হয়েছে বলে মনে হলেও বস্তুত কবি কাব্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এই কাব্য রচনা করেছেন। সূর্যের মহিমা কীর্তন বিষয়ক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের ভাবনামাত্র।

সূর্যশতকে সূর্যবন্দনায় সূর্যের রশ্মি, রথবাহী অশ্বসমূহ, রথের সারথি অরুণ, সৌরমণ্ডল এবং আরোগ্য দানে সূর্যের ক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে ভক্তিভাবনার চেয়ে শব্দার্থের চাতুর্যই বেশি করে প্রকটিত হয়েছে। কাব্যের শুরু ও সমাপ্তি উৎপ্রেক্ষা অলংকারের মাধ্যমে। ১৫, ৩৪, ৫০ এবং ৬৮ নং শ্লোকে কবি উপমার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। অনুপ্রাস অলংকার প্রয়োগের দক্ষতায় কবি ভারবি ও মাঘের সমকক্ষ লাভ করেছেন। যেমন-

সাদ্রিদ্যূর্বীনদীশা দিশতি দশ দিশো দর্শযন্ দ্রাগ্দৃশো যঃ

সাদৃশ্যং দৃশ্যতে নো সদশশতদৃশি ত্রৈদশে যস্য দেশে।

দীপ্তাংশুর্বঃ স দিশ্যাদশিবযুগদশাদর্শিতদ্বাদশাত্মা

শং শাস্ত্যশ্চাংশ্চ যস্যাশযবিদতিশযাদ্দন্দশূকাশনাদ্যঃ॥[৭১]

এখানে 'দ' ও 'শ' এর যথাক্রমে ২৫ ও ২৬ বার প্রয়োগ রয়েছে। এই শ্লোকটি যমক অলংকারেরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও ৯৮ নং শ্লোকে ২৫ বার 'গ' এর প্রয়োগ দেখা যায়।

ময়ূর কবি *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* অষ্টমূর্তি শিবের অনুরূপে অষ্টমূর্তি সূর্যের বন্দনা করেছেন-

ভূমিং ধাম্নোঽভিবৃষ্ট্যা জগতি জলময়ীং পাবনীং সংস্মৃতাব-

প্যাগ্নেযীং দাহশক্ত্যা মুহুরপি যজমানাত্মিকাং প্রার্থিতার্থৈঃ।

লীনামাকাশ এবামৃতকরঘটিতাং ধ্বান্তপক্ষস্য পর্ব-

ণ্যেবং সূর্যোঽষ্টভেদাং ভব ইব ভবতঃ পাতু বিভ্রত্ স্বমূর্তিম্॥[৭২]

এছাড়া, *কিরাতার্জুনীযের* নবম সর্গের ১৫ নং শ্লোকের অনুরূপে কবি আলোচ্য কাব্যের ৯৬ নং শ্লোকে অন্ধকার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কালিদাস কিংবা ভারবির শ্লোকগুলির মতো *সূর্যশতকের* শ্লোকগুলি সহৃদয়ের মনে আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারেনি। সমাসবদ্ধ কঠিন পদ, যমক-অনুপ্রাসের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অন্যান্য বাহ্য আড়ম্বর কবিকে বৈদগ্ধ্যের শীর্ষে উন্নীত করেছে ঠিকই কিন্তু এগুলিই আবার কাব্যরসিকের রসাস্বাদনে অন্তরায় হয়েছে।

১.৮.৬ আর্যাসপ্তশতী: (খ্রিস্টিয় একাদশ শতক) কবি গোবর্ধনাচার্য রচিত সাতশোর অধিক মুক্তকে বিন্যস্ত শতককাব্য হল *আর্যাসপ্তশতী*। কবি তাঁর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে কাব্যে বলেছেন-

যং গণযন্তি গুরোরনু যস্যাস্তে ধর্মকর্ম শঙ্কচিতম্*।

কবিমহমুশনসমিব তং তাতং নীলাম্বরং ৰন্দে॥[৭৩]

কাব্যের মুক্তকগুলি আর্যা ছন্দের দ্বারা নিবদ্ধ, সেই জন্যই হয়ত কাব্যটির এইরকম নামকরণ করা হয়েছে। সংস্কৃত কবিদের সময়কাল ও গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বিড়ম্বনা রয়েছে; তা এখানে নেই। আচার্য গোবর্ধনই যে *আর্যাসপ্তশতী* রচনা করেছেন এবং তাঁর সময়কাল যে খ্রিস্টিয় একাদশ শতক; সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে কোনো বিতর্ক নেই। তবে সেনবংশীয় কোন রাজা কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সে বিষয়ে সামান্য মতবৈষম্য রয়েছে। কবি

তাঁর কাব্যের একটি শ্লোকে *সেনকুলতিলক* শব্দটির প্রয়োগ করেন।[৭৪] এই শব্দটির মাধ্যমে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের কথা বলা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীসচল মিশ্র তাঁর *রসপ্রদীপিকা* টীকায় *সেনকুলতিলক* বলতে প্রবর সেনকে বুঝিয়েছেন। জানা যায়, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপের রাজদ্বারে একটি খোদাই করা শ্লোক দেখেছিলেন, যেখানে লক্ষ্মণ সেনের সভাসদগণের নাম ছিল-

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জযদেব উমাপতিঃ।

কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥

আবার, ধোয়ী (উপর্যুক্ত শ্লোকে কবিরাজ নামে আখ্যায়িত) তাঁর *পবনদূতে* লক্ষ্মণ সেনকে নায়করূপে দেখিয়েছেন।[৭৫] লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরসেন *সদুক্তিকর্ণামৃতে* শরণের একটি শ্লোকে *সেনবংশতিলক* শব্দের মাধ্যমে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বুঝিয়েছেন।[৭৬] অতএব, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গোবর্ধন প্রবরসেনের রাজসভাকবিরূপে নিযুক্ত থাকলেও তৎকালীন সময়ে লক্ষ্মণ সেন যুবরাজ ছিলেন। বাংলায় সেন রাজাদের সময়কাল ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ।

গোবর্ধন তাঁর কাব্যে মানব-মানবীর পারস্পরিক অনুরাগ, মান-অভিমান, প্রবাসী স্বামীর জন্য বিরহিনী স্ত্রীর বেদনা। বারবনিতার প্রতি গুণমুগ্ধতা প্রভৃতি সুনিপুনভাবে চিত্রায়িত করেছেন। আসন্ন বিরহে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক আকর্ষণকে কবি এইভাবে বর্ণনা করেছেন-

বাষ্পাকুলং প্রলপতোর্গৃহিণি নিবর্তস্ব কান্ত গচ্ছেতি।

যাতং দম্পত্যোর্দিনমনুগমনাবধি সরসতীরে॥[৭৭]

কবি সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয়প্রকার শৃঙ্গারের চিত্রাংকনে সীমাবদ্ধতার আশ্রয় নিয়েছেন। কিছু কিছু সমালোচক মনে করেন যে, আচার্য গোবর্ধনের *আর্যাসপ্তশতী* প্রাকৃত কবি হালের *গাহাসত্তসঈকে* অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। বিষয়বস্তু, শ্লোকসংখ্যা ইত্যাদির ভিত্তিতে একথা অনেকাংশে সত্য প্রতীত হলেও গোবর্ধনের সমসাময়িক তথা সেন রাজসভার অন্যতম কবি জয়দেব কিন্তু এ জাতীয় কাব্যরচনায় গোবর্ধনের প্রশংসা করেছেন।[৭৮] জয়দেব বোঝাতে চেয়েছেন যে এই শৃঙ্গাররস হল আদি রস বা শ্রেষ্ঠ রস, কিন্তু পরিমাণ মতো তার প্রয়োগ করা

প্রয়োজন। কবি গোবর্ধন তাঁর কাব্যে শৃঙ্গার রসের যথাযোগ্য প্রয়োগ করেছেন। হালের সপ্তশতীতে নর-নারীর ভোগসর্বস্ব জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, গোবর্ধনের সপ্তশতীতে তা অনেকটাই মার্জিত ও অধ্যাত্মভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিব ও গৌরীর প্রায় একই রকম ঘটনাকে দুই কবি দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, তার একটু তুলনা দেখালে বিষটি অবুধাবন করতে সুবিধা হবে। হাল বলেছেন-

পশুপতে রোষারুণপ্রতিমাসংক্রান্তগৌরীমুখচন্দ্রম্।

গৃহীতার্ঘ্যপঙ্কজমিব সন্ধ্যাসলিলাঞ্জলিং নমত॥[৭৯]

অর্থাৎ মহাদেব যখন হাতে জলধারণপূর্বক সন্ধ্যোপাসনা করছিলেন তখন গৌরী (স্বামী সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হয়েছে- এই চিন্তা করে) রক্তিম মুখে তাকালেন। সেই রক্তিম মুখশ্রী হস্তধৃত জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করেছিল, মনে হচ্ছিল যেন মহাদেব রক্তপদ্ম সহ জলাঞ্জলি অর্চনা করছেন।

অন্যদিকে গোবর্ধন বললেন-

প্রতিবিম্বিতগৌরীমুখবিলোকনোত্কম্পশিথিলকরগলিতঃ।

স্বেদভরপূর্যমাণঃ শম্ভোঃ সলিলাঞ্জলির্জযতি॥[৮০]

অর্থাৎ মহাদেব হাতে জলধারণপূর্বক সন্ধ্যা-উপাসনা করছিলেন। এমন সময়ে সেই জলে গৌরীর মুখের প্রতিবিম্ব পড়ায় মহাদেবের হস্তদ্বয় সাত্ত্বিকভাববশতঃ শিথিল হয় এবং হস্তধৃত জল পড়ে যায়। কিন্তু মহাদেবের শরীর থেকে নির্গত স্বেদবিন্দু দ্বারা জলাঞ্জলিও সম্পন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে *রসপ্রদীপিকা* টীকায় বলা হয়েছে- *গৌরীমুখপ্রতিবিম্বস্য বিলোকনেন য উৎকম্পঃ সাত্ত্বিকভাবরূপঃ তেন শিথিলাভ্যাং করাভ্যাং গলিতং পতিতং যস্মাত্ সশিথিলকরগলিতোঽঞ্জলিরিত্যর্থঃ। স্বেদসমূহেন সাত্ত্বিকান্তরেণ পুনঃ পূর্য্যমাণঃ সাত্ত্বিকবিকারস্যৈব বিরুদ্ধকার্য্যকর্তৃত্বাত্।*

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়েছে। হাল বা অমরু মঙ্গলাচরণে শিব ও পার্বতীর বন্দনা করলেও তাঁদের লীলাসমূহকে জাগতিক নর-নারীর অনুভূতিগুলির সঙ্গে সাধারণীকরণ করেছেন, কিন্তু গোবর্ধন তা করেন নি। তিনি সেই

আদিরসাত্মক অনুভূতিগুলিকে উপাস্য দেবতার লীলা ও মহিমার দৃষ্টিকোন থেকে উপলব্ধি করেছেন।

গোবর্ধনাচার্য *আর্যাসপ্তশতীতে* অলংকার প্রয়োগে বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলংকারে কবির দক্ষতা লক্ষ্যণীয়। অর্থালংকারের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তূপমা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত শ্লোক রয়েছে।

১.৮.৭ ৰোপদেববৈদ্যশতক: (খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতক) বৈয়াকরণ, জ্যোতির্বিদ্ তথা আয়ুর্বেদ-বিশেষজ্ঞ বোপদেবকৃত *ৰোপদেববৈদ্যশতক* একটি ভৈষজ্যবিদ্যা-সংক্রান্ত মুক্তককাব্য। এখানে ১০১ টি শ্লোকে আয়ুর্বেদনিষ্ঠ বিভিন্ন ঔষধের নির্মাণপ্রণালী ও সেগুলির প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। বোপদেব প্রকৃতিগত দিক থেকে ঔষধগুলিকে বিভিন্ন 'অধিকার' ক্রমে ভাগ করেছেন, যথা- চূর্ণাধিকার (১৭ শ্লোক), গুটিকাধিকার (১৬ শ্লোক), অবলেহাধিকার (১৬ শ্লোক), ঘৃতাধিকার (১৬ শ্লোক), তৈলাধিকার (১৬ শ্লোক) এবং ক্বাথাধিকার (১৬)।

কবি কাব্যের প্রথমে রোগনিবারণকারী সূর্যদেবকে নমস্কার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে রোগাক্রান্ত মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য পৃথক পৃথক অধিকারক্রমে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৮১]

প্রতিটি অধিকারে ১৬ টি করে শ্লোকে ১৬ প্রকার ঔষধ বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণস্বরূপে বিভিন্ন ভেষজ পদার্থ, সেগুলির পরিমাণ, মিশ্রণ পদ্ধতি, প্রস্তুতকৃত ঔষধের ব্যবহার পদ্ধতি এবং উদ্দিষ্ট ঔষধের দ্বারা কি কি রোগ নিরাময় হতে পারে- এই সমস্ত বিষয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। 'শেষ' (৪ শ্লোক) অংশে রোগীর শারীরিক অবস্থা, পারিপার্শিক আবহাওয়ার বিচার করে পূর্বোল্লিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। এই অংশে বোপদেব স্বীয় বাসস্থান, গুরু এবং পিতৃপরিচয় প্রকাশ করেছেন।[৮২]

ৰোপদেববৈদ্যশতক বা *শতশ্লোকী* যেহেতু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ; তাই এখানে কাব্যিক সৌন্দর্যের অন্বেষণ করা অমূলক হবে। কাব্যটি সমাসবহুল হলেও অর্থোপলব্ধিতে অসুবিধা হয় না। বোপদেবকৃত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল- *মুগ্ধৰোধব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুমঃ, মুক্তিফল বা মুক্তাফল* ইত্যাদি। *শ্লোকচন্দ্রিকা* নামক আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত গ্রন্থটিও বোপদেব কর্তৃক রচিত বলে অনেকে মনে করেন।

১.৮.৮ বৈরাগ্যশতক(২): (খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতক) প্রখ্যাত কবি, আলংকারিক, বৈয়াকরণ তথা দার্শনিক অপ্পয্য দীক্ষিত বা অপ্যয় দীক্ষিত বিরচিত ১০১ টি শ্লোকে নিবদ্ধ শতককাব্য *বৈরাগ্যশতক*। কবির জন্ম দক্ষিণ ভারতের (তামিলনাড়ু) ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত কাব্যমালা সিরিজের চতুর্থ গুচ্ছকে *সভারঞ্জনশতকের* শেষে (টীকা অংশে) নীলকণ্ঠ দীক্ষিত সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

"শ্রীভরদ্বাজকুলজলধিকৌস্তুভশ্রীকণ্ঠমতপ্রতিষ্ঠাপনাচার্যচতুরধিকশতপ্রবন্ধনির্বাহকমহাব্রতযাজিশ্রীমদপ্পয্যদীক্ষিতসোদর্যশ্রীমদাচ্চাদীক্ষিতপৌত্রেণ শ্রীনারায়ণদীক্ষিতাত্মজেন শ্রীভূমিদেবীগর্ভসম্ভবেন শ্রীনীলকণ্ঠদীক্ষিতেন বিরচিতং সভারঞ্জনশতকম্।"[৮৩] *সভারঞ্জনশতকের* রচনাকাল খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতক। অতএব অপ্যয় দীক্ষিতের সময়কাল খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতক বলে ধরে নেওয়া যায়।

অপ্যয় দীক্ষিত *বৈরাগ্যশতকে* বৈরাগ্য গুণের মহিমা বর্ণনা করেছেন। শতকের কিছু শ্লোকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বৈরাগীর নিরুদ্বিগ্ন মনোভাব ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন-

পততু নভঃ স্ফুটতু মহী চলন্তু গিরযো মিলন্তু বারিধযঃ
অধরোত্তরমস্তু জগত্ কা হানির্বীতরাগস্য॥[৮৪]

সংসার জীবনে প্রকৃতপক্ষে কেউই সুখী নয়, তা সত্ত্বেও জীব সংসারকে আশ্রয় করেই জীবন অতিবাহিত করে। বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করে তারা শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রাদির মোহে আবদ্ধ হয়। সমগ্র কাব্য জুড়ে জগৎ ও জীবনের অসারতা দেখিয়ে বৈরাগ্যের প্রতি উজ্জীবিত করা হয়েছে। বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং বীতরাগ-

কুত আগতং ন জানে ক্ব নু বা গন্তব্যমিদমপি ন জানে।
সংচরসি ক্বেদানীং সংসারপথে মহাতমসি॥[৮৫]

কবি বৈরাগ্যকেই এই ভবরোগের ভেষজ বলেছেন-

অজ্ঞানমিহ নিদানং প্রাগ্রূপং জননমেব ভবরোগে।
পরিপাকঃ সংসরণং ভৈষজ্যং নৈষ্ঠিকী শান্তিঃ॥[৮৬]

অপ্যয় দীক্ষিত অদ্বৈত বেদান্তবাদী হওয়া সত্ত্বেও শৈব ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আলোচ্য শতকে কবি শিবের স্তুতি করেছেন। তাছাড়া শিবস্তুতি বিষয়ক কিছু গ্রন্থও রচনা করেছেন, যথা- *শিবকর্ণামৃত (টীকাসহিত), শিবতত্ত্ববিবেক, শিবাদিত্যমণিদীপিকা, শিবাদ্বৈতনির্ণয়, শিবার্চনচন্দ্রিকা* ইত্যাদি। অপ্যয় দীক্ষিত ১০৪ টি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। সেগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি হল- *আত্মার্পণস্তুতি, উপক্রমপরাক্রম, কুবলযানন্দ, চতুর্মতসারসংগ্রহ, চন্দ্রকলাস্তুতি, চিত্রমীমাংসা, দশকুমারচরিতসংক্ষেপ, নামসংগ্রহমালা, ব্রহ্মতর্কস্তব, ভক্তিশতক, ভারততাত্পর্যসংগ্রহ, মধ্বমতবিধ্বংস, রত্নত্রযপরীক্ষা, রসিকরঞ্জনী (কুবলযানন্দের* টীকা), *রামাযণসারস্তব, বরদরাজশতক, বাদনক্ষত্রমালিকা, বিধিরসাযনমুখোপজীবিনী, বৃত্তিবার্তিক, হরিবংশসারচরিত* ইত্যাদি।

১.৮.৯ সভারঞ্জনশতক: (খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতক) সপ্তদশ শতকীয় কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিত বিরচিত একটি শতককাব্য *সভারঞ্জনশতক*। নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের পিতা শ্রীনারায়ণ দীক্ষিত এবং মাতা শ্রীভূমিদেবী (অপ্যয়্য দীক্ষিত রচিত *বৈরাগ্যশতকে* তথ্যসূত্রসহ উল্লিখিত হয়েছে)। ১০৫ টি শ্লোকে, অনুষ্টুভ ছন্দে কাব্যটি বিন্যস্ত হয়েছে।

সভারঞ্জনশতে কাব্য ও কবির মাহাত্ম্য, দানের মাহাত্ম্য ও ফল, জ্ঞানের প্রশংসা, মানসিক স্থৈর্য-শৌর্য-সাহসিকতা-ভীরুতা-উদ্যম ইত্যাদির ফল, কালশক্তি, ভাগ্য, সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য, সৎ রাজার মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। কবি সূক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছেন-

শাস্ত্রেষু দুর্গ্রহোঽপ্যর্থঃ স্বদতে কবিসূক্তিষু

দৃশ্যং করগতং রত্নং দারুণং ফণিমূর্ধনি॥[৮৭]

তাঁর মতে সাহিত্য-জ্ঞানহীন ব্যক্তি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হলেও পশু সুলভ।[৮৮] অন্যদিকে সাহিত্যাধ্যয়ন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়ন ও শিবপূজাকে উত্তরোত্তর ক্রমে মহৎ বলেছেন। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত মম্মটের মতোই কবিকে ব্রহ্মার সমকক্ষ বলেছেন।[৮৯] কবির মতে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে; তা সবই কালশক্তির প্রভাব। কবি দানের মহিমা প্রসঙ্গে বলেছেন-

কিং দাতুরখিলৈর্দোষৈঃ কিং লুব্ধস্যাখিলৈর্গুণৈঃ

ন লোভাদধিকো দোষো ন দানাদধিকো গুণঃ॥[৯০]

এছাড়াও ২৫ এবং ৩১ থেকে ৪০ নং শ্লোকে দান বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

কবির ভাষা সহজ ও অনাড়ম্বর। প্রসাদগুণের প্রয়োগে কাব্যটি সকলের বোধগম্য হবে। অলংকার প্রয়োগে তেমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। কবি বিভিন্ন সময়ে রচিত শ্লোকগুলিকে একত্রে সংকলিত করেছেন। মুক্তকগুলি তেমন অসামান্যতার দাবী না রাখলেও অকপট প্রকাশভঙ্গিতে সহৃদয় পাঠকের সমাদর লাভ করেছে।

১.৯ শতক সাহিত্যের ইতিহাস: (খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতক – বিংশ/একবিংশ শতক)

প্রাচীনকালে শতককাব্য রচনার ধারা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আধুনিককালে শতককাব্য রচনার প্রবণতা কেবল এই ধারাকে অব্যাহত রাখেনি। শতককাব্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। নিম্নে আধুনিককালে রচিত কিছু শতককাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

১.৯.১ উপদেশশতক: (খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতক) কবি গুণমণি বা গুমাণি বিরচিত এই শতককাব্যে শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিপরিচয় এবং কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। কবি ১০২ টি আর্যা ছন্দে বিধৃত শ্লোকে এই শতককাব্য রচনা করেছেন। মূলত বিভিন্ন মহাকাব্য ও সাত্ত্বিক পুরাণসমূহে বর্ণিত বিষ্ণুর কীর্তিকলার অনুকরণে রচিত এই কাব্য।

বিভিন্ন সংকট সময়ে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, রাবণ, শিশুপাল, কংস, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দুষ্টের দমন ও প্রহ্লাদ, পাণ্ডব, সুগ্রীব, রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি শিষ্টের পালন, রাজা রূপে প্রজানুরঞ্জন, পুত্র রূপে পিতার সত্য রক্ষা, পতি রূপে ধর্মপত্নী রক্ষা প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের বর্ণনা করা হয়েছে।

উপদেশশতকে নৈতিক উপদেশ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন একটি শ্লোকে হঠকারিতার ফল বিষয়ে বলা হয়েছে-

দুষ্যন্তঃ স্ববধূমপি কণ্বানীতাং শকুন্তলাং সসুতাম।
সুচিরং বিমৃশ্য ভেজে কার্যং সহসা ন বিদধীত॥[৯১]

অপর একটি শ্লোকে বিনা বিচারে গুরুর আদেশ পালনের কথা বলা হয়েছে-

জমদগ্নিনা নিযুক্তঃ সদ্যো নিজঘান মাতরং রামঃ।

নির্দোষঃ পুনরাসীদ্গুরূক্তমবিচারিতং কুর্যাত্॥[৯২]

এরকম আরও অনেক শ্লোক রয়েছে, যেগুলিতে উদাহরণসহ মানুষের কর্তব্য কর্মের নৈতিক উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *উপদেশশতকের* কিছু শ্লোকে কালিদাস, ভারবি প্রমুখ কবিগণের প্রভাব দেখা যায়।

১.৯.২ চণ্ডিকাশতক: (খ্রিস্টিয় বিংশ শতক) *চণ্ডিকাশতকে* কবি মহেশ ঝা ১০০ টি শ্লোকে দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে, মুঙ্গেরের ভগবতী প্রকাশনী থেকে। তিনি চণ্ডীকে সকল কর্মের হোতা, সকল ধর্মের মূল এবং সকল জ্ঞানের সাররূপে বর্ণনা করেছেন। তিনিই পরম তত্ত্ব, তারই মহিমায় প্রজাপতি- বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি- স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদন করেন। তার আরাধনা করলে জীবের আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক এবং আধ্যাত্মিক- এই তিন প্রকার দুঃখ নিবারিত হয়। তার কৃপায় মূকের মুখে ভাষা আসে, অজ্ঞানীর জ্ঞানলাভ হয়, পঙ্গুও চলচ্ছক্তি ফিরে পায়। কবি মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, শঠতা, ধর্মের নামে হিংসা প্রভৃতির নিন্দা করেছেন *চণ্ডিকাশতকে*। কবি বলেছেন মনুষ্য সমাজে আজও শুম্ভ-নিশুম্ভের মত মনুষ্য রূপী দৈত্য রয়েছে।[৯৩]

কবি মহেশ ঝা যেমন আরাধ্য দেবতার গুণকীর্তন করতে গিয়ে একেশ্বরবাদের কথা বলেছেন তেমনি কর্মবাদের কথাও বলেছেন *চণ্ডিকাশতকে*। তাঁর মতে সমাজের সাধারণ স্তরের খেঁটে খাওয়া মানুষ, যারা নিজেদের দারিদ্রতাকে স্বীকার করে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়; তারা পক্ষান্তরে মা দুর্গারই পূজা করে।[৯৪] কয়লা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কয়লা মেশানো ঘর্মাক্ত মুখের সঙ্গে মা কালিকার মুখশ্রীর সাযুজ্য খুঁজে পান কবি।[৯৫] এছাড়া *কর্মৈব পূজনম্, স্বীয়ং হি জীবনমিতি শ্রম এব* ইত্যাদি উক্তিগুলিতে কর্মবাদের মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনার কথা বলা হয়েছে। কবির বর্ণনা-নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। উপমা, রূপক, দীপক, উৎপ্রেক্ষা, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, প্রভৃতি অর্থালংকারের প্রয়োগে তিনি কাব্যিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। একটি অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকারের উদাহরণ যেমন-

তেজোঽরুণং তরুশিখাশ্রিতমদ্বিতীযং

তচ্ছোণিতং কিল তমোহতিপাতি মন্যে।

প্রাতঃ প্রভাকরকরাসিভিরম্ব চৈত-

দ্দৃষ্ট্বা ত্বযাকৃতসুরারিবধং স্মরামি॥[৯৬]

প্রভাতে সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে গাছের উপরিভাগ লাল হয়ে ওঠে। এ যেন সূর্যরশ্মিরূপ খড়্গ দ্বারা অন্ধকাররূপ দানবকে হত্যা করায় রক্তরূপ রক্তিম আলো নির্গত হচ্ছে। এ যেন মা ভবানীর রাক্ষস বধের চিত্র।

১.৯.৩ বসন্তশতক: (২০০৩ খ্রিস্টাব্দ) কবি মহেশ ঝা বিরচিত অপর একটি শতককাব্য *বসন্তশতক*। ১০০ টি পদ্যে বিধৃত সমস্ত কাব্যটি ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে নির্মিত। *বসন্তশতক* কাব্যটি রচনার কারণ প্রসঙ্গে কবি কথামুখে জানিয়েছেন, ভাগলপুর (বিহার) আকাশবাণীর পক্ষ থেকে কবিকে বসন্তকাল বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখার অনুরোধ করা হয়েছিল। সে সময়ে কবি বসন্ত বিষয়ক কিছু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন; যেগুলি বহু লোকের দ্বারা সমাদৃত হয় এবং তাদেরই পরামর্শ ও অনুরোধের ফলস্বরূপ এই *বসন্তশতক*। কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গেরের ভগবতী প্রকাশনী থেকে।

কবি *বসন্তশতকের* বিষয়বস্তুকে পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন- *বাসন্তবাতঃ, কান্তং বসন্তম্, বসন্তচ্ছলেন, আজ্যং বসন্তঃ* এবং *জীবনাথো বসন্তে*। মঙ্গলাচরণে কবি ঋতুরাজ বসন্তের স্তুতি করেছেন। বসন্তকে তিনি অনঙ্গবন্ধু বা কামদেবের বন্ধু বলেছেন।

বাসন্তবাত: শীতের প্রকোপে বনপ্রকৃতি ও মানবকুলের দুরবস্থার অবসান ঘটায় বসন্ত। বসন্ত সমাগমে মানব মনে ও প্রকৃতিতে কিরকম পরিবর্তন আনে; তার চিত্র এঁকেছেন কবি এখানে। বসন্তের বাতাস পরব্রহ্মাভিলাষী তপঃপরায়ণ মুনির চিত্তকেও চঞ্চল করে তোলে।[৯৭]

কান্তং বসন্তম্: বসন্তকালীন প্রকৃতির মনোরম চিত্র এঁকেছেন কবি এখানে। নতুন পত্র ও পুষ্পে সজ্জিত বনরাজি, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র। ক্ষেতের উপরিভাগে সজ্জিত হলুদ বর্ণের পুষ্পরাজিকে কবি পৃথিবীর উত্তরীয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৯৮]

বসন্তচ্ছলেন: নর-নারীর প্রণয়, কামুকতা, উন্মত্ততা প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে *বসন্তচ্ছলেন* অংশে। বসন্তকালীন বসন্তোৎসবে রঙ খেলার ছলে নায়ক-নায়িকার অনুরাগ, মিলন, চুম্বন, আলিঙ্গন

ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। বসন্তকালীন বাতাস যেমন দরিদ্রদের শীতবস্ত্রের অভাব থেকে মুক্তি দেয় তেমনি মলিন বস্ত্র পরিহিত রমণীগণের ক্লেশ দূর করে বসন্তের রঙিন রঙ।

আজ্যং বসন্ত: এখানে বলা হয়েছে আদি দেব বিধাতা যখন সৃষ্টির সংকল্প করে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন তখন সেই যজ্ঞের ইন্ধন হলেন গ্রীষ্ম, আজ্য বা হবিষ্য হলেন বসন্ত।[৯৯] কবি বসন্তকে বলেছেন কামদেবের সেনাপতি। কবি আরও বলেছেন এই বসন্ত নদীর জলকে স্বচ্ছ করে, বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতিকে কিসলয় দ্বারা মণ্ডিত করে। গৃহকার্যনিপুণা রমণীর লজ্জা দূর করে, অপেয় (মদ্যাদি) বস্তুকে পেয় করে অর্থাৎ বসন্তোৎসবের আনন্দে মানুষ অপেয় বস্তুও পান করে থাকে।

জীবনাথো বসন্তে: বসন্তকালে প্রিয় বিরহে ব্যাকুলা নারীর অনুভূতি বর্ণিত হয়েছে এখানে। এই সময় কাকের কর্কশ স্বরও পতি-বিরহী নারীর হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করে তোলে। শুকনো পাতার শব্দ প্রভৃতিকে প্রিয় আগমনের সংকেত ভেবে তারা দিন যাপন করে।

কবি মহেশ ঝা তাঁর কাব্যে বসন্ত ঋতুর প্রভাবে প্রকৃতি রাজ্যের সৌন্দর্য যেমন এঁকেছেন তেমনই মানব-মনে তার প্রভাব দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন কিভাবে প্রকৃতির অপরূপ শোভা মানুষের সুপ্ত অনুভূতিগুলিকে উদ্দীপিত করে। কাব্যের সর্বত্র কবি সামাজিক সাম্যের কথা বলেছেন। এই বসন্তোৎসবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে রঙ খেলায় মেতে ওঠে। তাই কবি কাব্যের শুরুতেই বলেছেন- বসন্তকালে যেমন বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতি জীর্ণ পাতা ফেলে দিয়ে নতুন কচি পাতা ধারণ করে; তেমনই অন্তর্কলহ মুছে ফেলে সমাজের সর্বত্র সাম্য আসুক, সবার মঙ্গল হোক।[১০০] কবি মহেশ ঝা তাঁর দুটি শতককাব্যেই বিভেদ-বৈষম্য, মানবিক মূল্যহীনতা, ঈর্ষা পরায়ণতা, শঠতা প্রভৃতি সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন এবং তার পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। তাই শুধু কাব্যগুণেই নয়, সামাজিক মূল্যবোধের বিচারেও *চণ্ডিকাশতক* ও *বসন্তশতক* কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। উভয় শতকেই কবি শ্রীচণ্ডীর স্তুতি করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় কবির আরাধ্য দেবতা মা চণ্ডিকা।

১.৯.৪ শতকচতুষ্টয়: (একবিংশ শতক) কবি কেশবরামশর্মা রচিত *শতকচতুষ্টয়* একটি শতকসংগ্রহ। এই সংগ্রহে চারটি শতককাব্য রয়েছে যথা- *মাতৃভূমিশতক, দর্শনার্ণবরত্নশতক, ভারতশতক* এবং *সংস্কৃতশতক*। প্রতিটি শতকে ১০০ টি করে শ্লোক রয়েছে। শতক-সংগ্রহটির

প্রথম প্রকাশ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, হিমাচল প্রদেশের মনীষিমণ্ডল প্রাকাশনা থেকে। নিচে শতকগুলি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মাতৃভূমিশতক: এই শতকে কবি মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। ভারতের মনোরম বনপ্রকৃতি, শস্যক্ষেত্র, গ্রাম্য ও শহুরে পরিবেশ, সমাজ-হিতকর সিদ্ধান্ত, সংস্কৃতি, ভারতীয় আত্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক ভাবনা প্রভৃতি কবিকে মুগ্ধ করে। মাতৃভূমি রক্ষার্থে সেনাদের এবং তাদের গর্ভধারিণী মায়েদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবি। তার পাশাপাশি কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষকদের ভূমিকা ও তাদের বর্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। কবির মতে সভ্যতা, বিবিধ ভাষা, সাহিত্য, উন্নত জীবনদর্শন, দার্শনিক চিন্তা, শিল্প, ধর্ম, নীতি, বিবিধ কলা এই সকল ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ।[১০১] পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনুকরণ মোহের অর্থ স্বদেশের প্রতি অবমাননা। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নির্বাচনে অসাধুতা, নির্বাচিত নেতৃবর্গের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ইত্যাদির নিন্দা করেছেন কবি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কবি সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন নদ-নদীর জল যেমন শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনই পৃথিবীর সকল ধর্ম শেষ পর্যন্ত একই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত হয়।[১০২] যে ধর্মে ভেদ ভাব, বন্ধুত্বের অভাব, হিংসা, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রাণী হত্যা, অন্য মতালম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ইত্যাদি রয়েছে; তা ধর্মের নামে ছল মাত্র।[১০৩]

কাব্যের শেষ ভাগে কবি প্রার্থনা করেছেন- তরুশাখায় বসবাসকারী পাখি হয়ে, মাটির কীট হয়ে অথবা বন্য হরিণ হয়ে, যে যোনিতেই জন্ম হোক না কেন, তিনি যেন জন্মান্তরেও এই ভারতবর্ষেই জন্ম লাভ করেন।[১০৪]

দর্শনার্ণবরত্নশতক: শতকটির নাম থেকে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুমান করা যায়। মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ চতুর্দশ বিদ্যার (চার বেদ, ষড় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ) মধ্যে অন্যতম হল দর্শনশাস্ত্র। ভারতবর্ষের আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়গুলির মুখ্য বিষয় সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা টানার চেষ্টা করা হয়েছে এই *দর্শনার্ণবরত্নশতকে*। কাব্যটি রচনার কারণ বিষয়ে কবি বলেছেন- স্বল্প ধৈর্যসম্পন্ন জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে বিশাল দর্শনশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রায় অসম্ভব। তাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সংক্ষেপে ও

সরলভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। বিশালাকার নদীর জল (যেমন) ক্ষুদ্র পাত্রে পান করেই তৃপ্তি পাওয়া যায় (ঠিক তেমনই পাঠকবর্গ এই কাব্য-আধারে সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে তৃপ্ত হবেন)।[১০৫]

কবি কেশবরামশর্মা প্রথমে বেদান্ত দর্শন-সম্মত অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের মাধ্যমে দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ, বন্ধনের কারণ, মোক্ষের উপায়, অজ্ঞানের কারণরূপে তিন প্রকার দোষ (মল, বিক্ষেপ ও আবরণ) ও তাদের লক্ষণ, দোষগুলি নিরসনের উপায়, পুনর্জন্মের কারণ ও নিবারণের উপায় ইত্যাদির অতিসংক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে *দর্শনার্ণবরত্নশতকের* সূচনা করেছেন। এই শতকে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা, যোগ, বৈশেষিক, সাংখ্য ও বেদান্ত এই দর্শন-সম্প্রদায়সমূহের মূল তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে এবং কিছু কিছু বিষয়ে দর্শন সম্প্রদায়গুলির সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলি ছাড়াও শৈব ও বৈষ্ণব দর্শন (ভক্তিমূলক দর্শন) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য কাব্যের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে বেদান্তের আলোচনা রয়েছে। এছাড়া কাব্যের শুরুতে যে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের অবতারণা করা হয়েছে; তাতেও বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে কেশবরামশর্মা এক দর্শন সম্প্রদায়ের তত্ত্ব অন্য দর্শন সম্প্রদায়ের দ্বারা খণ্ডিত করেন নি। তিনি শুধু বিশাল দর্শনরূপ সিন্ধু থেকে কিছু অমূল্য রত্নরূপ তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন মাত্র। তাই আলোচ্য শতককাব্যটির *দর্শনার্ণবরত্নশতক* নামকরণটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতশতক: আলোচ্য শতককাব্যে ভারতবর্ষের সর্বোত্তম মহিমা বর্ণিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও তার উপযোগিতা, অধ্যাত্ম সাধনা ও তার উপায়, ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা, মানুষের সদাচার প্রভৃতির গুণগান করা হয়েছে *ভারতশতকে*। দিগন্ত বিস্তৃত মন্দিরের ধ্বজা, বাড়ির দেওয়ালে বিভন্ন প্রকার চিত্রকলা, গৃহবধূদের আত্মীয় তোষণ, নদী-পর্বত-সমুদ্রময় ভারতের বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান কবিকে মোহিত করে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা রচিত বিবিধ অমূল্য গ্রন্থ ও সেগুলির জনহিতকর বিধান, দানের মহিমায় ভুবন বিদিত হরিশ্চন্দ্র, শিবি, বলি প্রমুখ রাজন্যবর্গের নাম আলোচ্য শতককাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। গুরুভক্তির পরম উদাহরণ একলব্য। মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধনে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রমুখ পৌরাণিক চরিত্রগুলির গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে এখানে। ভারতের পক্ষপাতহীন বিচার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

কবি বলেছেন- এখানে সত্য বিচারকে শাসন করে, বিচার আচারকে শাসন করে এবং আচারের অনুশাসনে সমাজ রক্ষিত হয় আর এভাবেই রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[১০৬]

আজ বিশ্বব্যাপী নাশকতা, মানুষে মানুষে ভেদ ভাবনা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ভারতের সৌভ্রাতৃত্ববোধ।[১০৭] তাই ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, অধ্যাত্মবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশ্বের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে।

সংস্কৃতশতক: *সংস্কৃতশতকে* কবি কেশবরামশর্মা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্য, গুরুত্ব এবং বর্তমান দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। এই সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার কীভাবে করা যায়; সেই বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছেন। কবি *সংস্কৃতশতক* রচনার উদ্দেশ্য নিজেই ব্যক্ত করেছেন। অসংস্কৃতজ্ঞ দেশভক্তগণকে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত করার জন্য এবং সংস্কৃতজ্ঞগণকে এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রদর্শনের জন্য শত শ্লোকের মাধ্যমে হৃদয়ের ভাবনা প্রকটিত করেছেন কবি।[১০৮]

বিশ্বের সকল বিদ্বানের দ্বারা বন্দিত সমস্ত ভাষার জননী এই সংস্কৃত ভাষা আমাদের সম্পদ। এই ভাষা গঙ্গাজলের মতো পবিত্র, প্রেমিকার প্রিয় বচনের ন্যায় উপাদেয়, অমৃতের চেয়েও সুমিষ্ট। কবির মতে বিজ্ঞানের দ্বারা শুধু শারীরিক ও বস্তুগত উন্নতি সম্ভব কিন্তু মানবের চারিত্রিক উন্নতি সংস্কৃত ভাষার দ্বারাই সম্ভব।[১০৯] সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে সমৃদ্ধ ব্যাকরণ, ভাবগাম্ভীর্য, অর্থগাম্ভীর্য ও মাধুর্য। এই ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা বিশ্বের অন্যান্য সকল ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

ভারতবাসী এই সমৃদ্ধ ভাষার মহত্ব ভুলে পাশ্চাত্য ভাষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই কবি তিরস্কার সুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন কস্তুরী মৃগ যেমন নিজ শরীরের সুগন্ধের উপলব্ধি করতে না পেরে সুগন্ধের জন্য ধাবিত হয়, তেমনই ভারতবাসী নিজ গৌরব সংস্কৃত ভাষার মহত্ব না বুঝে পাশ্চাত্য ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।[১১০] কবি বলেছেন যে যুগের ভুলের কারণে সংস্কৃত ভাষার মতো রত্ন বিনষ্ট হবে, ইতিহাস সেই যুগকে কলংকিত যুগ বলে জানবে।[১১১] কারণ বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের যশ সংস্কৃতের মহনীয়তার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই এই ভাষা যত দিন থাকবে; তত দিনই ভারতের মহত্ব জীবিত থাকবে।[১১২]

সংস্কৃত সাহিত্যে (বেদ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র) সাম্প্রতিক কালের অনুপযোগী কিছু সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে অনেকে এই ভাষাকে পরিত্যজ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। কবি এই বক্তব্যের চরম বিরোধিতা করেছেন। কবির মতে আদিকাল ধরে প্রবাহিত এই ভাষা অনেক যুগের দ্রষ্টা হয়ে রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই সেই সময়ের কিছু দোষও এই ভাষায় রয়ে গেছে। তাই বলে সম্পূর্ণরূপে ভাষাটিকে ত্যাগ করা অনুচিত। উপরন্তু দোষগুলির নিরসন করা দরকার। কবি এক্ষেত্রে উদাহরণ সহকারে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন- কোন বস্ত্র মলিন হলে তাকে পরিত্যাগ করা মুর্খামি উপরন্তু মলিনতা দূর করে তাকে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।[১১৩] তাই স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে একদা নিম্নবর্ণের প্রতি অহেতুক নিষেধাজ্ঞা অথবা উচ্চ বর্ণের প্রশংসা- এই সকল পরিত্যাগ করে সংস্কৃত ভাষার গরিমা পুনরুদ্ধার প্রয়োজন, ত্যাগ করা নয়।[১১৪] শতককার এই ভাষার প্রতি উদাসীন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করে বলেছেন যদি উদরপূরণ ও শ্বাস গ্রহণের জন্যই বেঁচে থাকেন; তাহলে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বিষয়ে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু যদি প্রাণ ধারণের অতিরিক্ত যশের প্রয়োজন হয়; তবে অবশ্যই সংস্কৃতের সমাদর করা উচিৎ-

চেদ্ ভারতীযা উদরপ্রপূর্ত্যৈ শ্বসন্তি নৈবাস্ত তদা বিচারঃ।

যশপ্রিযত্বং যদি তেষু কিঞ্চিত্ নার্হন্তি তে সংস্কৃতরত্নহানিম্॥[১১৫]

কেশবরামশর্মা সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই নয়, সমাজের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে সংস্কৃত প্রচারের জন্য। সরকারি সহযোগিতা ব্যতীত কোন প্রচার সাফল্য পায় না; তাই সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[১১৬] দোকানে, রাস্তায়, গলিতে, অট্টালিকায় যা কিছু বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য লিখনের প্রয়োজন; সেগুলিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করতে হবে।[১১৭]

কবি কেশবরামশর্মা *শতকচতুষ্টয়ের* প্রতিটি শতকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করেছেন। *মাতৃভূমিশতক* মন্দাক্রান্তা, *দর্শনার্ণবরত্নশতক* বসন্ততিলক, *ভারতশতক* ইন্দ্রবজ্রা এবং *সংস্কৃতশতক* ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা সহযোগে উপজাতি ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে। *মাতৃভূমিশতক* মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রয়োগে গীতিধর্মিতা লাভ করেছে। তাছাড়া *শতকচতুষ্টয়ের* সহজে বোধগম্য ভাষা ও সরস বাগভঙ্গি পাঠকবর্গের রসাস্বাদনে সাহায্য করবে। অলংকার প্রয়োগেও কবি

বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। উপমা, কাব্যলিঙ্গ, স্বভাবোক্তি, বিশেষোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি অলংকারে নিবদ্ধ শ্লোক পাওয়া যায় *শতকচতুষ্টয়ে*।

সমগ্র *শতকচতুষ্টয়ে* কবি ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, দর্শন, অধ্যাত্ম ভাবনা, নৈতিকতা প্রভৃতির গুরুত্ব বিষয়ে পাঠকবর্গকে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কবি ভারতীয় শাস্ত্রে বর্তমান যুগের অনুপযোগী বিধানগুলির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ দিয়েছেন।

১.৯.৫ সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতক: (একবিংশ শতক) পুস্তকাকারে প্রকাশিত *সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতকের* 'আত্মপরিচয়' অংশে কবি তথা জ্যোতিষাচার্য বিষ্ণুকান্ত ঝা তাঁর বংশ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। জানা যায়, কবির জন্ম মিথিলার (বর্তমান বিহার) অন্তর্গত গোনৌলী (পশ্চিম চম্পারণে অবস্থিত) গ্রামে। তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ভৈরবনাথ নব্য ন্যায়াচার্য ছিলেন যিনি দুর্গাচার্যকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেছেন (এই দুর্গাচার্যই নিরুক্ত-ভাষ্যকার দুর্গাচার্য কি না; সেই বিষয়ে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি)। প্রপিতামহ গিরিধারী ব্যাকরণাচার্য ছিলেন। পিতামহ নবতি, পিতা ভোলানাথ ও মাতা বাবু দেবী। কবি ঝাড়খণ্ডের লক্ষ্মী দেবী সর্রফ আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে (Laxmi Devi Srraf Adarsh Sanskrit College) ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন।

সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতক একটি স্তুতিমূলক মুক্তক রচনা। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঝাড়খণ্ডের বন্দনা প্রকাশন থেকে কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে সর্বসমেত ১৩২ টি পদ্য রয়েছে। কবি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত দেওঘরে অবস্থিত শ্রীবৈদ্যনাথ ধামের শ্রীবৈদ্যনাথের স্তুতি করেছেন। সমগ্র বৈদ্যনাথ ধামের অন্যান্য দেব-দেবীর স্তুতিও রয়েছে এই শতকে যেমন-পার্বতী, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, সন্ধ্যা, হনুমান, মনসা, সরস্বতী, সূর্য, তুলসী, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বাণরসমূহ, গঙ্গা, যমুনা, কালিকা, তারাদেবী ইত্যাদি। এছাড়াও মন্দিরে অবস্থিত বগলামুখী যন্ত্র ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ঘন্টার স্তুতি করেছেন কবি। এখানে মহাদেবের অন্যান্য রূপ যেমন মহাকালভৈরব, আনন্দভৈরব, গৌরীশংকর, নর্মদেশ্বর শিব, নীলকণ্ঠ, স্বর্ণবিল্ব মহাদেব প্রভৃতির বন্দনা রয়েছে। কাব্যের প্রথম ১০ টি শ্লোকে শতককার স্বীয় গুরু শ্রীমুরলীধর, মণিনাথ, হর্ষনাথ ও বাসুদেবের প্রশস্তি করেছেন।

সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতকে ছন্দো ও অলংকার প্রয়োগের বৈচিত্র্যে কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই শতকে শার্দূলবিক্রীড়িত, অনুষ্টুভ্, স্রগ্বিনী, বসন্ততিলক, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দে বিন্যস্ত শ্লোক রয়েছে। কাব্যের সর্বত্র স্বভাবোক্তি অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন মঙ্গলাচরণ শ্লোকে স্বভাবোক্তির প্রয়োগ-

যং সর্বে সমুপাসতে নিজধিযা হার্দং ত্রিলোকেশ্বরং
ভক্তানাং বিনযান্বিতাং ৰহুবিধাং যাঞ্চাং চ যো ধ্যাযতি।
দীনানামপি সাহ্যদাননিরতঃ কারুণ্যরত্নাকরঃ
সোঽব্যাদ্ বৈদ্যপতিশ্চরাচরজগদ্ বিশ্বাসভূমিঃ সদা॥

গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবি অপহ্নুতি ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন-

মিত্র! গঙ্গাজলৌঘো ন, হারো ভুবো
নো নদী, পাপিনাং কষ্টহর্তা হরঃ
যেন গীতাঽত্র ভাগীরথী-সংস্তুতিঃ
শ্রীপতেরাসনং তেন লব্ধং ধ্রুবম্॥[১১৮]

এখানে গঙ্গাজলের (উপমেয়) নিষেধ করে পৃথিবীর হারের (উপমান) এবং গঙ্গার (উপমেয়) নিষেধ করে দুঃখহারী হরের (উপমান) স্থাপনা করায় অপহ্নুতি। আবার গঙ্গাজল পৃথিবীর হাররূপে এবং (গঙ্গা) নদী কষ্টহারী হর বা শিবরূপে সম্ভাবিত হয়েছে; তাই উৎপ্রেক্ষা অলংকার। অতএব সংকর অলংকার। এছাড়া অর্থান্তরন্যাস, বিশেষোক্তি, পরিকর, পর্যায়োক্তি, সংসৃষ্টি, বিভাবনা প্রভৃতি অর্থালংকার তথা বৃত্যনুপ্রাস ও অন্ত্যনুপ্রাস শব্দালংকারের প্রয়োগ রয়েছে।

জহ্নুকন্যা গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বিষ্ণুকান্ত ঝা সমাজে প্রচলিত পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যধির কথা তুলে ধরেছেন।[১১৯] *সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতকের* একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি দেবতা বা বিষয়ের বর্ণনায় কবি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।

১৯.৬ অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতী: (বিংশ শতক) আধুনিক সংস্কৃত কবিদের মধ্যে এক অন্যতম নাম অধ্যাপক ডঃ নারায়ণশাস্ত্রী কাংকর। কবির জন্ম ১৩ ই জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।

রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুরে। পিতা পণ্ডিত নবলকিশোর কাংকর, মাতা পুষ্প দেবী। কবি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হন। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পিএইচ্. ডি. উপাধি অর্জন করেন। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ডি.লিট্ উপাধি লাভ করেন। কবির সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় রচিত কাব্যের সংখ্যা প্রায় ১৩০০। নারায়ণ শাস্ত্রী শুধু একজন কবিই নন, সম্পাদক এবং একজন সুশিক্ষক। তিনি তাঁর পিতার ১৩টি রচনার সম্পাদনা করেছেন। অন্যান্য কবিদের সর্বসমেত ৪৪টি রচনার সম্পাদনার কাজ করেন। কবি জয়পুরের অন্তর্গত *ন্যাশনাল্ ইন্সটিটিউট্ অফ্ আয়ুর্বেদ* এ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আয়ুর্বেদ গবেষকদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতেন। শাস্ত্রীয় বৈদগ্ধ্যতার জন্য কবি রাজস্থান সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা বহুবার সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল *সংস্কৃত-নিৰন্ধ-মাধুরী, সংস্কৃত-নবরত্ন-সুষমা, সংস্কৃত-নবরত্ন-মঞ্জুষা, রচনাভ্যুদয়, অভিনব-সংস্কৃতকথা* ইত্যাদি।

কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে জয়পুরের রমেশ বুক্ ডিপো থেকে। *অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতীতে* সর্বসমেত ৭০০ টি শ্লোক রয়েছে। কবি শতকগুলির নির্দিষ্ট কোনো নাম দেননি, শুধু শত শ্লোকের ভিত্তিতে শতকগুলির নামকরণ করেছেন প্রথম শতক, দ্বিতীয় শতক ইত্যাদি ক্রমে সপ্তম শতক পর্যন্ত। অতিসংক্ষেপে *অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতীতে* বর্ণিত বিষয় নিচে দেওয়া হল-

বিষয়বস্তু: ঐক্য ও অনৈক্যের দোষ-গুণ, মানুষের যশোলিপ্সা, সময়ের আবর্তনে জীবনে সুখ-দুঃখের পরিবর্তন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা, সংস্কৃত ও সংস্কৃতি, শিশুর প্রতি অভিভাবকের ব্যবহার, কর্মচারী অসন্তোষ, ভ্রষ্টাচার ও তার নিরসনের উপায়, পারস্পরিক বিবাদের কুফল, পত্রিকা সম্পাদকের করণীয় কর্তব্য, সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা, নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় শিক্ষার ভেদ, মূর্খের হীরক ও কাঁচে অভেদজ্ঞান, সনাতন ধর্মের লক্ষণ, গুরু-শিষ্যভাবের স্বরূপ, পরিবার-সমাজ ও দেশের প্রতি মানুষের কর্তব্য, মানব শরীরের সার্থকতা, ছাত্রশক্তি, বিদ্বানের স্বভাব, বিদ্যা দানের মহিমা, নিয়মানুবর্তিতার সুফল, অর্থোপার্জন ও তার সঠিক ব্যবহার, বিরোধী মতাদর্শীর প্রতি সম্মান, বৈরাগ্য লাভের উপায়, দুর্ভিক্ষ-বিবাদ ও মৃত্যুর কারণ, সূক্তি সমূহের গুরুত্ব, কুকর্মের ফল, যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃত নেতার মহিমা, আত্ম-নিন্দার সুফল, জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার উদ্দেশ্য, পুরস্কার দানের

গুরুত্ব, প্রতিভা ও উন্নতির সম্পর্ক, স্বাধ্যায়ের ফল, পশ্চাত্তাপের সুফল, ব্রাহ্মমুহূর্তের গুরুত্ব, ভ্রষ্টাচারীর স্বরূপ ও তার দণ্ড, উদ্যমের দ্বারা কার্যসিদ্ধি, পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃভাব, শ্রেষ্ঠ কবিত্ব, গণতন্ত্রের সার্থকতা, পরিবারে সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনীয়তা, অনুশাসনের গুরুত্ব, শিক্ষাহীন রাজনীতির কুফল, হিন্দুর লক্ষণ, ব্যবসায়ীর সততা, বাসের অযোগ্য দেশ, স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভাষাজ্ঞানের গুরুত্ব, দেশীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, বিদ্যা লাভে গুরুর উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে *অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতীতে*।

সম্পূর্ণ শতকসংগ্রহটি অকারাদি ক্রমে (ব্রজ্যাক্রমে) বিন্যস্ত হয়েছে। এই শতকসংগ্রহের শ্লোকগুলির পারস্পরিক মৌলিকতা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুন্ন হয়েছে অর্থাৎ একই বিষয় এক বা একাধিক শতকে প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ২০৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে- জীবিতাবস্থায় কেউ সমাদর করে না অথচ মৃত মানুষের শ্রাদ্ধ আড়ম্বরের সঙ্গে করা হয়ে থাকে।[১২০] আবার ৩৭৩ নং শ্লোকে প্রায় একই রকম উক্তি করেছেন। এখানে বলা হয়েছে- মৃত মানুষের শ্রাদ্ধ আড়ম্বরের সঙ্গে করা হয়ে থাকে অথচ জীবিতাবস্থায় সেই ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া হয়, এই রকম দ্বিধাচারী ব্যক্তিকে কীসের সঙ্গে উপমীত করা যায়?[১২১] এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

কিছু কিছু শ্লোকে পূর্বসূরী সংস্কৃত কবিদের প্রভাব দেখা যায়। শুধু ভাবগত নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সাযুজ্যও দেখা যায়, যেমন চাণক্য নীতিশাস্ত্রের একটি শ্লোক-

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ ৰান্ধবাঃ।

ন চ বিদ্যাগমোঽপ্যস্তি বাসস্তত্র ন কারযেত্।।

আলোচ্য কাব্যে অনুরূপ একটি শ্লোক-

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তিঃ সুহৃদো ন চ।

তস্মিন্ বাসে ক আনন্দো বৃথা জীবন-যাপনম্॥[১২২]

তবে কোষকাব্যের মতো পূর্ববর্তী কাব্য থেকে অবিকল কোনো শ্লোক এই শতককাব্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কবি নারায়ণ শাস্ত্রী কাব্যটির একাধিক ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক আন্দোলন, কর্মবিরতি, অনিয়ন্ত্রিত জন্ম-হার, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি অতি আধুনিক

সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, জাতীয় ঐক্য, শান্তিপূর্ণ সামাজিক সহাবস্থান ও পারস্পরিক সৌহার্দ, আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চারিত্রিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিষয়গুলি অতিসংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

১.৯.৭ বাণীশতক: (বিংশ শতক) মহিলা কবি নলিনী শুক্লা বিরচিত *বাণীশতক* ১০৮ টি শ্লোকে বিন্যস্ত। কাব্যটির নামকরণের দ্বারাই অনুমিত হয় যে এখানে বাগদেবী সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে, কানপুরের কৃষ্ণা প্রেস থেকে। কবি শিখরিণী ছন্দে বিধৃত শ্লোকের মাধ্যমে সরস্বতীর প্রতি স্বীয় ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কবি 'উমা' শব্দের তাৎপর্য প্রসঙ্গে একটি সুন্দর শ্লোকের অবতারণা করেছেন-

অকারং সূর্যাভং তত উমিতি জৈবাতৃকবৃত্তিং
মকারঞ্চাগ্নেয়ীং বৃত্তিমুমরি মাত্রার্ধকতযা
চিদাকাশস্ফোটং বহতি চ যদাভাসবিমলং
স্থিতৌ জ্যোতিষ্মত্যাং কথমমরসৌখ্যং তব লভে?[১২৩]

তাছাড়া এই কাব্যে তন্ত্রসাধনা, জ্যোতিষ এবং পরব্রহ্মবিষয়ে নিগুঢ় তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে। আধুনিক সংস্কৃত স্তোত্রকাব্যগুলির মধ্যে *বাণীশতক* এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করবে বলে বিদ্বজ্জনের অভিমত।

১.৯.৮ ঈশ্বরশতক: অবতারকবি কর্তৃক বিরচিত শতককাব্য *ঈশ্বরশতক*। কবির সময়কাল ও ব্যক্তিপরিচয় বিষয়ে বিশদ কিছু জানা যায়নি। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। কাশ্মীর অধিবাসী রাজনাথ রত্নাকণ্ঠের পিতামহ এবং *স্তুতিকুসুমাঞ্জলির* ব্যাখ্যাকার অবতারকবি এবং শতককার অবতারকবি একই ব্যক্তি কি না, এই বিষয়েও তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। *স্তুতিকুসুমাঞ্জলির* ব্যাখ্যাকার অবতারকবির সময়কাল ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ।

আদ্যোপান্ত *ঈশ্বরশতক* কাব্যটি কৃত্রিমতা ও শব্দচাতুর্যে পরিপূর্ণ। কবি যমক, শ্লেষ প্রভৃতির ব্যবহারে স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছেন; যা দেখে মাঘ, ভারবি প্রমুখ কবিগণের কঠিন শব্দালংকার মনে পড়ে যায়। একটি উদাহরণ যেমন-

নূনং নমন্মে নমনিম্নমেন্নমুমামনোমান ননুন্ন মোনম্

মানং মিমানং মুনিমানিনামনুন নামানমিনং নমামি।।[১২৪]

ঈশ্বরশতকে এরকম অনেক শ্লোক রয়েছে যার দ্বারা কবির বৈদগ্ধ্য প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। কবির ভক্তি-ভাবনাও তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি। কাব্যগুণের দিক থেকেও *ঈশ্বরশতক* বিদ্বজ্জনের দ্বারা সমাদৃত হয়নি। তাই অনেকে এই শতককে দুষ্কর চিত্রকাব্য বলে অভিহিত করেছেন।

১.৯.৯ শিবশতক(১): (খ্রিস্টিয় উনবিংশ-বিংশ শতক) কবি মহামহোপাধ্যায় গোকুল দাস মতান্তরে গোকুলনাথ বিরচিত শতককাব্য *শিবশতক*। মিথিলার মগরৌনি গ্রামে কবির জন্ম। পিতা পীতাম্বর পণ্ডিত। কবির অন্যান্য রচনাগুলি হল- *দীধিতিবিধৌত (শিরোমণিটীকা), ন্যায়সিদ্ধান্ততত্ত্ব, মাসমীমাংসা, মিথ্যাত্বনিরুক্তি, রাশিচক্র, রসমহার্ণব, লাঘবগৌরবরহস্য।*

১০৫টি পদ্যে বিন্যস্ত *শিবশতকে* মহাদেবের সর্বাতিশায়ী মহিমার বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যের শুরুতে কবি বৃক্ষরূপী মহাদেবের স্তুতি করেছেন এবং এই বৃক্ষের শাখাসমূহে ব্রহ্মাণ্ড, বিবিধ দর্শন সম্প্রদায়, ধর্ম ও নীতি আরোপিত হয়েছে।[১২৫] পার্থিব সুখের নিষ্ফলতা, আত্মা ও পরমাত্মার (শিব) পার্থক্য, মায়ার প্রভাব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে এই শতকে। এখানে বলা হয়েছে- শিব একাধারে সৃষ্টি ও বিনাশের অধীশ্বর। যেমন করে মা বিড়াল সন্তান প্রসবের পর নবজাত সন্তানকে খেয়ে ফেলে (এটি একটি প্রাচীন প্রবাদমাত্র, এর সত্যতা নেই।) একইভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করে ব্রহ্মাণ্ডের সমতা রক্ষার জন্য পুনরায় ধ্বংস করেন।[১২৬]

কাব্যটির একটি বিশেষ গুণ হল সরস-সরল ভাষা। *শিবশতক* উৎকৃষ্ট স্তোত্রসাহিত্যের মর্যাদার যোগ্য। ভক্তের অন্তরের দৈন্যতা কাব্যের সর্বত্র বিদ্যমান। অন্তিম শ্লোকে কবি বলেছেন-

ন দহতি সগরান্বয়ং ন পাদাত্ প্রভবতি নাপ্যলিকাদুদেতি চক্ষুঃ।

ন চ কিমপি শৃণোতি নেত্রবর্গো মম কথমস্তু তব স্তবেঽধিকারঃ।।[১২৭]

১.৯.১০ শিবশতক(২): (অষ্টাদশ শতক) বাণেশ্বর বিদ্যালংকার বিরচিত শতককাব্য *শিবশতক*। পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত হুগলী জেলার শোভাকর বংশে কবির জন্ম। কবির পিতা বিখ্যাত নৈয়ায়িক রামদেব তর্কবাগীশ এবং পিতামহ কবি বিষ্ণুসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য। শতককার *শিবশতক* ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলি হল- *চিত্রচম্পূ,*

বিবাদার্ণবসেতু, রহস্যামৃত (২০ সর্গাত্মক মহাকাব্য), হনুমত্স্তোত্র (খণ্ডকাব্য), তারাস্তোত্র (খণ্ডকাব্য), চন্দ্রাভিষেক (নাটক), কাশীশতক।

কবি বাণেশ্বর নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেব এবং বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেনের সভাকবির পদ অলংকৃত করেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কাল ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

১.৯.১১ শিবশতক(৩): কবি বীররাঘব অপর একটি *শিবশতক* শীর্ষক শতককাব্য রচনা করেন। বীররাঘব বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায়, কবি সহজমহারাজের পৃষ্ঠপোকতায় ছিলেন।[১২৮] কিন্তু কে এই সহজমহারাজ; সেই বিষয়েও কোনো তথ্য নেই। এই শতকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ দেবতার অধিক মহাদেবের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কবির মতে মহাদেবের সর্বাতিশায়ী মহিমার কীর্তন করাই মানুষের বিধেয়। শুধুমাত্র বার্ধক্যে উপনীত হয়ে জরাক্রান্ত কণ্ঠে তাঁর কীর্তন করাই ভক্তি নয়। প্রকৃত পক্ষে আজীবন তাঁর ভজনা করাই শ্রেয়। মহাদেব সকল রকম পাপাচারী এমনকী ব্রহ্মহত্যাকারীকেও ক্ষমা (আশীর্বাদ) করেন।

১.৯.১২ শ্রীগণেশশতক: শ্রীবালচন্দ্রের পুত্র যজ্ঞবেদেশ্বর বিরচিত ১০৮ পদ্যাত্মক শতককাব্য *শ্রীগণেশশতক* বা *গণেশস্তোত্রশতক*। কবি গণেশপূজনের এগারোটি পদ্ধতির কথা বলেছেন-

আদৌ মঙ্গলং শসনং বিনযাবগুম্ফো মনোনিগ্রহঃ
নির্বেদো বিরতিঃ স্বরূপচরিতং নতিঃ প্রার্থনা।
চেতস্তুষ্টিফলাভিধানকবিনামানীতি ভিন্নক্রমং
রম্যং পযশতং দশাধিকমিদং ভূযাদ্ বুধানাং মুদে।।[১২৯]

কবি গণেশের সিদ্ধিদাতৃ ও বিঘ্ননাশকারী রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে পার্বতী, মহাদেব ও কুমার কার্তিকের মহিমাও আলোচনা করেছন। যজ্ঞবেদেশ্বর কাব্যের শেষ পর্যায়ে জগতের সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন।

কবি কাব্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈদগ্ধ্য প্রকাশের প্রয়াস দেখিয়েছেন। কিছু শ্লোকে অনুপ্রাসের প্রয়োগ রয়েছে।

১.৯.১৩ শ্যামানন্দশতক: (খ্রিস্টিয় বিংশ শতক) শ্রীমদ্ রসিকানন্দ স্বীয় গুরুদেব শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর রাধা-গোবিন্দের প্রতি ভক্তিভাবনার বর্ণনা করেছেন এই শতকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পাঁচশততম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে ১০১ টি শ্লোকে নিবদ্ধ *শ্যামানন্দশতক* প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যটির 'অবতরণিকা' অংশ শ্রীমদ্ হরিদাস দাসজী কর্তৃক লিখিত হয়েছে, যার সময় দেওয়া হয়েছে ৪৫৮ গৌরাব্দ। অতএব শতকটি প্রকাশনার আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের পাশাপাশি সময়ে এই কাব্যটি রচিত হয়েছে।

বৈষ্ণব ভজন-ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভক্তগণ নিজে রাধাভাবে তন্ময়ীভূত হয়ে একমেবাদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমোন্মত্ত হয়ে ওঠেন। এই শতকেও কবি তাঁর গুরু শ্যামানন্দের রাধাভাবের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। শ্যামানন্দের বিশ্বকল্যাণকর মহিমা, গোপিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কামকলা, বৃন্দাবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, শ্যামানন্দের ধ্যান ও কালিন্দীতটে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগলীলা দর্শন প্রভৃতির মনোগ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায় *শ্যামানন্দশতকে*। বস্তুত কবি রসিকানন্দ স্বীয় গুরুদেবের মহিমা বর্ণনের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণোপাসনার ভাবগত তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন।

পাশাখেলা, উদ্যানক্রীড়া, জলকেলি প্রভৃতি লীলার ভাববৈচিত্র্য আস্বাদনে স্তম্ভ, স্বেদ এবং কম্প, নামকীর্তনে (প্রবল অনুরাগ বশতঃ) স্বরভঙ্গ, রাধা-কৃষ্ণবিরহ জনিত দুঃখে বৈবর্ণ্য, কীর্তনরসে প্রেমাশ্রু এবং মিলনান্তক রাসলীলার স্মরণে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটে। এইভাবে কবি ভক্তিরসের আস্বাদন করিয়েছেন।

শতকটি ভক্ত কবির অন্তরের দৈন্যতায় পূর্ণ। রাধা-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনই শুধু নয়, কাব্যরসিকগণের কাছেও কাব্যটি রসাস্বাদনযোগ্য। স্বভাবোক্তি ও উৎপ্রেক্ষার সহযোগে বৈষ্ণব কবি যমুনা ও তার তটবর্তী ব্রজরমণীকুলের লীলা বর্ণনা করেছেন। ব্রজগোপীর অঙ্গসৌন্দর্য বর্ণনাতেও কবি রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া, কাব্যের সর্বত্র উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালংকার দেখা যায়। সম্পূর্ণ কাব্যটি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে বিধৃত হয়েছে। কাব্যের অনেকাংশে যুগ্মক, কুলক ইত্যাদি শ্লোকসমন্বয়ও দেখা যায়।

উপরে আলোচিত শতকগুলি ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন অনেক শতককাব্য রয়েছে। কিছু শতকের তালিকা নিচে দেওয়া হল

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
সমাধিশতক	সর্বার্থসিদ্ধিকর	পঞ্চম শতক
সৌন্দর্যলহরী	শংকরাচার্য	ষষ্ঠ শতক
শতশ্লোকী	,,	,,
দেবীশতক	আনন্দবর্ধন	নবম শতক
ভল্লটশতক	ভল্লট	নবম শতক
লোকেশ্বরশতক	বজ্রদত্ত	নবম শতক
অন্যোক্তিমুক্তালতা	শম্ভুকবি	একাদশ শতক
সুন্দরীশতক	শিবদাস বা শিবভক্তদাস	ত্রয়োদশ শতক
রামশতক	শ্রীসোমেশ্বর	ত্রয়োদশ শতক
রোমাবলীশতক	রামচন্দ্র কবি	ত্রয়োদশ শতক
ভক্তিশতক	,,	,,
শান্তিশতক	শিহ্লণ	ত্রয়োদশ শতক
শৃঙ্গারশতক	জনার্দন ভট্ট	ত্রয়োদশ শতক
কৃষ্ণকর্ণামৃত	লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল	ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক
কংশারিশতক	আচার্য গঙ্গাদাস	ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক
দিনেশশতক	,,	,,
সুন্দরীশতক	উৎপ্রেক্ষাবল্লভ	চতুর্দশ শতক
দয়াশতক	বেদান্তদেশিক	চতুর্দশ শতক
বৈরাগ্যশতক	,,	,,
অচ্যুতশতক	,,	,,
দৃষ্টান্তশতক বা দৃষ্টান্তকলিকা	কুসুমদেব	চতুর্দশ শতক
গোরক্ষশতক	অজ্ঞাত	পঞ্চদশ শতক

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
শ্রীচৈতন্যশতক	সার্বভৌম ভট্টাচার্য	পঞ্চদশ শতক
দুর্গাশতক	গজপতিপুরুষোত্তম	পঞ্চদশ শতক
নীতিশতক	ধনদরাজ	পঞ্চদশ শতক
শৃঙ্গারশতক	,,	,,
বৈরাগ্যশতক	,,	১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ
বিবেকশতক	প্রবোধানন্দ সরস্বতী	পঞ্চদশ/ষোড়শ শতক
নারায়ণশতক	বিদ্যাকর পুরোহিত	পঞ্চদশ/ ষোড়শ শতক
বরদরাজস্তব	অপ্যয্য দীক্ষিত	ষোড়শ শতক
বরদরাজপঞ্চাশতী	,,	,,
ভক্তিশতক	,,	,,
শ্রীকালহস্তীশ্বরশতক	ধূর্জটি	ষোড়শ শতক
আর্যাশতক	কবি কর্ণপুর পরমানন্দ দাস	ষোড়শ শতক
উপাসনাশতক	জগন্নাথদাস গোস্বামী	ষোড়শ শতক
রসিকরঞ্জনশতক	রামচন্দ্রকবি	১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দ
আনন্দসাগরস্তব	নীলকণ্ঠ দীক্ষিত	সপ্তদশ শতক
আনন্দমন্দাকিনী	মধুসূদন সরস্বতী	সপ্তদশ শতক
অন্যাপদেশশতক	জগন্নাথ পণ্ডিৎ	সপ্তদশ শতক
সোমনাথশতক	সোমনাথ	সপ্তদশ শতক
অধরশতক বা ওষ্ঠশতক	নীলকণ্ঠ শুক্লা	সপ্তদশ শতক
শ্রীরামপ্রতিপত্তিশতক	রামভদ্র দীক্ষিত	সপ্তদশ শতক
রামচাপস্তব	,,	,,
রামবাণস্তব	,,	,,

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
আশ্লেষশতক	নারায়ণ পণ্ডিত	সপ্তদশ শতক
নীলাদ্রিনাথশতক	পুরুষোত্তম মিশ্র	সপ্তদশ শতক
কৃষ্ণভাবশতক	বুক্কপত্তনম্ ভেংকটাচার্য	অষ্টাদশ শতক
জ্ঞানশতক	সর্পভূষণ শিবযোগিন্	অষ্টাদশ শতক
কাব্যভূষণশতক	বল্লভ ভট্ট	অষ্টাদশ শতক
আর্যাসপ্তশতী	বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত	অষ্টাদশ শতক (মতান্তরে সপ্তদশ শতক)
হোলিকাশতক	,,	,,
বক্ষোজশতক	,,	,,
রোমাবলীশতক	,,	,,
দুর্মিলাশতক	ত্রিলোকনাথ মিশ্র	১৭৯৪
গৌরালংকার	মল্লভট্ট	উনবিংশ শতক
কালিকামন্দাক্রান্তাশতক	কৃষ্ণ শর্মা	উনবিংশ শতক
জানকীচরণচামর	শ্রীনিবাসাচার্য	উনবিংশ শতক
নীতিশতক	,,	,,
কান্তাবক্ষোজশতোক্তি বা স্তনশতক	মল্লভট্ট	উনবিংশ শতক
ব্যাজোক্তিরত্নাবলী	মহালিঙ্গ শাস্ত্রী	উনবিংশ শতক
রামবর্ম-শতক	রাম পিশারক	উনবিংশ শতক
ভূপশতক	রাঘবভট্ট	উনবিংশ শতক
মালবীয়শতক	রতিনাথ ঝা	উনবিংশ শতক
শস্পশতক	শ্রীশৈল শ্রীনিবাসাচার্য	উনবিংশ শতক

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
দেবীশতক	শ্রীশ্বর বিদ্যালংকার	উনবিংশ শতক
শক্তিশতক	,,	,,
গান্ধীচরিত	ব্রহ্মানন্দ শুক্লা	উনবিংশ শতক
ব্রহ্মানন্দশতক	,,	,,
জবাহরতরঙ্গিনী বা ভারতরত্নশতক	শ্রীধর ভাস্কর বার্নেকর	উনবিংশ শতক
পাদশতক	কালীচরণরথ শর্মা	উনবিংশ শতক
শৃঙ্গারসপ্তশতিকা	পরমানন্দ	১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ
সম্যক্ত্বসারশতক	আচার্য জ্ঞানসাগর	১৮৫৬
ব্রহ্মশতক	কালীপদ শর্মা	উনবিংশ-বিংশ শতক
দুর্গাশতক	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	উনবিংশ বিংশ শতক
মাতৃভূতশতক	শ্রীধর বেংকটেশ	উনবিংশ বিংশ শতক
ইন্দিরাযশস্তিলক	রমেশচন্দ্র শুক্লা	বিংশ শতক
বিবেকশতক	জয়রাজ শর্মা পাণ্ডে	বিংশ শতক
গান্ধীগৌরব	,,	১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
শ্রীনৃসিংহশতক	গঙ্গাধর	বিংশ শতক
ভক্তিশতক	,,	বিংশ শতক
ইন্দিরাযশস্তিলক	,,	বিংশ শতক
সুমতিশতক	তি. গু. বরদাচার্য	বিংশ শতক
শ্রীকোমলবল্লীস্তুতিশতক	কোমলবল্লী দেবী	বিশ শতক
শক্তিশতক	শিবজী উপাধ্যায়	বিংশ শতক
শ্রীশতক	,,	,,

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
মাতৃশতক	,,	,,
কুম্ভশতক	,,	,,
মারুতিশতক	রামাবতার শর্মা	বিংশ শতক
ইন্দিরাকীর্তিশতক	কৃষ্ণসেমবাল	বিংশ শতক
ইন্দিরাবিজয়প্রশস্তি	হাজারিলাল শাস্ত্রী	বিংশ শতক
গুণ্ডিচোৎসববর্ণনম্	ভগবত কবিরাজ	বিংশ শতক
জগন্নাথশরণাগতিস্তোত্র	সুন্দর রাজ	বিংশ শতক
শ্রীবৈজয়ন্তীশতক	গোবিন্দচন্দ্র মিশ্র	বিংশ শতক
শ্রীসকলেশ্বরশতক	গণেশ্বররথ বাচস্পতি	১৯৫৪
শ্রীনিবাসশতক	সুন্দর শর্মা	১৯৭৮
দেবীশতক	,,	১৯৮০
বীরাঞ্জনেয়শতক	,,	১৯৮১
শম্ভূশতক	,,	১৯৮২
ছায়াপতিশতক	,,	১৯৮৩
বিঘ্নাধিরাজশতক	,,	১৯৮৪
তত্ত্বশতক	,,	১৯৯০
শ্রীজগন্নাথশতক	জন্দ্রশেখর মিশ্র	১৯৬৮
শ্রীজগন্নাথাষ্টত্তোরশতনাম	সুদর্শনাচার্য	১৯৮৭
শ্রীমন্দিরেশশতক	প্রমোদচন্দ্র মিশ্র	১৯৯৭
পাথেয়শতক	রামকরণ শর্মা	বিংশ-একবিংশ শতক
শ্রীগৌরীশতক	ডঃ ভগবান পাণ্ডা	বিংশ-একবিংশ শতক

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
হনুমচ্ছতক	মহেন্দ্র শুক্লা	একবিংশ শতক
সূর্যশতক	,,	,,
শ্রীগুরুচরণশতক	উমারমণ ঝা	একবিংশ শতক
বাজপেয়ীশতক	দেবনারায়ণ ঝা	একবিংশ শতক
সুদর্শনশতক	ক্রূরনারায়ণ	অজ্ঞাত
আর্যাশতক	মূককবি	অজ্ঞাত
দেবীগীতিশতক	সুন্দরাচার্য	অজ্ঞাত
শতশ্লোকী	রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য	অজ্ঞাত
জিনশতক	জম্বুকবি	অজ্ঞাত
কাননশতক	তারাচন্দ্র	অজ্ঞাত
নারায়ণীয়	নারায়ণ ভট্ট	অজ্ঞাত
নীতিশতক	বেংকটরায়	অজ্ঞাত
রসবতীশতক	ধরণীধর	অজ্ঞাত
মৃগাংকশতক	কবিকংকন	অজ্ঞাত
শৃঙ্গারশতক	ব্রজলাল	অজ্ঞাত
বৃন্দাবনশতক	মানাংক	অজ্ঞাত
পূর্ণত্রাজিশস্তোত্র	রঘুরাজ	অজ্ঞাত
জগদীশ্বরশতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
দরিদ্রনারায়ণশতক	জগন্নাথ ব্যাস	অজ্ঞাত
অন্যাপদেশশতক	মধুসূদন কবি	অজ্ঞাত
অন্যোক্তিমুক্তাবলী	সোমনাথ	অজ্ঞাত
ব্যাজোক্তিরত্নাবলী	মহালিঙ্গ শাস্ত্রী	অজ্ঞাত

কাব্য	কবি	সময়কাল (খ্রিস্টাব্দ)
বৈরাগ্যশতক	পদ্মানন্দ	অজ্ঞাত
বৈরাগ্যশতক	জনার্দন	অজ্ঞাত
প্রজ্ঞালহরী	অজ্ঞাতনামা	অজ্ঞাত
শৃঙ্গারকলিকা-ত্রিশতী	কামরাজ দীক্ষিত	অজ্ঞাত
কবিরাক্ষসীয়	অজ্ঞাতনামা	অজ্ঞাত
রসবতীশতক	অজ্ঞাতনামা	অজ্ঞাত
কাকশতক	অজ্ঞাতনামা	অজ্ঞাত
খড্গাশতক	অজ্ঞাতনামা	অজ্ঞাত

অন্ত্যটীকা

১. প্রদ্যুম্ন পাণ্ডেয় সম্পাদিত *অমরুশতকের* ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ১৩

২. A Śataka, meaning a century of detached stanzas, is usually regarded as the work of a single Poet. (*History of Sanskrit Literature*, Page- 157)

৩. *History of Sanskrit Literature*, Page- 157-158

৪. A History of Sanskrit Literature. Page- 669

৫. তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৪. ৪২. ৫

৬. A survey of Sataka poetry, page- 34

৭. Satak in Sanskrit Literature by M.B. Paraddi. page - 17

৮. কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায় (কবিরহস্য)

* পাঠান্তর- যদি বা ত্রয়ঃ।

৯ গাহাসত্তসঈ ১. ৩

১০. পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত গাথাসপ্তশতীর ভূমিকা অংশ। পৃষ্ঠা-২

১১. Sukumari Bhattacharji, *A Survey of Śataka Poetry*. Page- 34-35

১২. The Subhaṣitaratnakośa of Vidyakara. Ed. Daniel H.H. Ingalls, Harvard University Oriental Series. No- 44, 1965. Page- 297

১৩. দশরূপক ১. ১৪

১৪. অভিজ্ঞানশকুন্তল ৫. ১

১৫. দারিদ্র্যশতক, পৃষ্ঠা- ৪২

১৬. দেবীশতক ৪৬

১৭. ঈশ্বরশতক ৯২

১৮. খণ্ডকাব্যং ভবেত্ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ। সাহিত্যদর্পণ ৬. ৩২৮

১৯. কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ। তদেব, ৬. ৩২৯

২০. ধ্বন্যালোক লোচন ৩. ৭

২১. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ৩. ২৯

২২. ক্রমসিদ্ধিস্তযোঃ স্রগুত্তংসবত্। তদেব, ১. ৩. ২৮

২৩. কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায় (কবিরহস্য)

২৪. ধ্বন্যালোক ৩. ৭

২৫. অমরুশতক শ্লোক-২ এর টীকা অংশ

২৬. মুক্তকঃ শ্লোকঃ একৈকশ্চমত্কারক্ষমঃ সত্যম্। অগ্নিপুরাণ ৩৩৬. ৩৬

২৭. সভারঞ্জনশতক ১৪

২৮. সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃষ্ঠা- ২৮২

২৯. অমরুশতক ১০৫

৩০. গাহাসত্তসঈ ২. ৭৬

৩১. পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত গাথাসপ্তশতীর ভূমিকাংশ, পৃষ্ঠা-১১

৩২. গাহাসত্তসঈ ১. ৩

৩৩. রসিঅজণহিঅঅইএ কবইচ্ছলপমুহসুকইণিম্মবিএ।
সত্তসঅম্মি সমত্তং পঢমং গাহাসঅং এঅং।। তদেব, অন্তিম শ্লোক

৩৪. জগন্নাথ পাঠক সম্পাদিত গাথাসপ্তশতীর ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ১৫

৩৫. মুহ-মারুএণ তং কণ্ হ গো-রঅং রাহিআএঁ অবনেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অপ্পাণ বি গোরঅং হরসি।। গাহাসত্তসঈ ১. ৮৯

৩৬. ঘরিণিঘণত্থণপেল্লণসুহেল্লিপডিঅস্স হোন্তপহিঅস্স।
অবসউণঙ্গারঅবারবিট্ঠিদিঅহা।। তদেব, ৩. ৬১

৩৭. জগন্নাথ পাঠক সম্পাদিত গাথাসপ্তশতীর ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ১৬

৩৮. অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোত্ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ।। হর্ষচরিত ১. ১৪

৩৯. বজ্জবডণাইরিক্কং পইণো সোঊণ সিজ্জিণীঘোসং।
পুসিআইং করিমরিএঁ সরিসবন্দীণং পি ণঅণাইং।। গাহাসত্তসঈ ১. ৫৪

৪০. কইঅবরহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ।
অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোত্তমি কো জীঅই।। তদেব ২. ২৪

৪১. তদেব, ১. ৮৯

৪২. পসুবইণো রোসারুণপডিমাসংকংতগোরিমুহঅন্দং।
গহিঅগ্ঘপংকঅং বিঅ সংঝাসলিলঞ্জলিং ণমহ।। তদেব, মঙ্গলাচরণ শ্লোক

৪৩. তদেব, ৪. ৭

৪৪. কুমারসম্ভব ৭. ৯০

৪৫. অমরুশতক ১ (রসিকসঞ্জীবনী টীকা)

৪৬. *অত্র কবিঃ শৃঙ্গাররসাত্মকং কাব্যম্প্রারভমাণঃ, স্বকাব্যে প্রতিপাদ্যমানস্য কামপুরুষার্থস্য সর্বাতিশাযিত্বং দর্শিতবান্* –শৃঙ্গারদীপিকা। (অমরুশতক ১,২)

৪৭. Assuming that the verses referred to by Ānandavardhana are genuine verses of Amaru, we may suppose that Amaru had attained celebrity by the 8th century A. D (*A History of Sanskrit Literature.* Page- 669)

৪৮. From the elaboration and perfection of the technique it seems much more probable that the poet wrote after rather than before 650" (*A History of Sanskrit Literature*. Page-183)

৪৯. "The earliest mention of Amaru as a poet of eminence is found in the middle of the 9th century in Ānandavardhana's works, but it is of little assistance, as Amaru is perhaps a much earlier writer." (*History of Sanskrit Literature.* Page-158)

৫০. অমরুশতক ৮৮

৫১. তদেব, ৪০, ১০১

৫২. তদেব, ২৩

৫৩. কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য প্রেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥ ভট্টিকাব্য ২২. ৩৫

৫৪. দিককালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকমানায নমঃ শান্তায তেজসে।। নীতিশতক ১
শম্ভুস্বযম্ভুহরযো হরিণেক্ষণানাং যেনাক্রিযন্ত সততং গৃহকর্মদাসাঃ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রায তস্মৈ নমো ভগবতে মকরধ্বজায।। শৃঙ্গারশতক ১
চূডোত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেযোদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগভারমুচ্চাটযং
শ্বেতসদ্মনি যোগিনাং বিজযতে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ।। বৈরাগ্যশতক ১

৫৫. অভূন্ নৃপো বিৰুধসখঃ পরন্তপঃ শ্রুতাঽন্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।
গুণৈর্বরং ভুবনহিচ্ছলেন যং সনাতনঃ পিতরমুপাগমত্ স্বযম্।। ভট্টিকাব্য ১

৫৬. It there is any substance in the legend recorded by Yi-sting that Bhartṛhari vacillated no less than seven times between the comparative charms of the monastery and the world, it signifies that the poet who wrote a century of passionate stanzas could very well write the other two centuries on worldly wisdom and renunciation. (*History of Sanskrit Literature*. page- 162)

৫৭. ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সত্পুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥ অভিজ্ঞানশকুন্তল ৫. ১২

৫৮. যা সাধূংশ্চ খলান্ করোতি বিদূষো মূর্খান্ হিতান্ দ্বেষিণঃ
প্রত্যক্ষং কুরুতে পরোক্ষমমৃতং হালাহলং তৎক্ষণাৎ।

তামারাধয সত্ক্রিযাং ভগবতীং ভোক্তুং ফলং বাঞ্ছিতং
হে সাধো ব্যসনৈর্গুণেষু বিপুলেষ্বাস্থাং বৃথা মা কৃথা।। নীতিশতক ১০৩

৫৯. তদেব, ২

৬০. স্মিতেন ভাবেন চ লজ্জযা ভিযা পরাঙ্মুখৈরর্ধকটাক্ষবীক্ষণৈঃ।
বচোভিরীর্ষ্যাকলহেন লীলযা সমস্তভাবৈঃ খলু বন্ধনং স্ত্রীযঃ॥
তস্যাঃ স্তনৌ যদি ঘনৌ জঘনং চ হারি বক্ত্রং চ চারু তব চিত্ত কিমাকুলত্বম্।
পুণ্যং কুরুষ্ব যদি তেষু তবাস্তি বাঞ্ছা পুণ্যৈঃ বিনা ন হি ভবন্তি সমীহিতার্থাঃ॥ শৃঙ্গারশতক ২, ১৮

৬১. তদেব, ৭

৬২. বৈরাগ্যশতক ৭

৬৩. তদেব, ৮৯

৬৪. বিদ্রাণে রুদ্রবৃন্দে সবিতরি তরলে বজ্রিণি ধ্বস্তবজ্রে
জাতাশঙ্কে শশাঙ্কে বিরমতি মরুতি ত্যক্তবৈরে কুবেরে।
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে মহিষমতিরুষং পৌরুষোপন্ননিঘ্নং
নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী বঃ শমযতু দুরিতং ভূরিভাবা ভবানী॥ তদেব, ৬৬

৬৫. মা ভাঙ্ক্ষীর্বিভ্রমং ভ্রূরধর বিধুরতা কেযমাস্যাস্য রাগং
পাণে প্রাণ্যেব নাযং কলযসি কলহশ্রদ্ধযা কিং ত্রিশূলম্।
ইত্যুদ্যত্কোপকেতূন্প্রকৃতিমবযবান্প্রাপযন্ত্যেব দেব্যা
ন্যস্তো বো মূর্দ্ধি মুষ্যান্নরুদসুহৃদসূন্সংহরন্নঙ্ঘ্রিরংহঃ॥ তদেব, মঙ্গলাচরণ শ্লোক

৬৬. ভঙ্গো ন ভ্রূলতাযাস্তলিতৰলতযা২নাস্থমস্থ্নাং তু চক্রে
ন ক্রোধাত্পাদপদ্মং মহদমৃতভুজামুদ্ধৃতং শল্যমন্তঃ।
বাচালং নূপুরং নো জগদজনি জযং শংসদংশেন পার্শ্বে-
র্মুষ্ণন্ত্যা২সূন্সুরারেঃ সমরভুবি যযা পার্বতী পাতু সা বঃ॥ তদেব, ১৩

৬৭. মৃত্যোস্তুল্যং ত্রিলোকীং গ্রসিতুমতিরসান্নিঃসৃতাঃ কিং নু জিহ্বাঃ
কিং বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মদ্যুতিভিররুণিতা বিষ্ণুপদ্যাঃ পদব্যঃ।
প্রাপ্তাঃ সন্ধ্যাঃ স্মরারেঃ স্বযমুত নুতিভিস্তিস্র ইত্যুহ্যমানা
দেবৈর্দেবীস্ত্রিশূলাহতমহিষজুষো রক্তধারা জযন্তি॥ তদেব, ৪

৬৮. তদেব, ৩১

৬৯. তদেব, ৮২

৭০. শ্লোকা লোকস্য ভূত্যৈ শতমিতি রচিতা শ্রীময়ূরেণ ভক্ত্যা
যুক্তশ্চৈতান্ পঠেদ্ যঃ সকৃদপি পুরুষঃ সর্বপাপৈর্বিমুক্তঃ। সূর্যশতক অন্তিম শ্লোক

৭১. তদেব, ৯৪

৭২. তদেব, ৯১

* মতান্তরে 'সংকুচিতম্'

৭৩. আর্যাসপ্তশতী ৩৮

৭৪. সকলকলা কল্পয়িতুং প্রভুঃ প্রৰন্ধস্য কুমুদৰন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাকাপ্রদোষশ্চ॥ তদেব, ৩৯

৭৫. তস্মিন্নেকা কুবলযুবতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদকুসুমতোঽপ্যাযূধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজযে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
ৰালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সম্বিধেযী বভূব॥ পবনদূত ২

৭৬. দেবঃ কুপ্যতু বা বিচিন্ত্য বিনযং প্রীতোঽস্তু বামাদৃশৈঃ
বাঞ্ছাদ্ভিঃ প্রভুকীর্ত্তিমপ্রতিহতাং বক্তব্যমেবোচিতং।
সেবাভির্যদি সেনবংশতিলকাদাশাসনীযাঃ শ্রিযঃ
সংকল্পানুবিধাযিনাং সুরতস্তত্ কেন হার্য্যো মন্দঃ॥ সদুক্তিকর্ণামৃত ৩. ৫৪. ৫

৭৭. আর্যাসপ্তশতী ৪০৯

৭৮. শৃঙ্গারোত্তরসত্প্রমেযরচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন। গীতগোবিন্দ ১. ৪

৭৯. গাহাসত্তসঈ মঙ্গলাচরণশ্লোক।

৮০. আর্যাসপ্তশতী ৭

৮১. ভৈষজ্যদ্বিজতারকাধিপতিরপ্যেতিক্ষপেশঃক্ষযং
ক্ষীণাংগঃশরণংশরণ্যগণনাগ্রণ্যংযমার্ত্তিচ্ছিদম্।
তংদেবংতরণিংপ্রণম্যসরুজাংসৌখ্যাযকুর্মঃশত-
শ্লোকীংষোডশকোক্তচূর্ণগুটিকালেহাজ্যতৈলোদকাম্॥ ৰোপদেববৈদ্যশতক (চূর্ণাধিকার) ১

৮২. দেশানাংবরদাতটংবরমতঃসার্থাভিধানংমহা-
স্থানংদেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যংসহস্রংদ্বিজাঃ।
তত্রামীষুধনেশকেশববিদৌবৈদ্যোবরিষ্ঠৌক্রমা-
চ্চক্রেশিষ্যসুতস্তযোঃকৃতিমিমাংশ্রীৰোপদেবঃকবিঃ॥ তদেব, (শেষঃ) ৩

৮৩. কাব্যমালা সিরিজ, চতুর্থ গুচ্ছক, পৃষ্ঠা ১৯৮

৮৪. অপ্পয় দীক্ষিতকৃত বৈরাগ্যশতক ৬

৮৫. তদেব, ৫৮

৮৬. তদেব, ১০

৮৭. সভারঞ্জনশতক ১৪

৮৮. সাহিত্যবিদ্যাহীনানাং সর্বশাস্ত্রবিদামপি।
সমাজং পরিপশ্যন্তি সমজং ৰুদ্ধিশালিনঃ॥ তদেব, ১৬

৮৯. নামরূপাত্মকং বিশ্বং দৃশ্যতে যদিদং দ্বিধা।
তত্রাদ্যস্য কবির্বেধা দ্বিতীযস্য চতুর্মুখঃ॥ তদেব, ২৬

৯০. তদেব, ৩৬

৯১. উপদেশশতক ২১

৯২. তদেব, ২২

৯৩. শুম্ভাদিদৈত্যদলমদ্য পুনর্নবীন মাধায় রূপমনুতাপয়তি প্রজাস্তে।
সংহৃত্য তত্ করুণয়া কুরু শান্তিমন্ত্র ত্বামন্তরেণ ন হি কোঽপি তথা সামর্থঃ॥ চণ্ডিকাশতক ১১

৯৪. যে নাম সন্তি সরলা শ্রমজীবিনোঽস্ব ক্ষেত্রেষু কার্মিকগৃহেষু খনিষ্বরবেদং
স্বীকৃত্য দৈন্যমপি কর্ম নিজং বহন্তি তেঽপি ত্বদর্চনমনুক্ষণমাচরন্তি॥ তদেব, ৭০

৯৫. কৃষ্ণেন্ধনস্য খনিষু শ্রমজীবিনীনাং শ্যামং শ্রমেণ রুধিরাক্ষিযুগং করালং
স্বেদাম্ভসালিখিতগণ্ডমুখং বিলোক্য শ্রীকালিকাননমহং সহসা স্মরামি॥ তদেব, ৭৩

৯৬. তদেব, ৫১

৯৭. তপোভিশ্চ যে সিদ্ধিমার্গপ্রবৃত্তাঃ পরব্রহ্মণি ধ্যানবন্তঃ প্রসিদ্ধাঃ।
মহাজ্ঞানযোগান্বিতানাং হি তেষাং মনশ্চাপি মথ্নাতি বাসন্তবাতঃ॥ বসন্তশতক ২২

৯৮. ধরা সর্ষপাগ্রোদ্গতৈঃ পুষ্পজাতৈঃ সুপীতং দুকূলং শুভং সন্দধানা। তদেব, ২৩

৯৯. প্রপঞ্চং যদা ভাবয়ন্নাদিদেবঃ ক্রতুং সর্বদেবৈঃ সহৈবাততান।
তদা চেন্ধনং গ্রীষ্ম আসীদপূর্বমভূদ্দেবযজ্ঞেঽযমাজ্যং বসন্তঃ॥ তদেব, ৬৭

১০০. শুভং স্যাত্ সমেষাং সমত্বং সমন্তাত্ সমাজে সমাধানমাসাদনীয়ম্।
ইতীদং দিশন্ শাখিশাখাসু রম্যং নবং পল্লবং লাতি বসন্তবাতঃ॥ তদেব, ২

১০১. ধর্মো নীতির্বহুবিধকলাঽনন্তসাহিত্যরাশি
সর্বেঽপীমে খলু জনিভুবঃ প্রাণতুল্যা ভবন্তি॥ শতকচতুষ্টয় ১. ১৭

১০২. গাঙ্গং বা স্যাদ্ রবিদুহিতৃজং বারি শাতদ্রবং বা
কাবেরীজং বিবিধতটিনীসম্ভবং বা প্রকামম্।
অব্ধৌ সর্বং বিলযতি সদা নামরূপে বিহায
ধর্মাশ্চেশং চরমসময়ে যান্ত্যপাধীনপাস্য॥ তদেব, ১. ৭৮

১০৩. যস্মিন্ ভেদো নিজপরজনে ৰন্ধুতাযা অভাবো
হিংসা ক্রূরা নিজহিতকৃতে প্রাণিনাং নির্দযং স্যাত্।

সেবাঽভাবঃ পরমতবতি দ্বেষভাবঃ সমাজে

নাঽসৌ ধর্মঃ স খলু ভবতিচ্ছদ্মধর্মপ্রপঞ্চঃ॥ তদেব, ১. ৭৯

১০৪. পক্ষী বা স্যাং তরুবরশিখাসংশ্রযো মাতৃভূমৌ

কীটো বা স্যাং মৃদি বিহরণপ্রেমবান্ নিত্যমস্যাঃ।

বন্যো বা স্যাং কৃশতনুমৃগঃ সঞ্চরন্নির্বিশংকং

যঃ কোঽপি স্যাং জনিমিহ পরং সর্বথাঽহং লভেযম্॥ তদেব, ১. ৯৯

১০৫. নিঃশেষদর্শনমতপ্রতিপত্যনীশ জিজ্ঞাসুতর্ষশমনায নিকৃষ্য সারম্।

প্রস্তূযতে সরলমল্পকলেবরেণ নদ্যম্বু পাত্রনিহিতং হি সুখপ্রপেযম্॥ তদেব, ২. ১৮

১০৬. সত্যানুভূতির্নিখিলং বিচারং বিচার আচারমিহানুশাস্তি।

আচার এবাথ সমাজশাস্তা ব্যবস্থিতং তেন বিশালরাষ্ট্রম্॥ তদেব, ৩. ৬৫

১০৭. আতংকবাদেন বিমৃদ্যমানং ৰংভ্রম্যমাণং ভ্রমচক্রবাতৈঃ।

নিষ্পিষ্যমাণং মতভেদভারৈস্ত্রাতুং জগত্ ভারতমেব শক্তম্॥ তদেব, ৩. ৯০

১০৮. অসংস্কৃতজ্ঞান্ নিজদেশভক্তান্ বিজ্ঞাপনাযামরবাঙ্মহিম্নঃ।

তদ্বৃদ্ধযে প্রেরযিতুং চ তজ্জ্ঞান্ নিবেদ্যতে শ্লোকশতেন হার্দম্॥ তদেব, ৪. ২

১০৯. বৈজ্ঞানিকী স্যাত্ প্রগতিস্তু দেশে শরীরনির্মাণবিধৌ সমর্থা।

চরিত্রনির্মাণকলান্বিতা তু সংস্কারভাষা খলু সংস্কৃতাখ্যা॥ তদেব, ৪.১২

১১০. ত্যক্ত্বা নিজং সৌরভনাভিরজ্ঞো গন্ধং যথা ধাবতি সর্বদিক্ষু।

তথাঽবমত্যামরবাঙ্নিধিং স্বাং ৰম্ভ্রম্যমাণা বযমস্তভাগ্যাঃ॥ তদেব, ৪. ১৬

১১১. যস্মিন্ যুগে সংস্কৃতরত্ননাশো ভবিষ্যতি ভ্রান্তসমাজহেতোঃ।

কলংকপূর্ণং ত্বিতিহাসকারা ব্রূযুর্যুগং তং স্মর ভারতীয!॥ তদেব, ৪. ৩৬

১১২. জানীহি রে ত্বং ৰহুভাগ্যদেশ! ভূমৌ যশস্তে খলু সংস্কৃতেন।

যদা গতং সংস্কৃতমত্রদেশা ন্নূনং যশো ধূসরিতং ধিযস্তে॥ তদেব, ৪. ৩৮

১১৩. বিশালকালস্থিতিহেতুনাঽস্যাং দোষা অপীযুঃ কতিচিদ্ যুগোত্থাঃ।

প্রক্ষালনীযং বসনং সদোষং ন নাশনীযং পরমার্যবযৈঃ॥ তদেব, ৪. ২০

১১৪. যদ্যন্ত্যজাঃ স্মার্তজনৈর্নিষিদ্ধাঃ প্রশংসিতশ্চেদ্ ৰহুধাঽগ্রজন্মা।

ন শ্লিষ্যতে চেদ্ অপনীযতাং তন্ন সংস্কৃতং হাতুমনেন যুক্তম্॥ তদেব, ৪. ২১

১১৫. তদেব, ৪. ৫০

১১৬. প্রশাসনস্থাঃ প্রতিৰোধনীযাঃ পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতরক্ষণায।

অবাপ্য সর্বং খলু রাজ্যরক্ষাম্ অস্মিন্ যুগে প্রোন্নমতীত্যবেক্ষ্য॥ তদেব, ৪. ৮০

১১৭. হর্ম্যেষু হট্টেষু চ নামপট্টং গীর্বাণবাচা লিখিতং ধৃতং স্যাত্।
মার্গাঃ সুবীথ্যো নগরাণি চ স্যুরেতদ্বিশুদ্ধাক্ষরভূষিতানি॥ তদেব, ৪. ৮৪

১১৮. সপার্ষদ-বৈদ্যনাথশতক ১০১

১১৯. জহ্নুকন্যাসমা দেশকন্যাঃ সমাঃ শিক্ষিতা বাঞ্ছিতাশ্চাপি কার্যাঃ সদা।
যৌতুকং প্রব্রজেদ্দেশতো হ্যামযঃ কশ্চনাঽত্র প্রদুষ্যান্ন কন্যাং ক্বচিত্॥ তদেব, ১০১

১২০. জীবিতস্য ন পৃচ্ছা কা শ্রাদ্ধং মৃতস্য সাদরম্।
লোকানাং ব্যবহারোঽযং বিষমঃ কং ন পীডযেত্॥ অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতী ২০৩

১২১. মৃতানর্চযন্তি সশ্রদ্ধং জীবিতান্ যে তুদন্ত্যলম্।
অমী কেনোপমীযেরন্ দ্বিধাচার-পরাযণাঃ॥ তদেব, ৩৭৩

১২২. তদেব, ৪০৮

১২৩. বাণীশতক ২২

১২৪. ঈশ্বরশতক ৯২

১২৫. বিততবিবিধসম্প্রদাযশাখাব্যতিকরবেষ্টিতমূর্তযে নমোঽস্তু।
ৰহুতরজগদণ্ডৰীজপূরপ্রসবফলেগ্রহিপাদপায তুভ্যম্।। শিবশতক ১

১২৬. দ্রুহিণভবনপদ্মৰীজমালামণিপরিবর্তনতত্পরাত্মনস্তে।
গ্রসিতুমখিলমেব জন্তুজাতং বিজনযতো বিদিতা বিডালবৃত্তিঃ।। তদেব, ৫৭

১২৭. তদেব, ১০৫

১২৮. সহজমহারাজগ্রামনিবাসী বিবেকমূর্ধন্যঃ।
শ্রীবীররাঘবাখ্যঃ সংরণ্যাবান্ স্তোত্রমেতদতানিষ্ট॥ এম. বি. পরাড্ডিকৃত *শতক ইন সংস্কৃত লিটারেচার*। পৃষ্ঠা- ৩০৬

১২৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা

একবিংশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যে রাজেন্দ্র মিশ্র একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র একাধারে দৃশ্য-শ্রব্যকাব্যকার, গীতিকাব্যকার তথা কাব্য সমালোচক। সংস্কৃত, হিন্দী এবং ভোজপুরি এই তিন ভাষাতেই কবি নিজস্ব কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই তাঁকে *ত্রিবেণী কবি* বলা হয়-

হিন্দীভোজপুরীদেববাণীত্রয্যা সমন্বিতঃ।

কাব্যনাট্যকথাত্রয্যা ত্রিবেণীকবিরেব সঃ॥[1]

২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়: শৈক্ষণিক প্রমাণপত্র অনুসারে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের জন্ম **১৯৪৩** খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী শনিবার। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের দ্রোণীপুর নামক গ্রামে। কিন্তু একটি সাক্ষাৎকারে কবি জানিয়েছেন যে, তাঁর জন্ম পৌষের কৃষ্ণা চতুর্থী শনিবার, সংবত্ **১৯৯৯** অর্থাৎ **১৯৪২** খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর। তাছাড়া কবি *বামনাবতরণ* মহাকাব্যে এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

রসরসরসচন্দ্রে হাযনে বিক্রমাণাং

হৃতজনবিষাদো মাসি পৌষেঽসিতাংশে।

অবতরণমুপেতঃ সপ্তমেঽহিন্ প্রভাতে

স্বজনবিজয়হেতুর্মধ্যমস্তত্তনূজঃ॥[2]

তৎকালীন সময়ে জন্ম প্রমাণপত্রের প্রচলন ছিল না। তাই এরকম সমস্যা প্রায়শই দেখা যেত। প্রকৃত বয়সের সঙ্গে শৈক্ষণিক প্রমাণপত্রে উল্লিখিত বয়সের বৈসাদৃশ্য ঘটত। তবে কবির নিজস্ব বক্তব্য অনুসারে **১৯৪২** খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর, শনিবার কবির প্রকৃত জন্ম তারিখ বলে ধরে নেওয়াই সমীচীন হবে।

বামনাবতরণ মহাকাব্যে কবির বংশাবলী বর্ণনা[3] থেকে জানা যায় শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভোজরাজ মিশ্রের বংশে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের জন্ম। কবির পারিবারিক ইষ্টদেবতা দুর্গা। *বামনাবতরণে* কবি বলেছেন-

সুকৃতনিচযভূতং গৌতমাখ্যং সুগোত্রং

প্রবরৰহুলশাখা শুক্লমাধ্যন্দিনী সা।

অভবদমৃতনেত্রী চণ্ডমুণ্ডাদিহন্ত্রী

প্রভবনিধনমূলং বংশপূজ্যা নু তেষাম্॥[4]

কবির পিতা দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র ও মাতা অভিরাজী দেবী। দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের অপর দুই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মিশ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র। এদের মধ্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র মধ্যম। কবি জননী অভিরাজীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা বশত নিজের নামের সঙ্গে *অভিরাজ* উপনাম (*অভিতো রাজতে ইতি অভিরাজঃ*) ব্যবহার করেন। তাই কবি *অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র* নামে খ্যাত (মিশ্রোঽভিরাজরাজেন্দ্রঃ)। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

অভিরাজী নাম্নাসি জননী তস্মাদহমপ্যভিরাজঃ

ত্বমসি মদর্থং যমুনা-গংগা-ভরতধরাচলরাজঃ॥[5]

তাছাড়া মধ্যপ্রদেশের ইন্দৌর ও উত্তর প্রদেশের মীরাটে রাজেন্দ্র মিশ্র নামে অপর দু'জন কবি রয়েছেন। তাই কবি এঁদের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এই উপনাম ব্যবহার করেছেন।

২.২ শিক্ষা: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের শিক্ষা শুরু হয় পিতামহ পণ্ডিত রামানন্দ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে। পারিবারিক শিক্ষা পদ্ধতিতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর স্থানীয় দ্রোণীপুরের মাধ্যমিক স্তরীয় বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। পরিবারে সংস্কৃত চর্চার বাতাবরণ এবং আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের উপদেশে রাজেন্দ্র মিশ্র সংস্কৃত বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর (প্রথম শ্রেণী, প্রথম স্থান) উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে *'অন্যোক্তি-সাহিত্য কা উদ্ভব এবং বিকাস'* শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ্. ডি. (ডি. ফিল্) উপাধি লাভ করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন। এছাড়া ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্র মিশ্রকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি প্রদান করে।

২.৩ কর্মজীবন: রাজেন্দ্র মিশ্র পিএইচ্. ডি. উপাধি লাভ করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩

খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুন পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার (বিভাগীয় প্রধান) পদ অলংকৃত করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার উদয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রোফেসর পদে নিযুক্ত হন।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী হিমাচল প্রদেশের শিমলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর কবি সারস্বত সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এগুলি ছাড়াও রাজেন্দ্র মিশ্র *কেন্দ্রীয় সংস্কৃত পরিষদ, মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়, নিউ দিল্লী* (Human Resource Development Ministry), *বাদরায়ণ বেদব্যাস রাষ্ট্রপতি সম্মাননা সমিতি* প্রভৃতির সদস্য পদ অলংকৃত করেন।

২.৪ সারস্বত সাধনা: রাজেন্দ্র মিশ্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ধারার কাব্যরচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য (গীতিকাব্য, দূতকাব্য, স্তোত্রকাব্য), রূপক (নাটিকা, একাংক রূপক, নাটক), গদ্যকাব্য (কথা, আখ্যায়িকা, কথানিকা ইত্যাদি) প্রভৃতি কাব্যরচনার মাধ্যমে তিনি বিদ্বদ্ সমাজে বহুবার প্রশংসিত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি গবেষণাকার্যে এবং গবেষণার তত্ত্বাবধানেও ভাবয়িত্রী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের দৃশ্য-শ্রব্য কাব্যগুলিতে স্থান পেয়েছে স্বদেশ-প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি। তিনি একাধারে যেমন ভারতীয় সংস্কারের প্রশংসা করেছেন, ভৎর্সনা করেছেন স্বেচ্ছাচারিতার, অন্যদিকে আবার কুসংস্কারের নিন্দাও করেছেন। তাই তার কাব্যে পূর্ণযৌবনা বিধবা নারী সমাজ ও পরিবারের মতের তোয়াক্কা না করে প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে। তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে পণপ্রথা, সদ্যজাত পরিত্যাগ, মানুষের আর্থিক দুরবস্থা, বর্ণবৈষম্য, রাজনৈতিক দুর্দশা প্রভৃতি সমসাময়িক সমস্যাগুলি। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর বিভিন্ন গীতিকাব্যে ঋতুভেদে প্রকৃতিরাজ্যের বিবিধ পরিবর্তনের মনোগ্রাহী চিত্র এঁকেছেন। এছাড়াও স্বদেশ, বিবিধ দেব-দেবী এবং প্রণম্য ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি রচিত হয়েছে গীতিকাব্যগুলিতে।

রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর পদ্যকাব্যে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছন্দোগুলির পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাসাহিত্যে প্রযুক্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে গজল, কজরী, কব্বালী বা কাবালী, ঘনাক্ষরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত ব্যতীত তাঁর হিন্দী ও ভোজপুরী ভাষায় রচিত কাব্যের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র কৃত কাব্যগুলির যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

২.৪.১ মহাকাব্য: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের দুটি মহাকাব্য এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মহাকাব্যদুটি যথাক্রমে *জানকীজীবন* ও *বামনাবতরণ*। নিম্নে মহাকাব্যদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

২.৪.১.১ জানকীজীবন: একবিংশ সর্গাত্মক এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু বাল্মীকীয় *রামায়ণে* বর্ণিত রাম-সীতার পবিত্র কাহিনী। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। *জানকীজীবনের* সর্গভিত্তিক বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

প্রথম সর্গ (অবতার): ৫৫ শ্লোক। বিদেহ রাজ্যে অনাবৃষ্টি, জনকের ভূমিকর্ষণ, ভূগর্ভ থেকে সীতার আবির্ভাব, জনক কর্তৃক সীতাকে কন্যারূপে গ্রহণ, সীতার নামকরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গ (শিশুকেলি): ৫১ শ্লোক। সীতার বাল্যলীলা। সীতার রূপ-লাবণ্য, বাল্যক্রীড়া, উপযুক্ত পতি লাভের জন্য বিবিধ ব্রতোপাসনা, হরধনু পূজন এবং সীতার যৌবনে পদার্পণ।

তৃতীয় সর্গ (স্মরাংকুর): ৪৫ শ্লোক। এই সর্গে কৈশোরাবস্থা থেকে যৌবনে পরিবর্তিতা সীতার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের বাস্তবানুগ বর্ণনা রয়েছে।

চতুর্থ সর্গ (রাঘবানুরাগ): ৪৮ শ্লোক। অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের যৌবনে পদার্পণ, ঋষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস নিধনের মাধ্যমে তপোবনে যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ, দিব্যাস্ত্র লাভ, সীতা-স্বয়ম্বরের আমন্ত্রণ লাভ, জনশ্রুতি অনুসারে সীতার সৌন্দর্যে রামচন্দ্রের অনুরাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম সর্গ (রঘুরাজসঙ্গম): ৬৬ শ্লোকাত্মক এই সর্গের বিষয়বস্তু হল বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিথিলা প্রস্থান, মিথিলাবাসী কর্তৃক যথোপচারে অতিথি সৎকার, জনকের উপবনে বসন্তকালীন শোভা দর্শনে রামচন্দ্রের কামোদ্দীপনা, সীতা দর্শন।

ষষ্ঠ সর্গ (পূর্বরাগ): ৬৭ শ্লোকে পুষ্পোদ্যানে রাম-সীতার সাক্ষাৎ, সীতার নিকট রামচন্দ্রের হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ, লজ্জাবনতা সীতার প্রস্থান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম সর্গ (স্বয়ম্বর): ৯১ শ্লোক বিশিষ্ট এই সর্গে স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা, হরধনু ভঙ্গ প্রভৃতি থেকে শুরু করে রাম-সীতার পরিণয়ের পূর্ব পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে।

অষ্টম সর্গ (শ্বশুরালয়): ৮২ শ্লোকাত্মক এই সর্গে সপরিবারে দশরথের মিথিলা আগমন, রাম-সীতা ও দশরথের অপর তিন পুত্রের সঙ্গে জনকের তিন কন্যার বিবাহ সম্পাদন এবং অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বিন্যস্ত।

নবম সর্গ (বহ্বাচার): ১০৩ শ্লোক। অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, রাজ্যময় উৎসবানুষ্ঠান, সকলের প্রতি সীতার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

দশম সর্গ (বনবাস): ৮৯ শ্লোক। রামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি, মন্থরার কূট পরামর্শে কৈকেয়ীর ঈর্ষা, পূর্বে প্রাপ্ত ইচ্ছাবর অনুসারে দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যারোহণ প্রার্থনা।

একাদশ সর্গ (রাবণাপহার): ১১৮ শ্লোক। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের বনগমন, শূর্পনখা নিগ্রহ, রাবণ কর্তৃক সীতা-অপরহণ।

দ্বাদশ সর্গ (অশোকবনাশ্রয়): ৮৩ শ্লোক। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার অশোক বাটিকায় অবস্থানকালে সীতার দুর্দশা বর্ণিত রয়েছে এই সর্গে।

ত্রয়োদশ সর্গ (হনুমতপ্রাপ্তি): ৭৭ শ্লোক। রাম-লক্ষ্মণের সীতা-অন্বেষণ, জটায়ু প্রাপ্তি, সুগ্রীবের সঙ্গে সন্ধি, বালি বধ, হনুমানের লংকা গমন ও সীতাকে আশ্বাস প্রদান, লংকা দহন।

চতুর্দশ সর্গ (লংকাবিজয়): ৮৯ শ্লোক।

পঞ্চদশ সর্গ (অগ্নিপরীক্ষা): ৮৯ শ্লোক।

ষোড়শ সর্গ (রাজ্যাভিষেক): ৮২ শ্লোক।

সপ্তদশ সর্গ (জনাপবাদ): ৬৪ শ্লোক। জনৈক প্রজা কর্তৃক সীতার চারিত্রিক অপবাদ কথন, দুর্মুখ নামক গুপ্তচর কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট তার বিজ্ঞাপন, সমস্যা নিরসনের জন্য সভার আয়োজন।

অষ্টাদশ সর্গ (অপবাদ নির্ণয়): ১১৭ শ্লোক। প্রজাগণকে রাজসভায় আমন্ত্রণ, কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রজাগণকে নির্ভয়ে মতদানের আদেশ, উক্ত অপবাদের বক্তা জনৈক প্রজা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা, রামচন্দ্র কর্তৃক ক্ষমা দান ও তার যথাযথ সমাদর।

ঊনবিংশ সর্গ (লবকুশোদয়): ৭১ শ্লোক। লব-কুশের জন্ম, ঋষি বাল্মীকি কর্তৃক নামকরণ, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত বাল্মীকির আশ্রমে গমন।

বিংশ সর্গ (অশ্বমেধ): ৫৭ শ্লোক। রামের সুশাসন, অশ্বমেধের প্রস্তুতি, সীতার সহযোগিতা, বশিষ্ঠের অনুরোধে যজ্ঞানুষ্ঠানে বাল্মীকির শিষ্যগণের দ্বারা রামায়ণী সংগীতের প্রস্তুতি।

একবিংশ সর্গ (রামায়ণগান): ১৭০ শ্লোক। ঋষি বাল্মীকির অনুমতিক্রমে কুশীলবগণ দশরথের সুশাসন, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ থেকে শুরু করে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পর্যন্ত কাহিনী গানের আকারে পরিবেশন করেন।

জানকীজীবন মহাকাব্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বাল্মীকীয় *রামায়ণের* কাহিনীকে একটু ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য মহাকাব্যে জনাপবাদের কারণে সীতার দ্বিতীয় বার বনবাসে যাওয়ার ঘটনা নেই। এখানে দেখানো হয়েছে যে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে লব ও কুশের জন্ম হলে তাদের নামকরণের জন্য ঋষি বাল্মীকি অযোধ্যায় আসেন। লব ও কুশ বিদ্যালাভের জন্য বাল্মীকির আশ্রমে যান। জানকী পুত্রদ্বয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণতা বশত তাদের সঙ্গে বাল্মীকির আশ্রমে যান। রামের রাজসভায় ঋষি বশিষ্ঠের অনুরোধে বাল্মীকির শিষ্যগণ কুশীলবরূপে রামায়ণ গান করেন। এখানে দেখানো হয়েছে যে লব-কুশ অত্যধিক মেধার কারণে সম্পূর্ণ রামায়ণ গান কণ্ঠস্থ করেন, কিন্তু তারা রামায়ণ গান করেননি।

জানকীজীবন মহাকাব্যে শূদ্র তপস্বী শম্বূক হত্যার কাহিনী নেই। বস্তুত কবি এই নিন্দনীয় ঘটনাগুলি পরিহার করে রামচন্দ্রের চরিত্রকে কলুষতা মুক্ত করেছেন।

এই মহাকাব্যের মুখ্যরস শৃঙ্গার। এখানে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ- উভয় প্রকার শৃঙ্গাররস রয়েছে। এছাড়া হাস্য, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও অদ্ভূত রস গৌণরূপে রয়েছে। উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি (ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার সমন্বয়ে), বংশস্থবিল, দ্রুতবিলম্বিত, বসন্ততিলক প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছন্দোগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়া মৈথিলী, স্যন্দিকা প্রভৃতি

অপ্রচলিত সমবৃত্ত, বিয়োগিনী প্রভৃতি অর্ধসমবৃত্ত এবং মুক্তমাত্রিকা প্রভৃতি বিষমবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন।

২.৪.১.২ বামনাবতরণ:

বামনাবতরণ মহাকাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। এই মহাকাব্যে সর্বসমেত ১৭ টি সর্গ রয়েছে। ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে একটি অবতার হল বামনাবতার। দানবীর বলিরাজকে পরীক্ষার নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু বামনাবতার ধারণ করেন। বামন ও বলির এই পৌরাণিক কাহিনীকে উপজীব্য করে *বামনাবতরণ* মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে।

২.৪.২ খণ্ডকাব্য: রাজেন্দ্র মিশ্রে প্রকাশিত খণ্ডকাব্যের সংখ্যা শতাধিক। সমস্ত কাব্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সময় ও পরিসর সাপেক্ষ। তাই নিচে কিছু খণ্ডকাব্য সম্বন্ধে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

২.৪.২.১ আর্যান্যোক্তিশতক: সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যোক্তিমূলক মুক্তককাব্য রচনার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ভল্লট, গোবর্ধনাচার্য, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত, মহালিঙ্গ শাস্ত্রী, শ্রীনিবাস প্রমুখ কবিগণ অন্যোক্তিমূলক শতককাব্য রচনা করেছেন। এরকমই একটি শতককাব্য হল *আর্যান্যোক্তিশতক*। কাব্যটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটিতে সর্বসমেত ১০৭ টি শ্লোক রয়েছে এবং শ্লোকগুলি আটটি বর্গে বিন্যস্ত যথা- ১ থেকে ৫ নং শ্লোক পর্যন্ত বিবুধবর্গ, ৬ থেকে ২৩ নং শ্লোক পর্যন্ত মানববর্গ, ২৪ থেকে ৩৮ নং শ্লোক পর্যন্ত পশুবর্গ, ৩৯ থেকে ৪৯ নং শ্লোক পর্যন্ত বিহগবর্গ, ৫০ থেকে ৫৯ নং শ্লোক পর্যন্ত প্রাণিবর্গ, ৬০ থেকে ৮১ নং শ্লোক পর্যন্ত বিটপবর্গ, ৮২ থেকে ১০০ নং শ্লোক পর্যন্ত প্রকীর্ণবর্গ এবং ১০১ থেকে ১০৭ নং শ্লোক পর্যন্ত পরিচয়বর্গ। বিবুধবর্গ এবং মানববর্গেও কবি স্বীয় বংশবর্ণনা করেছেন।

কাব্যে শিব, গঙ্গা, রাধা-কৃষ্ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের স্তুতি ও তাদের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পশু-পক্ষী, কীটাদির চরিত্র উদ্ধৃত করে মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি রাজেন্দ্র মিশ্র। একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

তন্তুভিরবাপ্য কীটান্যত্ত্বং লূতে! নির্দযতযা হংসি।

ধিক্ত্বাং তস্মাদ্ ডাকিনি! বন্দ্যাসি তদপি গৃহোদ্যমেণ॥[6]

অর্থাৎ হে ডাকিনি মাকড়সা! তোমাকে ধিক্কার, কেননা তুমি যে জালে কীটসমূহকে নির্দয়ভাবে হত্যা করো, সেই জাল নির্মাণে সর্বদা ব্যাপৃত থাকো। এখানে 'বন্দ্যাসি' অংশে বক্রোক্তি রয়েছে। এর এক অর্থ দাঁড়ায়- মোহগ্রস্ত অর্থাৎ গৃহনির্মাণের মিথ্যা মোহে বন্দি, অপর অর্থ হয়- বন্দনীয়া অর্থাৎ অনলস পরিশ্রমের জন্য তুমি বন্দনীয়া।

২.৪.২.২ নবাষ্টকমালিকা: এটি একটি স্তোত্রকাব্য। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। *নবাষ্টকমালিকা* য় নয়টি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামের অষ্টকে বিভিন্ন দেব-দেবী তথা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাতঃস্মরণীয় কবিগণের স্তুতি করা হয়েছে। অষ্টক-ভিত্তিক বর্ণনীয় বিষয়গুলি হল-

মরন্দমাধুরীস্তবন: ১১ টি শ্লোকে বাগদেবী সরস্বতীর বন্দনা।

স্তনন্ধযক্রন্দন: ১২ টি শ্লোকে দুর্গার বন্দনা।

আশুতোষারাধন: শিবের স্তুতি।

সৃষ্টিমূলস্তবন: ১৩ টি শ্লোকে বিষ্ণুর স্তুতি।

পুরুষোত্তমপ্রীণন: ১২ টি শ্লোকে রামচন্দ্রের স্তুতি।

দুকূলচৌরচরিত: ১১ টি শ্লোকে কৃষ্ণের স্তুতি।

পিশাচমঞ্জন: ১২ টি শ্লোকে রামভক্ত হনুমানের স্তব।

মধুরাভিধান: ১১ টি শ্লোকে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, ভাস, বাণভট্ট, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, দণ্ডী, ভট্টি, ভর্তৃমেণ্ঠ, বিজ্জক, জগন্নাথ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত প্রমুখ কবিগণের স্তুতি রয়েছে।

মঙ্গলাযতনগীত: ১২ টি শ্লোকে গণেশের স্তুতি।

এই নয়টি অষ্টক ছাড়াও *আত্মনিবেদন* নামক একটি অষ্টক গ্রন্থটিতে পরিশিষ্টরূপে সংকলিত হয়েছে, যেখানে ৮ টি শ্লোকে কবি আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

২.৪.২.৩ পরাম্বাশতক: কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। ১০৪ টি শ্লোকে বিন্যস্ত *পরাম্বাশতকে* পার্বতীর স্তুতি রয়েছে। কবি সাংসারিক বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মা ভগবতীর চরণে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন-

ন যস্যাস্তি মাতা ত্বমেবাসি তস্য প্রভুর্নাপি যস্য ত্বমেবাসি তস্য।

ত্বমেবাসি সম্বন্ধভাগ্ জন্মভাজাং ত্বমেব ত্বমেব ত্বমেবাম্ব পাহি॥[7]

কবি পার্বতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন রূপের স্তুতি করেছেন। যথা- চন্দ্রঘন্টা, ছিন্নমস্তা, শিবা, মীনাক্ষী, জয়া, দুর্গা, চিত্তরূপা, ত্র্যম্বা, বারাহী, সর্বস্বরূপা, সর্বতোলক্ষ্মী, অপর্ণা, পাটলা, দক্ষকন্যা, ভবানী, ত্রিনেত্রা, গৌরী, নারায়ণী, শুভা, স্থানুজায়া ইত্যাদি।

আবার অন্যত্র কবি রাজেন্দ্র মিশ্র ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, দেবী যেন তাঁকে সাংসারিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি না দেন, তাহলে তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে দেবীর স্মরণ ত্যাগ করবেন।

রাজেন্দ্র মিশ্রের *পরাম্বাশতকে* ভর্তৃহরির *বৈরাগ্যশতকের* প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উভয় কাব্যেই দুঃখ-কষ্টময় সংসারের মোহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছায় ইষ্টদেবতার প্রতি আর্তি ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কবি ভর্তৃহরি সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে পর্বতের গুহায় মহাদেবের ধ্যানে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন, রাজেন্দ্র মিশ্র গার্হস্থ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি সংসারের মধ্যে থেকেই নিরাসক্তভাবে ভবানীর উপাসনা করতে চেয়েছেন।

২.৪.২.৪ শতাব্দীকাব্য: এটি একটি প্রশস্তিমূলক কাব্য। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ২৫৯ টি শ্লোকে বিন্যস্ত এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্তি।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজেন্দ্র মিশ্রের সম্পর্ক অনেক নিবিড়। কবি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর তথা পিএইচ্. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যাপনার কাজ করে গেছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কবির মনে অনেক স্মৃতি লুকিয়ে রয়েছে। এই সুখস্মৃতি সমূহকে উপজীব্য করে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ বিশিববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে *শতাব্দীকাব্য* শীর্ষক খণ্ডকাব্যটি রচনা করেন।

শতাব্দীকাব্য পাঁচটি সর্গে বিভক্ত- প্রস্তাবনা, সংস্থাপনা, সংগননা, গবেষণা এবং প্ররোচনা। প্রস্তাবনা অংশে ৩২ টি শ্লোকে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞানচর্চার গরিমায় এই প্রয়াগ বিভিন্ন পণ্ডিত-কবি তথা পৌরাণিক ঋষি ও রাজন্যবর্গের প্রিয় স্থান।

৩৭ টি শ্লোকাত্মক *সংস্থাপনা* অংশে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা, প্রথম স্নাতকোত্তর পরীক্ষার আয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি ও প্রভাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শবাণী চয়ণ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

৩৬ টি শ্লোকে বিন্যস্ত *সংগণনা* অংশের বিষয়বস্তু হল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যদের নাম ও তাঁদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা।

৫১ টি শ্লোকাত্মক *গবেষণা* অংশে প্রতিভাবান শিক্ষার্থী, কৃষি-কলা-বিজ্ঞান-বানিজ্য-আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিভাগ তথা ছাত্রাবাস ও সভাগৃহ নির্মাণ বিষয়ক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

১০৩ টি শ্লোকে *প্ররোচনা* অংশে পূর্বতন ও বর্তমান শিক্ষক তথা সহশিক্ষকদের মহনীয়তার দিক তুলে ধরা হয়েছে।

২.৪.২.৫ ধর্মানন্দচরিত: কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। বিখ্যাত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারক ধর্মানন্দের কাহিনী উপজীব্য করে এই খণ্ডকাব্যটি রচিত। রাজেন্দ্র মিশ্র একদা এক বন্ধুর অনুরোধে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পরমার্থ আশ্রমে যান। সেখানেই সন্ন্যাসী ধর্মানন্দের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে। সন্ন্যাসীর অনাড়ম্বর জীবন যাপন, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং আশ্রমের মনোরম পরিবেশ কবিকে মোহিত করে। অন্তরের সেই অনুভূতিগুলিকে কবি *ধর্মানন্দচরিত* গীতিকাব্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

কাব্যের শুরুতে কবি স্বীয় গুরু পরম্পরার বন্দনা করেছেন। এর পর ধর্মানন্দের বাল্যজীবন, মাতৃবিয়োগ, বাল্যাবস্থায় বৈরাগ্যের উদয়, জনৈক মহাত্মা কর্তৃক ধর্মানন্দের পরিপালন ও ব্রহ্মচর্যের শিক্ষাদান, আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সংকল্প, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অন্বেষণ, স্বামী শুকদেবানন্দের সান্নিধ্য লাভ, সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, ধর্ম প্রচার, হিমালয়ের পাদদেশে পরমার্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কাব্যিক বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য কাব্যে।

রাজেন্দ্র মিশ্রের ভক্তি-ভাবনায় এবং অসামান্য বর্ণন-কৌশলে *ধর্মানন্দচরিত* কাব্যটি সহৃদয় পাঠকের কাছে পরম উপাদেয়তা লাভ করেছে। ধর্মানন্দের পরিপোষক মহাত্মা যৌবনাবস্থায় ধর্মানন্দকে বিবাহের পরামর্শ দেন কিন্তু ধর্মানন্দ বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। কবি এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

কুমুদিন্যাং বিধুঃ সজ্জেজ্জ্যোত্স্নাং কো নু করিষ্যতি।

কমলিন্যাং রবিঃ সজ্জেদ্ ধর্মং কো নু বিধাস্যতি॥[৪]

অর্থাৎ চন্দ্র যদি কেবল কুমুদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়; তবে জ্যোৎস্না ছড়াবে কে? যদি সূর্য কমলিনীতেই আসক্ত থাকে; তবে রোদ ছড়াবে কে? শ্লোকের তাৎপর্য হল, বিবাহ, সংসারধর্ম পালনাদিতেই যদি সকল মানুষ নিয়োজিত থাকে, তবে বিশ্বের কল্যাণের জন্য সন্যাসত্বের পথে কে অগ্রসর হবে।

২.৪.২.৬ পঞ্চকুল্যা: এটি একটি শতক-সংগ্রহ। এখানে যথাক্রমে *বিমানযাত্রাশতক, বালীপ্রত্যভিজ্ঞানশতক, যবসাহিত্যশতক, দেববাণীহুংকারশতক* এবং *সংস্কৃতশতক* রয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি শতক কবির বালী-যাত্রার অভিজ্ঞতালব্ধ। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। নিম্নে শতকগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল-

২.৪.২.৬.১ বিমানযাত্রাশতক: ১০৩ টি শ্লোকে নিবদ্ধ এই শতকে কবির বিমান যোগে বালী যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণিত রয়েছে। বিমানের উত্তরণ, অবতরণ, আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থান থেকে প্রকৃতির আসামান্য নৈসর্গিক চিত্র দর্শন, উপরিভাগ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘপুঞ্জের সৌন্দর্য দর্শন, জাকার্তায় রাজদূতের দ্বারা অতিথি সৎকার, নৈশভোজ, 'গরুড়' নামক বিমানে ইন্দোনেশিয়া থেকে বালীদ্বীপে যাত্রা ইত্যাদি ঘটনা এবং কবির অনুভূতিগুলি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২.৪.২.৬.২ বালীপ্রত্যভিজ্ঞান: ১৫১ পদ্যাত্মক এই শতকে বালীদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। বালীদ্বীপীয় সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, ভারতীয় বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রভাব, স্থানীয় জনজীবনে সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা, কৃষিকাজ, অরণ্য ও সমুদ্র বেষ্টিত দ্বীপের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ইত্যাদির মনোরম বর্ণনা রয়েছে।

২.৪.২.৬.৩ যবসাহিত্যশতক: ১০২ টি শ্লোকে বিন্যস্ত এই শতকে যবসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক থেকে ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপনা, সপ্তম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের বীরত্ব, মহনীয়তা, যবসাহিত্যে ভারতীয় ধর্মভাবনা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, ২৭৭৮ শ্লোক বিশিষ্ট যবভাষায় রচিত রামায়ণ, ভৈমকাব্য, পুনুলুহ রচিত হরিবংশ, তনকুঙ্গ রচিত চক্রবাকদূত, লুব্ধককাব্য, গদ্যকাব্য, ভৈষজ্য শাস্ত্র ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে।

২.৪.২.৬.৪ দেববাণীহুংকারশতক: ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার দেশের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে প্রতিবাদ শুরু হয়। সে সময় কবি রাজেন্দ্র মিশ্র ইন্দোনেশিয়ায় ছিলেন। সেখানে থেকেই সরকার কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করেন এবং কাব্যাকারে এই সিদ্ধান্তের কুফল, সংস্কৃতের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে *দেববাণীহুংকারশতক* নামে কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

২.৪.২.৬.৫ সংস্কৃতশতক: ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র অনুষ্টুভ্ ছন্দে বিধৃত ১০৩ টি শ্লোকে সংস্কৃত ভাষার গুণগরিমা বিষয়ক *সংস্কৃতশতক* রচনা করেছেন। মাধুর্যে, কাব্যিক সুষমায়, মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধনে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে এই ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠক সমাজকে অবহিত করেছেন। কবির মতে জাহ্নবীর (গঙ্গার) মতো সংস্কৃতে পাবনী শক্তি রয়েছে, যার শ্রবন, পঠন ও মননে মানবের আন্তরিক কলুষতা দূরীভূত হয়।[9]

কাব্যের শুরুতেই সংস্কৃতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

মাতুঃ স্তন্যং বিনা ৰালো যথা নো পুষ্টিমর্হতি।
সমাজে ভারতীযোঽযমপুষ্টঃ সংস্কৃতং বিনা॥
শরীরং বিধিনা সৃষ্টং পঞ্চতত্ত্বসমুচ্চযৈঃ।
তথাপি ক্ব নু সংস্কারস্তদীযঃ সংস্কৃতং বিনা॥[10]

কবি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে সেপ্টেম্বর, বুধবার *সংস্কৃতশতক* কাব্যটির রচনাকার্য সম্পূর্ণ করেন।

২.৪.২.৭ করশূলনাথমাহাত্ম্য: প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। ১০৮ টি পদ্যে বিন্যস্ত এই কাব্যের বিষয়বস্তু হল করশূলনাথ বা শূলপাণি মহাদেবের মহিমা বর্ণন। *করশূলনাথমাহাত্ম্য* কাব্যটি শিব-পার্বতীর সংলাপের দ্বারা বিন্যস্ত। প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে শিব-নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, শক্তিপীঠের উৎপত্তি, পার্বতীর পুনর্জন্ম, মহিষাসুর বধ, হর-গৌরীর আদর্শ দাম্পত্য প্রেম ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে কবি মহাদেব ও পার্বতীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র কাব্যটির অনেক ক্ষেত্রে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবির মতে জৌনপুরের হরদোঈ (হরদ্রোহী) নামক স্থানে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল এবং সেইস্থানে সতী (সঈ) নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছেন। এই নদীর যে স্থানে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন; এখন সেই স্থানের নাম দানুপুর (দানবপুর)। ভয়ংকর যুদ্ধে পরিশ্রান্তা দেবী শিব-নির্মিত লতাকুঞ্জে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সে স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মহাদেব সেখানে স্বীয় লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন।

করশূলনাথমাহাত্ম্য ছাড়াও কবি *করশূলনাথাষ্টক* নামক একটি অষ্টক রচনা করেছেন; যা এই গীতিকাব্যের সঙ্গে সংকলিত হয়েছে।

২.৪.২.৮ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম: এই স্তোত্রকাব্যটি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের স্তোত্রগুলি ছয়টি বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে, যথা- দেবস্তুতি, মহাত্মাস্তুতি, বিদ্বৎস্তুতি, রাজস্তুতি, সৎপুরুষস্তুতি এবং প্রকীর্ণস্তুতি।

দেবস্তুতি: এই অংশে ১৪টি স্তোত্র রয়েছে, যথা- *মীনাক্ষীস্তবন, জ্বালাদেব্যাঃ স্তবন, জম্বুকেশ্বরস্তবন, করশূলনাথাষ্টক, জগন্নাথপ্রশস্তি, ভুবমাগতা ভাগীরথী, শিলাদুর্গমন্দির, নয়নেশ্বরীস্তবন, চিদম্বরস্তবন, করশূলনাথস্তোত্র, ইকারপঞ্চকস্তবন, গঙ্গা বিলসতি, কাবেরীবন্দন* এবং *জননীবন্দন*। এই স্তোত্রগুলি অষ্টক শ্রেণীর অন্তর্গত।

মহাত্মাস্তুতি: এখানে ১৯টি স্তোত্র রয়েছে। স্তোত্রগুলি হল- *সাঈনাথস্তব, শিরডীশ্বরাষ্টক, সত্যসঈসমর্চন, অরবিন্দো বিজয়তে, শ্রীমাতা পরা দেবতা, পরমাচার্যস্তবন, জয়েন্দ্রস্তবন, শুকদেবাষ্টক, কবিকুলগুরুস্তবন, ভবভূতিরেব মহীয়তে, ভোজরাজবিংশতিকা, কৃপাল্বমিশসন, আমোদকাননপঞ্চদশী, নিত্যানন্দাষ্টক, তং বন্দে নিগমবোধতীর্থম্, নীমকরোলীস্তুতি* ইত্যাদি।

বিদ্বত্স্তুতি: এই অংশে সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত বিদ্বান্ বর্গের স্তুতি সংকলিত হয়েছে। যেমন- *আদ্যাপ্রসাদাভিনন্দন, লক্ষ্মীকান্তাভিনন্দন, চণ্ডিকাপ্রসাদাভিনন্দন, প্রোফেসরশার্পেসপ্তক, গোপীনাথাভিনন্দন, পট্টাভিরামানুশংসন, ৰলদেবাষ্টক, বেংকটরাঘবাষ্টক, সত্যপ্রকাশাষ্টক, ভোলাশংকরব্যাসাষ্টক, শ্রীনিবাসশাস্ত্র্যভিনন্দন, মণ্ডনাষ্টক, ত্রিবিক্রমাভিনন্দন, শ্রীধরাষ্টক শশিধরাভিনন্দন কর্ণসিংহপ্রশস্তি, প্রভুদযালুপ্রশস্তি* ইত্যাদি।

রাজস্তুতি: এই অংশে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রশস্তি বিন্যস্ত হয়েছে, যথা- *গান্ধিগৌরব, গান্ধিস্-সোঽযম্, পরমপুরুষ, মালবীযসপ্তক, রাজেন্দ্রৰাবু জযতাদজেয, জবাহরপ্রশস্তি, সম্পূর্ণানন্দাষ্টক, ভি ভি গিরিপ্রশস্তি, প্রবালরত্নাষ্টক, বাজপেযিপ্রশস্তি, রাষ্ট্রপতিপ্রশস্তি* ইত্যাদি।

সত্পুরুষস্তুতি: এই অংশে *হরিশ্চন্দ্রপতিত্রিপাঠী, কৃষ্ণসরলো জযতাত্ কবীন্দ্র, জযতি রমা জযতাত্ কান্ত, জযতে হৃদযনারাযণ, হরিমোহনো জযতি, ক্ষেমরাজাভিনন্দন, জননীং বন্দে তাং সদভিখ্যা, জীবাচ্চিরায কমলেশকুমারিকাঽসৌ* ইত্যাদি শীর্ষক স্তুতি রয়েছে।

প্রকীর্ণস্তুতি: এখানে সর্বসমেত ২৫টি স্তুতি বিদ্যমান, যথা- *আচার্যনরেন্দ্রদেব, সুমিত্রানন্দনপন্ত, ডঃ চেন্না রেড্ডী, স্বামিবিদ্যানন্দ, ডঃ রামকুমারবর্মা, বিজযদেবনারাযণ* ইত্যাদি।

২.৪.২.৯ অরণ্যানী: এই খণ্ডকাব্যটি প্রকাশিত হয়েছে **১৯৯৯** খ্রিস্টাব্দে। **১৯৬২** খ্রিস্টাব্দ থেকে **১৯৯৯** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত রাজেন্দ্র মিশ্রের ৪৬ টি গীতিকবিতা ও কবিতা-সংগ্রহ *অরণ্যানীতে* সংকলিত হয়েছে।

সংকলনটির প্রথম কবিতা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য করে। কবিতাটির নাম *প্রযাগবিশ্ববিদ্যালয*। *আগতোঽযং বসন্ত, বসন্তাবতরণ, দ্বাদশমাসিক, শরদৃতুবৈভব, বর্ষাবৈভব, আষাঢো এষ দদৃষে* প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় ঋতুভেদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া *শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, বাণীবন্দনা, অরণ্যরোদন, কবিকুলগুরুগীত, শ্রীজগন্নাথপ্রশস্তি, প্রাযশ সর্বলোক, স জযেত প্রযাগ, সমস্যাপূর্তয, ত্বাদিচ্ছা, বিস্ময়সপ্তক, অর্মীনাৰাদেঽস্মিন্, গুর্জরেষু ত্রিযামা, প্রতীযতে কিন্তু নরো ন সিংহো, পুষ্কররাজস্তব, স্বাতন্ত্র্যতা, ন্যাযালযবৃত্ত, নিবেদনাষ্টক, দণ্ডদণ্ডকম্, বাগদেবীস্তব* (দণ্ডক), *পরাম্বাস্তব* (দণ্ডক) প্রভৃতি কবিতা ও কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে।

কবিতাগুলিতে আধ্যাত্মিক চেতনা, দেশভক্তি, জননেতৃবৃন্দের মহত্ব, ভারতের ঋতুবৈচিত্র্য, তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য, সংস্কৃত ভাষার মহনীয়তা, কবি-প্রশস্তি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

২.৪.২.১০ অভিরাজসহস্রক: *অভিরাজসহস্রক* একটি শতকসংগ্রহ। এই সংগ্রহে দশটি শতক রয়েছে। শতকগুলি যথাক্রমে- *গুর্জরশতক, পাকশাসনশতক, প্রবোধশতক, ধারামাণ্ডবীয়, হিমাচলশতক, ভারতী-পরিবেদনশতক* বা *রাজীবশ্রদ্ধাঞ্জলিশতক, কালিদাসমহোত্সবশতক, বৈশালীশতক, বিস্ময়শতক* এবং *সৌবস্তিকশতক*। শতকগুলির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

২.৪.২.১০.১ গুর্জরশতক: গুজরাত প্রদেশে ভ্রমণকালে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এই কাব্যটি রচনা করেছেন। কাব্যটির রচনাকার্য সমাপ্ত হয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুলাই। কবি জানিয়েছেন গুজরাতের প্রাচীন নাম ছিল আনর্ত। গুর্জর প্রদেশের প্রথম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শর্যাতিনন্দন আনর্ত। তাঁর নামানুসারে আনর্ত নাম হয়েছিল। গুজরাতের পৌরাণিক কাহিনী, রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির নির্মাণ, তুর্কিদের কুদৃষ্টি থেকে মন্দির রক্ষায় তাঁর প্রচেষ্টা, স্বাধীনোত্তর কালে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহযোগিতায় সর্দার বল্লভ ভাই পটেল কর্তৃক সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বারকা নগরীর পৌরাণিক তাৎপর্য, কৃষ্ণভক্ত সুদামার কাহিনী, পোরবন্দরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা, গুজরাতের লোকসংস্কৃতি, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তের প্রশস্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে এই শতকে।

২.৪.২.১০.২ পাকশাসনশতক: কাব্যটির বিষয়বস্তু হল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে মে থেকে ২৬শে জুলাই পর্যন্ত সংঘটিত ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ। ভারতীয় সেনার শৌর্য, বীর্য, মানবিকতা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে এই শতকে। কবি প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা, সেনাদের বীরত্ব, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ভারতের পক্ষ থেকে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। কাব্যটি রচিত হয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই।

২.৪.২.১০.৩ প্রবোধশতক: এই শতকে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র মহাকবি কালিদাস কৃত *মেঘদূতের* অন্তর্গত উত্তরমেঘে যক্ষের বিরহব্যাকুল অবস্থাকে স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে নবরূপে বর্ণনা

করেছেন। ধনাধিপতি কুবের কর্তৃক নির্বাসিত যক্ষ রামগিরির পাদদেশে আশ্রমের বৃক্ষমূলে বসে অন্তর্মুখী বিরহিনী যক্ষিনীকে প্রবোধ দানের উপায় অন্বেষণ করছে।

শৃঙ্গারমূলক (বিপ্রলম্ভ) এই শতকে প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাবরূপে পরিবেশিত হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের মহান সৃষ্টি *মেঘদূতের* অনুকরণে এই *প্রবোধশতক* রচিত হলেও কবি বিরহী যক্ষের অন্তরের অনুভূতিগুলিকে অভিনবরূপে ব্যক্ত করেছেন।

২.৪.২.১০.৪ ধারামাণ্ডবীয়: এই শতকে ধারানগরীর রাজা ভোজের কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। মালব প্রদেশের রাজন্যবর্গের বংশবর্ণন, তাদের বীরত্ব, রাজ্যবিস্তার, সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা, ভোজের শাসন, প্রজাবাৎসল্য, জ্ঞানগরিমা, দানশীলতা, বদান্যতা, কাব্যকৃতিসমূহ প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে *ধারামাণ্ডবীয়* শতকে।

রাজেন্দ্র মিশ্র এই শতকে ভোজের উপর দেবত্বের আরোপ করেছেন। কাব্যটির কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দচাতুর্যের প্রমাণ মেলে, যেমন শতকের প্রথমেই একটি শ্লোক-

ধত্বে যো বারিধারাং তমিহ সবিনযং মন্মহে ভোজমেঘং
ধত্বে যো বাহরিধারাং তমিহ সবিনযং মন্মহে ভোজভূপম্।
ধত্বেহযো বারিধারাং তমিহ সবিনযং মন্মহে ভোজখড্গাং
ধত্বে যো বা রিধারাং তমিহ সবিনযং মন্মহে ভোজদেশম্॥

কাব্যটি রচিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল।

২.৪.২.১০.৫ হিমাচলশতক: রাজেন্দ্র মিশ্র হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন যাবৎ (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত) অধ্যাপনা করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত এই হিমাচল প্রদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সর্বজন বিদিত। সেই সৌন্দর্যকে কবি বর্ণনা করেছেন *হিমাচলশতকে*। সর্বসমেত ১০৭ টি শ্লোকে বিন্যস্ত এই শতকে বুরাস, শিমলা, বালুগঞ্জ, মানালী বিবিধ রমণীয় পর্যটনস্থান তথা বিভিন্ন তীর্থস্থানের মনোগ্রাহী বর্ণনা রয়েছে। সমগ্র কাব্যটি ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি (ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার সমন্বয়ে) এবং অনুষ্টুভ্ ছন্দে বিধৃত হয়েছে। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র অনুষ্টুভ্ ছন্দে নিবদ্ধ অন্তিম তিনটি শ্লোকে *হিমাচলশতক* রচনার সময়কাল ও স্থান বিষয়ে বলেছেন-

মাসেঽভ্যধিকবৈশাখে শুক্লে পঞ্চদশে তিথৌ।

বৈক্রমেঽহিযুগব্যোমনেত্রাংকে রবিবাসরে॥

শ্যামলাসিদ্ধপীঠস্থে পুরে শ্রীমাল্যনামনি।

বিশ্ববিদ্যালযীযেঽস্মিন্নীরবেঽতিথিমন্দিরে॥

কাব্যমেতন্ময়া রাত্রৌ হিমাচলপ্ররোচনম্।

পূরিতং ননু নির্বিঘ্নং শারদামোদবর্ধনম্॥[11]

২.৪.২.১০.৬ ভারতীপরিবেদনশতক: ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আকস্মিক হত্যায় সারা দেশের মানুষের অন্তরের বিলাপ প্রকটিত হয়েছে *ভারতীপরিবেদনশতক* বা *রাজীবশ্রদ্ধাঞ্জলিকাব্যে*। এখানে রাজীব গান্ধীর গুণাবলি বর্ণনের পাশাপাশি মানুষের নৈতিক অধঃপতন, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও বর্তমান দুরবস্থা, যুবসমাজের অপরাধ-প্রবণতা, রাজনৈতিক নেতাদের ভ্রষ্টাচার, স্বার্থপরতা, রাজনীতির কুপ্রভাব, শিক্ষায় অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

কবি দুষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে তির্যগ ভাষায় ভৎর্সনা করেছেন। যেমন –

স এতি স চ বা নৈতি দূরে সঃ স নিজান্তিকে।

রাষ্ট্রং ব্যাপ্য সমাজঞ্চ সর্বত্রৈবাধিতিষ্ঠতি॥[12]

২.৪.২.১০.৭ কালিদাসমহোত্সবশতক: কালিদাস-মহোৎসব একটি সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক সম্মেলন। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে প্রতি বছর কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই শতকে কালিদাস-মহোৎসবের শুভ সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া উজ্জয়িনীর ঐতিহাসিক, ধার্মিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অবদান বিষয়েও বলা হয়েছে।

২.৪.২.১০.৮ বৈশালীশতক: বর্তমান বিহারে অবস্থিত একটি জেলা বৈশালী। এই বৈশালী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন বিশাল নামধেয় এক রাজা। বৈশালী নগরীর প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে এই শতকে। বৈশালীর আম্রবন, ধান্যক্ষেত্র, সবুজ বৃক্ষ ইত্যাদির প্রাকৃতিক চিত্র, রাজন্যবর্গের মহত্ব, ভগবান বুদ্ধের বৈশালী আগমন, ধর্মপ্রচার, সম্রাট অজাতশত্রু ও আম্রপালীর

ঐতিহাসিক প্রণয় কাহিনী, বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, বৎসরাজ প্রমুখ রাজাদের বীরগাথা, বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয় কাহিনী, বিক্রমশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে *বৈশালীশতকে*।

২.৪.২.১০.৯ বিস্ময়শতক: এই শতকে বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অধঃপতনের নগ্নচিত্র তুলে ধরেছেন কবি রাজেন্দ্র মিশ্র। যুবসমাজের স্বেচ্ছাচারিতা, উত্তরোত্তর অপরাধ বৃদ্ধি, নারীর অবমাননা, হিন্দুধর্মের অপমান, অধ্যাত্ম-বিমুখতা, মূর্তির অবমাননা, রাজনৈতিক কলুষতা, তোষণ-নীতি, উৎকোচ প্রভৃতি সমস্যাগুলি স্থান পেয়েছে *বিস্ময়শতকে*।

২.৪.২.১০.১০ সৌবস্তিকশতক: স্বস্তি বিষয়ক যা; তা'ই হল সৌবস্তিক (স্বস্তি তত্ করণে সাধুঃ। স্বস্তি+ঠক্)। রাজেন্দ্র মিশ্রের দিল্লী দেববাণী সংস্কৃত পরিষদের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণের অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষীয় ভাষণের কাব্যিক রূপ হল এই *সৌবস্তিকশতক*। পরিষদে অধ্যক্ষপদাসীন কালে প্রমুখ প্রতিভাবান কবি ও কাব্য-সমালোচকবর্গের সঙ্গে অতিবাহিত মুহূর্ত, সংস্কৃত প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অবদান ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে এই শতকে। সংস্কৃত-বিদ্বেষী ব্যক্তিদের প্রতি কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তির্যগ বাগভঙ্গিতে কবি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

দোগ্ধ্রী ধেনুরিব প্রাংশুর্বাঞ্ছা দোহা যশস্বিনী।
দেববাণী বহুক্ষীরা পামরৈঃ সমুপেক্ষ্যতে॥
নিত্যং ছাগ্যশ্চ সেব্যন্তে স্বল্পদুগ্ধাঃ প্রযত্নতঃ।
প্রদুহ্যন্তেঽথবা মেষ্যো মুষ্টিকাভিঃ স্তনে হতাঃ॥[13]

২.৪.৩ দৃশ্যকাব্য: রাজেন্দ্র মিশ্রের দৃশ্যকাব্যের মুখ্য বিষয় হল জীবন। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় যথা আশা-হতাশা, প্রেম-ঘৃণা, সামাজিক অবস্থান, আর্থিক বৈষম্য, স্বার্থপরতা প্রভৃতি চিত্রায়িত হয়েছে। কবি নাট্যরচয়িতার পাশাপাশি একজন নাট্যাভিনেতাও। *নাট্যসপ্তপদের মদীয়া নাট্যযাত্রা* শীর্ষক মুখবন্ধ অংশে কবি তাঁর নাট্যরচনায় আকস্মিক সূচনা বিষয়ে বলেছেন। তাঁর রচিত প্রথম নাট্যকাব্য (একাংক রূপক) হল *কবিসম্মেলন*। তাঁর রচিত দৃশ্যকাব্যগুলিকে নাটক,নাটিকা প্রভৃতি ভেদে আলোচনা করা হল।

২.৪.৩.১ নাটিকা: কবির রচিত নাটিকার সংখ্যা খুব বেশি নয়। নিচে দু-একটি নাটিকা সম্বন্ধে বলা হল।

২.৪.৩.১.১ প্রমদ্বরা: এটি একটি চার অংকের নাটিকা। নাটিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এর উৎস মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রুরু-প্রমদ্বরার প্রণয়কথা। ঋষিপুত্র রুরু আনর্ত রাজার কন্যা সুবর্ণাকে বিবাহ করেন। একদা ঋষিকন্যা প্রমদ্বরাকে দেখে রুরু তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন, অন্যদিকে প্রমদ্বরাও রুরুর প্রতি সমভাবে আসক্ত। অংকভিত্তিক কাহিনী বিন্যাস এইরকম-

প্রণয়রাগাঙ্কুর নামক প্রথম অংকে রুরু ও প্রমদ্বরার পারস্পরিক প্রণয়াসক্তি, বিভিন্ন উপায়ে বিদূষকের দ্বারা রাজার প্রমদ্বরার প্রতি আসক্তি বর্ধন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

রাগাঙ্কুরসংঘর্ষ নামক দ্বিতীয় অংকে বিদূষক ডুণ্ডুভক কর্তৃক প্রমদ্বরার চিত্রাংকন, চিত্র দেখে রাণী সুবর্ণার ক্রোধ ও রাজাকে তিরস্কার প্রভৃতি ঘটনা বিন্যস্ত রয়েছে।

প্রণয়াভিসার নামক তৃতীয় অংকে ডুণ্ডুভক ও প্রমদ্বরার সখী মদালসার সহায়তায় লতাকুঞ্জে রুরু-প্রমদ্বরার মিলন, রাজা কর্তৃক প্রমদ্বরাকে গান্ধর্ব বিবাহের প্রস্তাব দান, প্রমদ্বরার গান্ধর্ব বিবাহে অসম্মতি এবং রাজাকে প্রাজাপত্য বিবাহের পুনঃপ্রস্তাব, রাজার সম্মতি, আশ্রমে সর্প প্রবেশে উভয়ের মিলনে ব্যাঘাত, সর্প দংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্রণয়পোষণ নামক চতুর্থ বা অন্তিম অংকে প্রমদ্বরার মৃত্যুতে রুরুর বিলাপ, যমের নিকট প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করার অনুরোধ, রুরুর অর্ধেক আয়ুর বিনিময়ে প্রমদ্বরার পুনর্জীবন লাভ, প্রমদ্বরার প্রতি রাজার এইরূপ প্রেম দেখে অবশেষে সুবর্ণা প্রমদ্বরাকে সপত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

২.৪.৩.১.২ বিদ্যোত্তমা: চার অংকের এই নাটিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। লোককথা আশ্রিত এই নাটিকায় মহাকবি কালিদাসের কাহিনী অংকিত হয়েছে। দেবদত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, তাঁর কালিদাসে রূপান্তর, নায়িকা বিদ্যোত্তমার বৃত্তান্ত, মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের কাহিনী প্রভৃতি বিষয় অংকিত রয়েছে এই রূপকে। এখানে নাট্যকার রাজেন্দ্র মিশ্র অগ্নিমিত্রকে দেবদত্ত বা কালিদাসের বন্ধুরূপে দেখিয়েছেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই নাটিকাটির জন্য কবি রাজেন্দ্র মিশ্রকে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২.৪.৩.২ একাংক রূপক: রাজেন্দ্র মিশ্রের দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে একাংক রূপকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বিশেষ বিশেষ একাংক রূপকগুলি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

২.৪.৩.২.১ নাট্যপঞ্চগব্য: এই একাংক রূপক-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দে। এখানে ৫টি রূপক রয়েছে যথা- *কবিসম্মেলন, রাধামাধবীয়, ফন্টূসচরিত, নবরসপ্রহসন* এবং *কচাভিশাপ*।

কবিসম্মেলন: এই রূপকে প্রাচীন ও অর্বাচীন কবিগণের একটি সভার আয়োজন দেখানো হয়েছে যেখানে প্রত্যেক কবি তাঁর সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অশ্বঘোষ, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি, বাণভট্ট, জয়দেব, মাঘ, জগন্নাথ এবং কবি রাজেন্দ্র মিশ্র নিজেকেও এখানে নাট্যচরিত্র রূপে তুলে ধরেছেন।

রাধামাধবীয়: *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে* বর্ণিত কৃষ্ণলীলা আশ্রিত এই রূপকটি। কংসের নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের প্রাক্কালে শ্রীরাধা তথা সমগ্র নন্দগ্রামে বিষাদের চিত্রটি এখানে অংকিত হয়েছে। শ্রীরাধার বিলাপ, সখীগণ কর্তৃক রাধাকে প্রবোধ দান, রাধার মুর্ছা, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে তার মুর্ছা ভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা চিত্রণে কবি অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ফন্টূসচরিতভাণ: প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত এক যুবকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই রূপকটি রচিত। এটি ভাণ জাতীয় রূপক। ফন্টূসের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, যৌবনাবস্থায় প্রেমের প্রভাব প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে কবি ছাত্রজীবনের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখিয়েছেন।

নবরসপ্রহসন: এই প্রহসনধর্মী রূপকে মহারাজ বীরভদ্র ও শৃঙ্গারবল্লীর প্রণয়-কথা চিত্রায়িত হয়েছে। বীরভদ্র ও শৃঙ্গারবল্লী উভয়ই উভয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত। শৃঙ্গারবল্লীর পিতা রৌদ্রপাণির সঙ্গে বীরভদ্রের শত্রুতা রয়েছে। তাই তিনি বীরভদ্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে উভয় রাজার কুলগুরু শান্তদর্শনের উপদেশে বীরভদ্র ও শৃঙ্গারবল্লীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয় এবং উভয় রাজার শত্রুতা আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

কচাভিশাপ: গুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ও দৈত্য-কুলগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে এই একাংক রূপকটি রচিত হয়েছে। শুক্রাচার্যের সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে দেবগণ কর্তৃক মৃত দৈত্যরা পুনর্জীবিত হতো। দেবগণকে এই সংকট থেকে রক্ষার জন্য

বৃহস্পতি স্বীয় পুত্র কচকে ছদ্মবেশে শুক্রাচার্যের আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। কচ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেবযানী কচের প্রতি আসক্ত হন। একদা কচের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটিত হওয়ায় দেবযানী তার সঙ্গে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব রাখেন কিন্তু তিনি যেহেতু গুরুকন্যা তাই কচ তাকে ভগিনী বলে সম্বোধন করেন এবং তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উভয়ের বাদ-প্রতিবাদের অবসান হয় অভিশাপের মাধ্যমে। দেবযানী কচকে অভিশাপ দেন যে ছলনার আশ্রয়ে তার লব্ধ সঞ্জীবনী বিদ্যা বিফল হবে। অন্যদিকে কচও তাকে শাপ দেন যে তার বিবাহ অব্রাহ্মণের সঙ্গে হবে। এভাবে শাপ-প্রত্যভিশাপের মাধ্যমে রূপকের সমাপ্তি ঘটে।

২.৪.৩.২.২ অকিঞ্চনকাঞ্চন: এই একাংক রূপকটি কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। রূপকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এখানে নারী ও ধন-সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত এক রাজার কাহিনী উপনিবদ্ধ হয়েছে। একদা এক দিব্যপুরুষ রাজাকে বর প্রদান করেন যে, সে প্রাতকালে স্নানপূর্বক যে বস্তুতে হাত রাখবে সে বস্তুই স্বর্ণে পরিণত হবে। রাজার অত্যধিক লোভের ফল স্বরূপ সমগ্র রাজপ্রাসাদ, খাদ্যদ্রব্য তথা একমাত্র কন্যাও স্বর্ণপ্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। রূপকের অন্তিমে দেখা যায় বিদূষকের প্রচেষ্টায় রাজার বিপদুদ্ধার হয় এবং রাজার অর্থলিপ্সা দূরীভূত হয়।

২.৪.৩.২.৩ নাট্যপঞ্চামৃত: এই রূপক-সংগ্রহটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে ৫টি একাংক রূপক রয়েছে যথা- *দাস্যাপনোদন, অর্জুনোর্বশীয়, প্রীতিনির্যাতন, সমর্চিতমৃত্তিক* এবং *ছলিতাধমর্ণ*।

দাস্যাপনোদন: বিষ্ণুভক্ত গরুড়ের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই রূকপটি রচিত হয়েছে। স্বর্গস্থিত অমৃতকুম্ভের বিনিময়ে গরুড় তার মাতা বিনতাকে সপত্নীর দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। এই রূপকে মাতৃভক্তি ও মাতৃসম্মান রক্ষার্থে পুত্রের কর্তব্য কর্মের জয়গান করা হয়েছে।

অর্জুনোর্বশীয: এই একাংক রূপকটি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অর্জুন একদা নিবাতকবচ ও কালিকেয় নামক দৈত্যদ্বয়কে বধ করে স্বর্গের ঊর্বশীকে উদ্ধার করেন। ফলে অর্জুনের প্রতি ঊর্বশীর প্রেমভাব প্রকটিত হয়। অর্জুন যখন ইন্দ্রের রাজভবনের কক্ষে বিশ্রাম করছিলেন তখন ঊর্বশী তাঁর কাছে প্রণয় প্রার্থনা করেন কিন্তু অর্জুন তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিফল মনোরথ হয়ে ক্রোধান্বিতা ঊর্বশী অর্জুনকে একবর্ষ যাবৎ বৃহন্নলারূপে অতিবাহিত করার অভিশাপ দেন।

প্রীতিনির্যাতন: এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত একাংক রূপক। এখানে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও জৈনাবাদের অপরূপ রূপবতী নর্তকী জৈনাবাঈয়ের প্রণয়গাথা চিত্রায়িত হয়েছে। প্রেমে তন্ময়তা, আত্মোৎসর্গ, বিশ্বাসযোগ্যতা, পারস্পরিক আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি দিকগুলি তুলে ধরে নাট্যকার রাজেন্দ্র মিশ্র এক আদর্শ প্রেমকাহিনী উপহার দিয়েছেন।

সমর্চিতমৃত্তিক: এই একাংক রূপকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে শহীদ মেজর আশারাম ত্যাগীর সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। শহীদ আশারামকে ভারত সরকার পরবর্তীকালে *মহাবীর চক্র* সম্মাননা প্রদান করে।

ছলিতাধমর্ণ: এটি একটি সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত একাংক রূপক। এই রূপকে নাট্যকার বর্তমান সমাজে প্রচলিত পণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। রূপকের নায়ক আলোক একজন সচ্চরিত্র যুবক। সে পণপ্রথার বিরোধী। অন্যদিকে তার পিতা অর্থলিপ্সু। শিরোমণি পণ ব্যতীত পুত্রের বিবাহে সম্মতি দেবে না। শিরোমণি শারীরিক অসুস্থতার অভিনয় করে শেষ পর্যন্ত আলোককে পণের বিনিময়ে বিবাহ করতে বাধ্য করে।

২.৪.৩.২.৪ চতুষ্পথীয: এই একাংক রূপক-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। চতুষ্পথ শব্দের অর্থ চৌরাস্তা অর্থাৎ চারটি রাস্তার সঙ্গমস্থল। এখানে চতুষ্পথীয় বলতে চারটি একাংক রূপকের সংগ্রহকে বোঝানো হয়েছে। রূপকগুলি হল- *ইন্দ্রজাল, নির্গৃহঘট্ট, বৈধেযবিক্রম এবং মোদকং কেন ভক্ষিতম্*।

ইন্দ্রজাল: এই রূপকের নায়ক এক ঐন্দ্রজালিক। কবি ঐন্দ্রজালিকের বিভিন্ন জাদুবিদ্যার সহায়তা নিয়ে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন জীবিকার মানুষের নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এখানে কবি রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবি, ইঞ্জিনীয়র, তস্কর, দেহব্যবসায়ী প্রভৃতি মানুষের বাস্তব স্বরূপ অংকন করেছেন।

নির্গৃহঘট্ট: হাস্যরসাত্মক এই রূপকে বিবাহিত জীবনের অশান্তি অংকিত হয়েছে। রূপকটির নায়ক গিরীশ এক অফিসের লেখক বা টাইপিস্ট। তার স্ত্রী মঙ্গলা অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাবের। তাই স্ত্রী, সন্তান সত্ত্বেও সে অফিসের সহকর্মী কল্পনার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক করতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা। অফিসের কর্মকর্তারও দৃষ্টি রয়েছে কল্পনার প্রতি। তাই রূপকটির নাম নির্গৃহঘট্ট যার অর্থ হল না ঘরের, না বাইরের (ন ঘর কা ন ঘাট কা)। অবশ্য 'প্যার কিযা তো

ডরনা ক্যা' গানটি রেডিওতে শুনে গিরীশের মানসিক সাহস বেড়ে যায় এবং পূর্বনির্ধারিত সময়ে কল্পনার সঙ্গে দেখা করার জন্য মনস্থির করে।

বৈধেযবিক্রম: নাট্যকার রাজেন্দ্র মিশ্র এই একাংক রূপকে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী তুলে ধরেছেন। পরিবারের কর্তা অলস, কর্মবিমুখ। স্ত্রীর উপার্জনে কোনো ক্রমে দিনাতিপাত হয়, উপরন্তু সন্তানের আধিক্য। তা সত্বেও গৃহস্বামীর মিথ্যা পৌরুষ স্ত্রীকে ব্যথিত করে। অবশেষে স্ত্রীর ভৎর্সনায় তার অহংকার খর্ব হয়ে যায়। কবি এখানে আপাত হাসির অন্তরালে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন।

মোদকং কেন ভক্ষিতম্: এটি একটি আদ্যোপান্ত হাস্যরসের একাংক রূপক। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে কিভাবে জয়লাভ করা যায়; এখানে তারই একটি দৃষ্টান্ত নাট্যাকারে অংকিত হয়েছে।

২.৪.৩.২.৫ রূপরুদ্রীয: এই একাংক রূপক-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। রুদ্রের সংখ্যা একাদশ। এই সংগ্রহে একাদশ একাংক রূপক রয়েছে। কবি তাই এই সংগ্রহটির নাম দিয়েছেন *রূপরুদ্রীযম্*। নিচে রূপকগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

অভীষ্টমুপাযন: বর্তমান সমাজে প্রচলিত পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে এই একাংক রূপকটি রচিত। *নাট্যপঞ্চামৃতের* অন্তর্গত একাংক রূপক *ছলিতাধমর্ণের* কাহিনী বিন্যাসের সঙ্গে এই রূপকের অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। কবি রূপকদ্বয়ের নায়কের নামও অপরিবর্তিত রেখেছেন। *ছলিতাধমর্ণের* অলক বাধ্য হয়ে পণ গ্রহণ করে কিন্তু এই রূপকের অন্তিমে দেখানো হয়েছে কিভাবে মানবিক গুণাবলির কাছে পার্থিব সম্পদ পরাস্ত হয়ে যায়।

নাত্মানমবসাদযেত্: এই একাংক রূপকে দন্দশূক নামক এক চোরের কাহিনী অংকিত হয়েছে। ঘটনাক্রমে এক রাতে এক দরিদ্রের গৃহে চুরি করতে গিয়ে গৃহের দম্পতির কথোপকথন এবং তাদের করুণ অবস্থা দেখে তার ভাবান্তর ঘটে। সে তার চৌর্যলব্ধ সমস্ত সম্পদ দম্পতিকে দান করে এবং ভবিষ্যতে চুরি না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

স্বপ্নাজ্জাগরণং বরম্: রাজেন্দ্র মিশ্র এই রূপকটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে পাঠদানকারী অধ্যাপকদের যোগ্যতাহীনতা, নিয়োগে দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

পুনর্মেলন: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এই একাংক রূপকে ছাত্রজীবনে অপরাধ প্রবণতা ও তার কারণ, সংশোধনের উপায় প্রভৃতি দিকগুলি অসাধারণ কাহিনী বিন্যাস ও নাট্যধর্মিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

কন্থামাণিক্য: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সমাজে মানুষের মিথ্যা জাত্যাভিমানের বিরোধিতায় এই রূপকটি রচনা করেছেন। বস্তুত *রাঙ্গড়া* কথা-সংগ্রহের অন্তর্গত *কুলদীপক* নামক প্রথম কথায় বর্ণিত কাহিনীর নাট্যরূপ হল এই *কন্থামানিক্য*।

কুটুম্বরক্ষণ: ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই একাংক রূপকটি রচিত হয়েছে। এখানে হম্মীর দেব চৌহান বা হম্মীর দেব ও মহিমা শাহের চারিত্রিক গুণাবলি অংকিত হয়েছে।

রাজরাজৌদার্য: এই রূপকে চোলবংশীয় শ্রেষ্ঠ রাজা রাজরাজেশ্বরের মহনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

কো বিজযতে নৈব জ্ঞানম্: চোল এবং মালবদেশীয় দুই ব্যক্তির স্ব স্ব রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের হাস্যপূর্ণ কাহিনী রয়েছে এই রূপকে।

রক্তাভিষেক: এই একাংক রূপকটি খালিস্তানী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। পাঞ্জাবে শিখদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আন্দোলন, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার্থে ইন্দিরা গান্ধীর আত্মত্যাগ প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে রচিত এই রূপকে রাজেন্দ্র মিশ্র অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কাশ্যপাভিশাপ: *মহাভারতে* বর্ণিত দুষ্যন্তোপাখ্যান অবলম্বনে এই একাংক রূপকটি রচিত। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র কাহিনীকে একটু ভিন্নরূপে পরিবেশন করেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে, মহর্ষি কাশ্যপের তীর্থযাত্রা থেকে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলছিল। এমতাবস্থায় জনৈক শিকারী দীর্ঘাপাঙ্গ নামক আশ্রমের একটি হরিণ শাবককে হত্যা করে। ঋষি কাশ্যপ ক্রোধান্বিত হয়ে উদ্দিষ্ট শিকারীকে অভিশাপ দেন। পরে যখন জানতে পারেন যে সেই ব্যক্তি স্বয়ং রাজা দুষ্যন্ত তখন তিনি ব্যথিত হন। যজ্ঞ-আরাধনাদির দ্বারা শাপমোচনের দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যের সমাপ্তি ঘটে।

একং সদ্বিপ্রা ৰহুধা বদন্তি: এই একাংক রূপকটিও *মহাভারতের* কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লাভের ঘটনার নাট্যরূপ হল এই রূপক।

২.৪.৩.২.৬ নাট্যসপ্তপদ: এই রূপক-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ৭টি একাংক রূপক রয়েছে যথা- *পঞ্চ শী ন মী, বাণীঘটকমেলক, বধিরপ্রহসন, সাক্ষাত্কার, রূপমতী, দেহলীপরিবেদন* এবং *দ্বিসন্ধান*। বিবিধ কল্পিত কাহিনী তথা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই একাংকগুলি রচিত। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এই একাংক রূপক-সংগ্রহটির জন্য তৃতীয় বার (১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে) সাহিত্য একাদেমী সম্মাননায় ভূষিত হন।

২.৪.৩.২.৭ নাট্যনবগ্রহ: এই রূপক-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে সংকলিত একাংক রূপকগুলি হল- *ঈশ্বরান্বেষণ, গুরুদক্ষিণা, দাস্যমুক্তি, শ্বেতোদ্ধার, সত্যকামজাবাল, রত্নপ্রত্যভিজ্ঞান, নামকরণ, সিংহজম্বুকীয* এবং *গুণাঃ পূজাস্থানম্। ঈশ্বরান্বেষণ* রূপকে *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে* বর্ণিত হরিভক্ত ধ্রুবের কাহিনী রয়েছে। *মহাভারত* অবলম্বনে রচিত *গুরুদক্ষিণা* নামক একাংক রূপকে অর্জুন কর্তৃক পাঞ্চাল রাজ্য জয় করে দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দান করার ঘটনা উপনিবদ্ধ হয়েছে। *দাস্যমুক্তিতে মহাভারতে* বর্ণিত কদ্রু ও বিনতার কাহিনী রয়েছে। বস্তুত *নাট্যপঞ্চামৃত* একাংক রূপকসংগ্রহে সংকলিত *দাস্যাপনোদনের* কাহিনীই কবি দ্বিতীয়বার এখানে দেখিয়েছেন।

এই রূপকগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল এবং ছোট ছোট বাক্যে বিন্যস্ত। রূপকগুলি কিশোর মনের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। তবে জ্ঞানবৃদ্ধ পাঠক-প্রেক্ষকদের জন্যও রূপকগুলির আস্বাদযোগ্যতা রয়েছে।

২.৪.৩.২.৮ নাট্যনবরত্ন: এটি একটি একাংক রূপক সংগ্রহ। সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে যথাক্রমে- *মণ্ডূকপ্রহসন, প্রতিভাপরীক্ষণ, বাদনির্ণয়ন, ৰধিরপ্রহসন, সংবাদদাতৃসম্মেলন, প্রত্যক্ষরৌরব, স্বয়ংবরকেন্দ্র, ক্রীতানন্দ* এবং *শারদাবমানন* এই নয়টি একাংক রূপক রয়েছে। সংগ্রহটিতে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষণে ভ্রষ্টাচার, স্বজনপোষণ, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক অধঃপতন, সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের সাহসিকতা, বিচারালয়ের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।

২.৪.৩.২.৯ নাট্যনবার্ণব: এই রূপক সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ৯টি প্রহসনধর্মী একাংক রূপক রয়েছে যথা- *মুণ্ডিতমণ্ডপ্রহসন, খোংখীপ্রহসন, বিদ্যালযনিরীক্ষণপ্রহসন, কলিকৌতুকপ্রহসন, উপনেত্রপ্রহসন, বেতালপ্রহসন, দ্বিজচ্ছাগীযপ্রহসন,*

অদ্ভুতজ্যোতিষপ্রহসন এবং *মৃদঙ্গদাসপ্রহসন।* এই রূপকগুলি হাস্যরসাত্মক। ভাষা অত্যন্ত সরল, মাঝে মাঝে কিছু আঞ্চলিক শব্দ বা শব্দবন্ধের সংস্কৃতরূপ দেওয়া হয়েছে।

২.৪.৩.৩ নাটক: রাজেন্দ্র মিশ্র রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি নাটক হল লীলাভোজরাজ ও প্রশান্তরাঘব।

২.৪.৩.৩.১ লীলাভোজরাজ: এটি একটি পঞ্চাংক বিশিষ্ট নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০১১ খ্রিস্টাব্দে। নাটকের কাহিনী ইতিহাসনিষ্ঠ। মালবরাজ ভোজদেব ও ললিতার প্রণয় কাহিনীকে আশ্রয় করে এই নাটকটি রচিত। ভোজের প্রধানা মহিষী লীলাবতীর চারিত্রিক মাহাত্ম্য কীর্তন এই নাটকের মুখ্য বিষয়। তাই নাটকটির নাম *লীলাভোজরাজ*।

২.৪.৩.৩.২ প্রশান্তরাঘব: এটি একটি সপ্তাংক বিশিষ্ট নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। *রামায়ণে* বর্ণিত রামকাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এই নাটকে তাঁর রচিত *জানকীজীবন* মহাকাব্যের বস্তুগত অভিনবত্ব অক্ষুন্ন রেখেছেন।

২.৪.৪ আধুনিক গীতসংগ্রহ:

২.৪.৪.১ বাগ্বধূটী: সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এখানে সর্বসমেত ৫৫টি গীত রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত আঞ্চলিক লোকগীতির অনুকরণে গীতগুলি রচিত। গণচেতনা, জাতীয়তাবোধ, প্রণয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব, মাতৃভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক গীত *বাগ্বধূটীতে* স্থান পেয়েছে। অন্যান্য ভাষায় প্রসিদ্ধ সংগীত ও তালের অনুকরণও রয়েছে এই সংগ্রহের গীতগুলিতে, যেমন- উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় প্রচলিত চৈতা নামক সংগীতের অনুকরণে *চৈত্রক* নামক গীত রচিত হয়েছে। এছাড়া রাজেন্দ্র মিশ্র কহরবা নামক তালের নাম দিয়েছেন *স্কন্ধহারীয়,* ফার্সী ভাষায় প্রসিদ্ধ গজলের শৈলী অনুসারে সংস্কৃত গলজ্জলিকা রচনা করেছেন।

২.৪.৪.২ মৃদ্বীকা: প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। সংগ্রহে ৫৩টি গীত রয়েছে। গীতগুলি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত যথা- নমস্যা, রূপশ্রী, ঋতুশ্রী, জিজীবিষা, রাষ্ট্রশ্রী এবং প্রকীর্ণ খণ্ড। প্রতিটি খণ্ডে বিষয়ের অনুরূপ গীতগুলি বিন্যস্ত হয়েছে। কবি *নমস্যা* খণ্ডের প্রথম গানে সরস্বতীর স্তুতি এইভাবে করেছেন-

ত্বমসি জননী! শরণম্

ত্বমসি জীবিতম্

জীবিত লক্ষ্যম্

ত্বমসি মদুপকরণম্

ত্বৎকরকমলসুশোভিতমালামুক্তাফলতুলিতম্।

নিশ্চপ্রচমাযুষ্যদিনম্মে কাব্যকলা কলিতম্!

এই সংগ্রহের গীতগুলিতে হিন্দী কাব্যের দোহা, সোরাঠা, ধনাক্ষরী প্রভৃতি ছন্দো এবং উর্দূ কাব্যের কাবালী প্রভৃতি শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

২.৪.৪.৩ শ্রুতিম্ভরা: সংগ্রহটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবির রচিত গীতগুলি এই সংকলনে রয়েছে। এখানে সর্বসমেত ৩৭টি গীত রয়েছে। গীতগুলি আবার পাঁচ ভাগে বিন্যস্ত যথা- *সংস্কৃতধ্বনি* (৭টি গীত), *রাষ্ট্রধ্বনি* (৬টি গীত), *প্রবাসধ্বনি* (৬টি গীত), *নিসর্গধ্বনি* (৯টি গীত) এবং *আত্মধ্বনি* (৯টি গীত)। *সংস্কৃতধ্বনিতে* সংস্কৃত ভাষার মহত্ব ও মাধুর্য, *রাষ্ট্রধ্বনি* ও *প্রবাসধ্বনিতে* স্বদেশের প্রতি কবির ভক্তি ভাবনা ও স্বদেশের মহিমা, *নিসর্গধ্বনিতে* ঋতুভেদে প্রকৃতিরাজ্যের বিচিত্র রূপ এবং *আত্মধ্বনিতে* প্রেম ও সৌন্দর্য, সমাজের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। গীতগুলির গীতিধর্মিতা অসামান্য ও সার্থক।

২.৪.৪.৪ মধুপর্ণী: *মধুপর্ণী* ৬০টি সংগীতের সংকলন। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। গীতগুলি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত- *গলজ্জলিকা, গীতয* এবং *মুক্তকচ্ছন্দাংসি*।

খ্রিস্টিয় একাদশ শতক থেকে পশ্চিমী দেশগুলিতে ফার্সী ভাষায় গজল বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে উর্দূ ভাষাতেও গজল লিখনের প্রয়াস দেখা যায়। রাজেন্দ্র মিশ্র গজল লিখনের শৈলীকে অনুসরণ করে সংস্কৃত গজল বা গলজ্জলিকা রচনা করেন। কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের সংস্কৃত গজল বা গলজ্জলিকা এক অভিনব রূপ লাভ করে এবং নিঃসন্দেহে এটি সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। *মধুপর্ণীর গলজ্জলিকা* অংশে ২৮টি গলজ্জলিকা সংকলিত হয়েছে। ২৮টি গীতে বিন্যস্ত *গীতযঃ* অংশে স্বদেশপ্রেম, মানবিক সংবেদনশীলতা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৈভব প্রভৃতি বিষয়ক সংগীত রয়েছে। *মুক্তকচ্ছন্দাংসি* অংশে কতিপয় ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। এখানে রাণা প্রতাপ, বসন্তসেনা, রোহসেন, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট প্রমুখ চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক মুক্তক শ্লোকে কথিত হয়েছে। কবি

রাজেন্দ্র মিশ্র জগৎ ও জীবন বিষয়ে মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধনে কখনও ঐতিহাসিক চরিত্রকে কখনও বা প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করেছেন।

২.৪.৪.৫ অরণ্যানী: এই সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত কবির বিভিন্ন কবিতা *অরণ্যানী* নামক সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মালিনী, উপজাতি, দ্রুতবিলম্বিত প্রভৃতি সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ ছন্দে কবিতাগুলি রচিত হয়েছে।

২.৪.৪.৬ চর্চরী: সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ৭টি শীর্ষক খণ্ডে প্রায় এক হাজার পদ্য রয়েছে। শীর্ষকগুলি হল- *বাকচর্চা, দেবচর্চা, রাষ্ট্রচর্চা, আত্মচর্চা, জগচ্চর্চা, গুণচর্চা* এবং *তপশ্চর্চা*।

বাকচর্চায় বাগদেবীর স্তুতি রয়েছে। *দেবচর্চায়* সরস্বতী, কাশী বিশ্বনাথ, কালভৈরব প্রমুখ দেবতার স্তুতি রয়েছে। *রাষ্ট্রচর্চায়* ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য তথা মহাকাল-সম্বলিত কবিতা স্থান পেয়েছে। *আত্মচর্চায়* কবি-হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতি বর্ণিত। *গুণচর্চায়* প্রমুখ দেশপ্রমী ও সংস্কৃত কাব্য-সমালোচকগণের প্রশস্তি রচিত হয়েছে। *তপশ্চর্চা* অংশে কবির দীক্ষাগুরু স্বামী রামভদ্রাচার্য ও বিভিন্ন সিদ্ধ সাধকগণের প্রশস্তি রয়েছে।

২.৪.৪.৭ কৌমার: এই সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। *কৌমারম্* বস্তুত শিশুসাহিত্য। এখানে সর্বসমেত ৫২টি গীত রয়েছে। শিশুর অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা, গণিত, ভারতের বিভিন্ন নদ-নদী, তীর্থস্থান, গ্রামীণ পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ক সরল ও মনোহারী গীত রয়েছে এই সংকলনটিতে।

২.৪.৪.৮ কনীনিকা: *কনীনিকা* একটি গলজ্জলিকা সংগ্রহ। এটি প্রকাশিত হয় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে। এখানে কিছু নতুন গলজ্জলিকার সঙ্গে সঙ্গে *বাগ্বধূটী, মৃদ্বীকা, শ্রুতিম্ভরা* এবং *মধুপর্ণীতে* সংকলিত যথাক্রমে ৭, ১৩, ১২ এবং ২১টি গলজ্জলিকা স্থান পেয়েছে। কবি বস্তুত গলজ্জলিকাগুলিকে স্বতন্ত্ররূপে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই সংকলনটি প্রকাশ করেছেন।

২.৪.৪.৯ মত্তবারণী: *মত্তবারণী* ৭২টি গলজ্জলিকার সংকলন। সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে পর্যন্ত সময়কালে রচিত কবির ৬৪টি গলজ্জলিকা সংকলিত হয়েছে।

মদ্যপান, নারীর প্রতি আসক্তি, শরীরসর্বস্ব প্রেম প্রভৃতি হল গজলের মুখ্য বিষয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এই সকল বিষয় থেকে অনেক দূরে এক অভিনবরূপে সংস্কৃত গলজ্জলিকা রচনা করেছেন। রাজেন্দ্র মিশ্রের গলজ্জলিকায় স্থান পেয়েছে আধ্যাত্মবাদ, মানবিক মূল্যবোধ, আত্মসমালোচনা, স্বদেশপ্রেম, সমসাময়িক সমস্যা প্রভৃতি। *বৎসলা গঙ্গা, অধরোত্তরং সহিষ্যে, কার্গিলম্, তদেব দিনং দিনম্, কথমদ্য বিস্মরেযম্* ইত্যাদি শীর্ষক গলজ্জলিকাগুলি এ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ্য।

২.৪.৪.১০ শালভঞ্জিকা: এই সংগ্রহে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুন পর্যন্ত রচিত কবির ৬৮টি গলজ্জলিকা সংকলিত হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। *কুত্র বার্ধক্যে বসেযম্, ন মাং সহন্তে, সোঽহম্, নেদমাবশ্যকম্, কিং মহত্বং হাযনানাম্, তেষাং সূর্যোদযেঽদ্য হস্তে কীদৃশং সৌহৃদম্* ইত্যাদি শীর্ষক গলজ্জলিকাগুলি পাঠকদের প্রশংসা লাভ করেছে।

২.৪.৪.১১ হবির্ধানী: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের চতুর্থ গলজ্জলিকা সংকলন হল *হবির্ধানী*। 'হবির্ধানী' শব্দটিকে কবি যজ্ঞবেদী বা যজ্ঞকুণ্ড অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কবি এর নির্বচন করেছেন- *হবীংষি ধীযন্তেঽস্যামিতি হবির্ধানী*। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত কবির গলজ্জলিকাগুলি স্থান পেয়েছে।

২.৪.৫ কথাকাব্য:

২.৪.৫.১ ইক্ষুগন্ধা: এটি একটি কথা সংগ্রহ। সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে আটটি কথা রয়েছে যথা- *জিজীবিষা, সুখশযিতপ্রচ্ছিকা, অনামিকা, একাহাযনী, শতপর্বিকা, ইক্ষুগন্ধা, ভগ্নপঞ্জর এবং তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী*।

জিজীবিষা নামক কথায় এক পিতৃহীনা কিশোরীর কাহিনী রয়েছে। কিশোরীর যৌবনাবস্থা, পারিবারিক দায়িত্ব, অভাব-অনটন, অর্থোপার্জনের জন্য দেহবিক্রয়, লোকাপবাদ উপেক্ষা করে জনৈক যুবক কর্তৃক তার পাণিগ্রহণ ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত রয়েছে এই কথায়।

সুখশযিতপ্রচ্ছিকা নামক কথায় এক শিক্ষিত যুবকের চাকরির অন্বেষণ এবং দৈবক্রমে বিবাহের ঘটনা রয়েছে।

অনামিকায় সামাজিক অপবাদের ভয়ে এক অবিবাহিত মা কর্তৃক নবজাতিকা কন্যাকে পরিত্যাগের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

একাহাযনীতে এক অনভিপ্রেত ব্যক্তির সঙ্গে জনৈকা যুবতীর বিবাহ, সন্তানোৎপত্তি, সন্তানের প্রতি তার ঔদাসীন্য, সন্তানের ক্রমাগত ক্রন্দনে মায়ের বাৎসল্য প্রেমের উদ্রেক প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

শতপর্বিকা নামক কথায় জনৈক ব্যক্তি পুত্র লাভের ইচ্ছায় সাত কন্যার জন্ম দেয়। সে পরে শ্যালিকার এক পুত্রকে দত্তক নেয়। কিন্তু সে পুত্র যৌবনাবস্থায় ব্যসনী প্রতিপন্ন হয়। পুত্রের স্বেচ্ছাচারী স্বভাব দেখে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পুত্রমোহ দূরীভূত হয়। অবশেষে সে স্বীয় কন্যাদেরকেই বাৎসল্য প্রেমে ভরিয়ে দেয়।

ইক্ষুগন্ধা নামক কথায় এক বিচিত্র প্রেমকাহিনী রয়েছে। বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক প্রেমভাব যৌবনে শিথিল হয়ে যায়। উভয়ের অন্যত্র বিবাহ হয়। জীবনের বার্ধক্যে এসে আবার তাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব জাগরিত হয়। কবি প্রণয়ী যুগলের সন্তানদের মধ্যে বিবাহ দিয়ে পরোক্ষে উভয়ের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

ভগ্নপঞ্জরে এক যুবতী বিধবার দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে। কন্যার বিদ্রোহমূলক আচরণ ও মাতৃত্বের কামনাকে অবদমিত করার জন্য তার পিতা সর্বদা সচেষ্ট। এক রাতে পরিবার ও সমাজের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যুবতী তার অভিপ্রেত যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত কথাকাব্য। দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজা এক পিতৃহীনা কন্যাকে তার তাম্বুল-সেবিকারূপে অন্তঃপুরে স্থান দেন। পরবর্তীকালে রাজা তার প্রতি প্রণয়াবিষ্ট হন এবং বিবাহ করেন। তার প্রতি অধিক প্রীতি বশত রাজা তারই পুত্রকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ফলে প্রধানা মহিষীর পুত্র ক্রুদ্ধ হন। একদা তিনি পাণ্ড্যরাজকে হত্যা করেন।

সমগ্র কথা-সংগ্রহে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত রীতি-নীতিগুলির বিরোধিতা করেছেন। তিনি সামাজিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কবি প্রচলিত মিথ্যা আদর্শের ঊর্ধে গিয়ে জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে *ইক্ষুগন্ধা* কথাসংগ্রহটি সাহিত্য অকাদেমি সম্মাননায় ভূষিত হয়।

২.৪.৫.২ রাঙ্গডা: এই কথাসংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। *রাঙ্গডায়* সংকলিত কথাগুলির মাধ্যমে কবি সামাজিক অসংগতি, বিড়ম্বনা প্রভৃতির মূলে আঘাত করেছেন। এখানে মোট নয়টি কথা রয়েছে।

'রাঙ্গডা' কথার অর্থ হল বিধবা। এই কথাকাব্যে বালীর রাজা উদয়ের পত্নী মহেন্দ্রদত্তার জীবনের করুণ কাহিনী অংকিত হয়েছে। কবি বালীদ্বীপে অবস্থানকালে এই কথাকাব্যটি রচনা করেছেন।

কুলতিলক শীর্ষক কথায় কবি ব্যক্তির উচ্চ বংশজনিত মিথ্যা গর্বের উপরে আঘাত করেছেন। জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রের এক বন্ধুকে নীচ দৃষ্টিতে দেখে। একদা সেই নীচ বংশজাত বন্ধুই যখন তার পুত্রকে বাস-দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে নিরাপদে বাড়িতে পৌছে দেয়, তখন তার মিথ্যা বংশগৌরব দূরীভূত হয়।

অধমর্ণ শীর্ষক কথাটির উৎস মহাভারতের আদিপর্ব। এখানে হস্তিনাপুরাধিপতি শান্তনুর পশ্চাত্তাপ, পুত্র-সংসারাদি ত্যাগ করে তপশ্চর্যার কাহিনী উপনিবদ্ধ হয়েছে।

কুক্কী নামক কথার চরিত্রগুলি মার্জার। এক মার্জারের কাম-তৃষ্ণা ও তার পরিণতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র মানুষের কামান্ধতার নিন্দা করেছেন। সন্তানকে সর্বতোভাবে রক্ষার জন্য জননীর আত্মত্যাগের চিত্রও ফুটে উঠেছে এই কথাকাব্যে।

চঞ্চা শীর্ষক কথানিকা নায়িকাপ্রধান কাব্য। এখানে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নিরঞ্জন বাবুর সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিভূ মুন্নীবাঈয়ের আইনি লড়াইয়ের কাহিনী অংকিত হয়েছে। কবি এখানে মানুষের সভ্য মুখের অন্তরালে ধূর্ততা, লাম্পট্য, কপটতা, ব্যভিচার পরায়ণতা, হিংস্রতা প্রভৃতি চেহারা তুলে ধরেছেন।

পোতবিহগৌ শীর্ষক কথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নিহাল পাণ্ডে ও মহুলীর প্রণয়-কাহিনী অংকিত হয়েছে।

মহানগরী নামক কথাকাব্যে রেলযাত্রা সম্বন্ধীয় কাহিনী রয়েছে। এই কথার কথানক স্বীয় রেলযাত্রার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সহযাত্রীদের সমক্ষে উপস্থান করেছে।

২.৪.৫.৩ চিত্রপর্ণী: এই কথাসংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। এখানে সাতটি কথা সংকলিত রয়েছে। সামাজিক জীবনের কর্তব্য, মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্প্রীতি, মুখোশের আড়ালে দুশ্চরিত্রের প্রকৃত অবয়ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কথা রয়েছে এই সংগ্রহে।

২.৪.৫.৪ কান্তারকথা: কাব্যটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। রাজেন্দ্র মিশ্র The jungle Book এর অর্থ করেছেন কান্তারকথা। কাব্যটি রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে কবি কথামুখে জানিয়েছেন- কবি এক সময়ে ডিসকভারী, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট্, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি প্রভৃতি

টিভি-চ্যানেলগুলি নিয়মিত দেখতেন। এ থেকেই কবি কান্তারকথা রচনার সংকল্প করেন। গ্রামের অদূরবর্তী জঙ্গলকে উপজীব্য করে কবি বাস্তব ও কল্পনার স্পর্শে কাব্যটি রচনা করেছেন। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিবিধ পশুর শারীরিক গঠন ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের নবীন নবীন নামকরণ করেছেন, যেমন সিংহ = দুর্গম, বাঘ = বজ্রাঙ্গ, চিতা = ক্ষুদ্রাস্য, হস্তি = মহাবল, গিরিবল, গৃধ্র = সুদৃষ্টি, কাক = বজ্রচঞ্চু প্রভৃতি। জঙ্গলে পশুদের খাদ্যাভ্যাস, জীবন যাপন প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে।

২.৪.৫.৫ পুনর্নবা: প্রথম প্রকাশ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে সর্বসমেত এগারোটি কথানিকা রয়েছে যথা- *সংকল্প, সপত্নী, বাগদত্তা, নর্তকী, ন্যাযমহং করিষ্যে, ধ্রুবস্বামিনী, বন্ধ্যা, ন্যাসরক্ষা, মরুন্যগ্রোধ, পুনর্নবা, অনাখ্যাতা* এবং *বাণভট্টাহত্মকথা*।

২.৪.৫.৬ অভিনবপঞ্চতন্ত্র: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত *পঞ্চতন্ত্রের* অনুরূপে *অভিনবপঞ্চতন্ত্র* রচনা করেছেন। *অভিনবপঞ্চতন্ত্রের* বিষয়ানুক্রমও *পঞ্চতন্ত্রের* মতোই। এখানে যথাক্রমে মিত্রসম্প্রাপ্তি, মিত্রভেদ, কাকোলূকীয, লব্ধপ্রনাশ এবং অপরিক্ষীতকারক রয়েছে। কাব্যটি অংশাকারে *পারিজাত* নামক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের বক্তা কবি নিজেই। কাব্যে গদ্যভাগের মধ্যে যে সকল পদ্য রয়েছে; সেগুলিও কবির নিজস্ব রচনা। সম্পূর্ণ কাব্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে।

২.৪.৬ সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ:

২.৪.৬.১ ***অভিরাজযশোভূষণ:*** এটি একটি কাব্যশাস্ত্র। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থে ৫৬৭ টি কারিকা, বিবিধ উদাহরণ বিষয়ক ১৮৫ টি শ্লোক রয়েছে, যেগুলির মধ্যে প্রায় ১০০ টির অধিক শ্লোক কবির নিজস্ব রচনা। তাছাড়া কবির নিজস্ব বৃত্তিও রয়েছে এই গ্রন্থে। পাঁচটি উন্মেষে কাব্যশাস্ত্রটি বিন্যস্ত। *পরিচয়োন্মেষে* কাব্যের প্রশংসা, প্রয়োজন, হেতু, লক্ষণ এবং বিভিন্ন বিভাজন আলোচিত। *শরীরতত্ত্বোন্মেষ* এ শব্দার্থসম্বন্ধ, শব্দশক্তিপ্রকরণ, রীতিবৃত্তিপ্রকরণ, গুণালংকারপ্রকরণ ইত্যাদি আলোচিত। *আত্মতত্ত্বোন্মেষে* কাব্যের আত্মা বিষয়ে কবির নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *নির্মিতিতত্ত্বোন্মেষে* কাব্যের আধুনিক বিভাগ এবং মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটিকা প্রভৃতির আধুনিক কালোপযোগী লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে। *প্রকীর্ণতত্ত্বোন্মেষে* গীতিতত্ত্ব, গলজ্জলিকা (গজল), ছন্দ, মুক্তককাব্য বিষয়ে কবির মৌলিক চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে।

২.৪.৬.২ শাস্ত্রালোচন: এটি একটি গবেষণা-প্রবন্ধের সংগ্রহ। এখানে মোট ১৭টি প্রবন্ধ সংকলিত রয়েছে। সংকলনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

২.৪.৬.৩ সমীক্ষাসৌরভ: এই গ্রন্থটিতে ২৫টি গবেষণা-প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সংকলনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে।

২.৪.৬.৪ বালীদ্বীপে ভারতীয় সংস্কৃতি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। বালীর ধর্মভাবনা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষর রয়েছে। এই বিষয়ের উপরে আলোচ্য গবেষণা-গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও ইংরেজী ভাষায় *Poetry and Poetics* এবং হিন্দী ভাষায় *সংস্কৃত সাহিত্য মে অন্যোক্তি* গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

উপরে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের আরও অনেকগুলি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্য ও সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে হিন্দী ও ভোজপুরী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধারার কাব্য, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি।

কবির বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র, পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্র, পিতামহ রামানন্দ মিশ্র এবং তৎপূর্ববর্তী বংশজগণ সংস্কৃতের স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন। ফলে মিশ্র পরিবারে সর্বদাই সংস্কৃত শিক্ষার অনুকূল বাতাবরণ ছিল। এই পরিবেশ কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের প্রতিভার স্ফুরণে সহায়ক হয়েছিল। *অভিরাজসপ্তশতীর* বিষয়সূচীর পূর্বে একইরকম শ্লোক পাওয়া যায়-

মূলং শ্রীকবিকালিদাসকবিতা শ্রীহর্ষবাণী তনুঃ
পত্রং শ্রীজযদেবদেববচনং শ্রীবিলহনোক্তং সুমম্।
শ্রীমৎপণ্ডিতরাজকাব্যগরিমা যস্য প্রপূতং ফলং
জীব্যাদ্ধন্ত নিসর্গজো২যমভিরাড্ রাজেন্দ্রকাব্যদ্রুমঃ॥

রাজেন্দ্র মিশ্রের এই কাব্যমহীরুহের মূল হল মহাকবি কালিদাস কবিতা, শ্রীহর্ষের বাণী হল কাণ্ড, পত্র জয়দেবের কাব্য, বিলহনের কাব্য এর পুষ্প এবং এর ফল পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কাব্য গরিমা।

কবির বক্তব্য থেকে প্রতীত হয় যে, তিনি নিজেকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাতঃস্মরণীয় কবিগণের সার্থক উত্তরসূরীরূপে ঘোষণা করেছেন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের কাব্যের ভাষা সহজবোধ্য। ভারবি, মাঘ প্রভৃতি প্রাচীন তথা অনেক অর্বাচীন কবির কাব্যে প্রায়শই শব্দপ্রয়োগের চাতুর্য দেখা যায়। কিন্তু রাজেন্দ্র মিশ্র এই কৃত্রিমতা থেকে প্রায়শই নিজেকে দূরে রেখেছেন।

একজন কবিকে সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। কারণ কাব্যে সমকালের কথা থাকবে। সমাজ সম্পর্কে সচেতন কবি তাঁর কাব্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে মানুষকে সঠিক পথানুসরণের পরামর্শ দেন। এই কাব্যগুলিই ভবিষ্যতে এই সময়ের দলিল হয়ে থাকবে। রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর কাব্যে বর্তমান সময়ের ধর্মভাবনা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন।

কবির গীতি-সংগ্রহগুলি বিষয়বস্তু ও অলংকরণের দিক থেকে অভিনবত্বের দাবী রাখে। তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত গানগুলির অনুকরণে সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছেন। তিনি গজলের নাম দিয়েছেন গলজ্জলিকা।

অন্ত্যটীকা

---

১. দেহলীপরিবেদন (নাট্যসপ্তপদম্), পৃষ্ঠা ১০৭

২. বামনাবতরণ ১. ৩৮

৩. তদেব, ১. ২১-৪০

৪. তদেব, ১. ২২

৫. নাট্যপঞ্চগব্য (কবিসম্মেলনম্) পৃষ্ঠা ২৬

৬. আর্যান্যোক্তিশতক ৫২ (প্রাণিবর্গ)

৭. পরাম্বাশতক ৩৭

৮. ধর্মানন্দচরিত ৩৯

৯. উভযং মোক্ষদং লোকে দর্শনস্নানপানকৈঃ।
জাহ্নবীসলিলং পূতং সংস্কৃতঞ্চ সুরোদিতম্॥ সংস্কৃতশতক, নান্দীবাক্

১০. তদেব, ২-৩

১১. হিমাচলশতক ১০৫-১০৭

১২. ভারতীপরিবেদনশতক ৭০

১৩. সৌবস্তিকশতক ৫২-৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু

অভিরাজসপ্তশতীতে ছয়টি শতককাব্য ও একটি দণ্ডক রয়েছে। শতকগুলি হল *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক, ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতক*। *নব্যভারতশতকে* ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদ দেশপ্রেমীগণ, ভারতের বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। *মাতৃশতকে* কবি স্বীয় মাতা অভিরাজী দেবী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ঋষিপত্নী, রাজমহিষী, পঞ্চসতী, প্রকৃতির বিবিধ শক্তি প্রভৃতির বন্দনা করেছেন। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* কবি বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতি পূর্বক সুপ্রভাত প্রার্থনা করেছেন। *সুভাষিতোদ্ধারশতকে* প্রাচীন সূক্তিগুলিকে কবি নতুন ভাবে লিখেছেন। এখানে কবির বক্তব্য কখনও হাস্যরসপূর্ণ, কখনও আবার শ্লেষমূলক। *চতুর্থীশতকে* মানুষের নীচতা, কপটতা, ছল, ভয়, লোভ, মোহ, সনাতন মেষবৃত্তি প্রভৃতির নিন্দা করা হয়েছে। *ভারতদণ্ডকে* ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, ঋতুবৈচিত্র্য, অন্ন-বস্ত্র-ধর্মীয় বৈচিত্র্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। *সম্বোধনশতকে* কবি বিভিন্ন পশু, পক্ষি, বৃক্ষ, পর্বত, তীর্থস্থান প্রভৃতির গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু নিচে আলোচনা করা হল।

৩.১ নব্যভারতশতক

নব্যভারতশতক এর প্রধান বিষয়বস্তু হল বর্তমান ভারতের নৈতিক অধঃপতন প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি। কবি একাধারে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে মানবিক মূল্যবোধহীন ভারতবাসীকে তিরস্কার করেছেন।

কাব্যের শুরুতে কবি পুণ্য ভারতভূমির বন্দনা করেছেন-

দেবৈরপি কৃতো যত্র প্রযত্নো জন্মহেতবে।
জযতাদ্ ভারতী ভূমিঃ ভুক্তিমুক্তিবিধাযিনী॥[১]

অর্থাৎ দেবতাগণও যে স্থানে জন্মলাভের জন্য বাঞ্ছা করে থাকেন, সেই ভুক্তি-মুক্তি প্রদানকারী ভারতভূমির জয় হোক।

ভারতের খ্যাতকীর্তি সূর্য-চন্দ্রবংশীয়, শিশুনাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি রাজন্যবর্গের উল্লেখ করেছেন। তারপর বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি যথা দাস, খিলজী, তুঘলক,

লোদী, মুঘল, আফগান, ইংরেজ, ফ্রান্স প্রভৃতির ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলেছেন। ধীরে ধীরে এই বৈদেশিক শক্তিগুলির শাসন-শোষণে ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মঙ্গল পাণ্ডে, ভক্তসিংহ, চন্দ্রশেখর, রাজগুরু, সুখদেব, আশফাকুল্লা, বিসমিল, রোশন সিংহ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ক্ষুদিরাম, যতীন্দ্রনাথ এঁরা দেশের জন্য জীবনোৎসর্গ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। আজ আমরা নিজের কর্তব্য ভুলে গেছি। সমস্যাকীর্ণ বর্তমান ভারতকে দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন-

তদেব ভারতং রাষ্ট্রং প্রাপ্তভূরিসমস্যকম্।

পীড্যতে নিতরাং হন্ত! লোকতন্ত্রসমাশ্রিতম্॥[২]

সেই (বহু কষ্টে স্বাধীন) লোকতান্ত্রিক বর্তমান ভারতের বিবিধ সমস্যা (কবির) অন্তরকে ব্যথিত করে।

কবি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের শঠতা, ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি অত্যধিক লোভ, হিংসাবৃত্তি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রভৃতির দৃপ্তকণ্ঠে নিন্দা করেছেন। কবির মতে বর্তমান ভারতে কোনো রাজনৈতিক দলই সাম্যবাদী নয়। শুধু নির্বাচনে জয় লাভের জন্য সংখ্যালঘু মানুষের সেবা করে জনকল্যাণের অভিনয় করে।[৩] জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষেরা দুশ্চরিত্র নেতাদেরকে সমর্থন করে চলেছে।

কবি আক্ষেপ করে বলেছেন বিদ্বান, তপস্বীগণ আজ উদ্যমহীন, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নচিকেতা প্রমুখ মান্য সন্তানরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশে আজ অসমর্থ সন্তানরা বিরাজ করছে। এ সমাজে যথার্থ শিক্ষিত মানুষের সমাদর করা হয় না।

আমরা প্রাচীন ভারতের রাষ্টপরিচালনার নীতির গুরুত্ব ভুলে গেছি। *রামায়ণ, মহাভারত, চাণক্যনীতি,* ভারতের মহান শাসকবর্গের মহিমা আজ উপেক্ষিত। রাজেন্দ্র মিশ্রের মতে রাষ্ট্র কেবল সৈন্য ও নেতৃমণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত হয় না, বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়।[৪]

বর্তমান সমাজে মানুষের নৈতিক অধঃপতন সম্বন্ধে রাজেন্দ্র মিশ্র বলেছেন এ যুগের মানুষ বঞ্চনা, কার্পণ্য, শাঠ্য, লোভ প্রভৃতিতে আসক্ত। তারা কেবল জীবনধারণ করে থাকে, জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই তাদের। সত্যের প্রতি মানুষের রুচি নেই, প্রেমে নিষ্ঠা নেই,

মনোবৃত্তিতে সারল্য নেই, অনুগতের প্রতি বিশ্বাস নেই। সুহৃদের প্রতি সদ্ব্যবহার নেই, গৌরবে বিনয়ভাব নেই, শুচিতা নেই, পরিত্যজ্য বস্তুর ব্যবহারে কদর্যতা নেই অর্থাৎ পরিত্যজ্য বস্তুর প্রতিই মানুষের আসক্তি বেশি।

নব্যভারতশতকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। ঐক্যের অবক্ষয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে- রাষ্ট্রের দ্বারা পৃথিবী, সীমান্তের দ্বারা জনপদ, জনপদের দ্বারা গ্রাম, গ্রামের দ্বারা জনজাতি, আকৃতির দ্বারা মানুষ বিভক্ত হচ্ছে। সর্বত্র শুধু বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধিতা করে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের, বৈশ্য শূদ্রের এবং শূদ্র তদপেক্ষা নিম্নবর্গের মানুষের বিরোধিতা করছে।

এই শতককাব্যের শেষের দিকে (শ্লোক নং ৯৩-১০১) কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের বংশপরিচয় ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য রয়েছে। কবি জানিয়েছেন, গোমতী জাহ্নবীর পবিত্র তটস্থিত জৌনপুরে (উত্তরপ্রদেশ) বিষ্ণুর উপাসকগণের বংশে, গৌতম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মাতা অভিরাজী দেবী ও পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাচর্চা করতে থাকেন। কবি তাঁর গুরু শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত, শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ শুক্লা ও পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রকে প্রণাম জানিয়েছেন। উপাধ্যায়ের বিয়োগ জনিত দুঃখ উপশমের জন্য কবি *নব্যভারতশতক* কাব্যটি রচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন-

উপাধ্যাযবিযোগোত্থাং পীডামেব বিনোদযন্।

নব্যভারতপীডাযা বিস্তরং বিদধাম্যহম্॥[৫]

৩.২ মাতৃশতক

এই শতকে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর মাতা অভিরাজী দেবীর মহিমা কীর্তন করেছেন ও তৎসঙ্গে ভারতীয় সভ্যতায় পূজ্য মাতৃমণ্ডলেরও উল্লেখ করেছেন। কাব্যের প্রারম্ভে কবি বলেছেন-

যৎস্তন্যপোষণভরৈরমৃতাযমানৈ-

রাদ্যন্তমধ্যরহিতোঽপি জগন্নিবাসঃ

বৎসীভবংস্তনুবিকাসততিং প্রপেদে।

তাম্মাতরং প্রসবিনীং জগতাং নতোঽস্মি॥[৬]

কবি ত্রিলোকের শরণ মা'কে প্রণাম জানিয়েছেন। অভিরাজ-জননী পৃথিবীতে আবির্ভুত না হলে কবির জন্মলাভ হতো না। তাই কবি পৃথিবীর সকল প্রাণের উৎস সবিতাকে প্রণাম করেছেন।

এরপর কবি তাঁর পরিবার সম্বন্ধে বলেছেন। এই শতক থেকে জানা যায় যে, কবির আড়াই বছর বয়সে তাঁর পিতা গত হন। রাজেন্দ্র মিশ্রের অনুজ সুরেন্দ্র বিকলাঙ্গ ছিলেন। স্বামীর অবর্তমানে সংসারের দায়িত্ব ও তিন সন্তানের পালন-পোষণ যথাযথ সম্পন্ন করেন অভিরাজী দেবী। তাই কবি স্বীয় মাতাকে তপস্বীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তিনি মায়ের চরণে স্থান পেলে মুক্তিসুখ, স্বর্গলাভের মতো দুর্লভ বস্তুও পরিত্যাগ করতে পারেন-

নহি বিরঞ্চিপদং ন শিবাস্পদং ন চ মুকুন্দপদং তপসা বৃণে।
ননু বৃণে পরমাস্পদমঞ্জসা যদি তু মাতুরদোঽদ্রিভুবোঽথবা॥
জগতি ভূতিততিং নহি কাময়ে দিবি ন মুক্তিসুখং ক্রিয়তেঽর্থনা।
অযি বিধে ৰৰনৈব জনিপ্রদা ভবতু মে খলু জন্মনি জন্মনি॥[৭]

আমি তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মপদ, শিবপদ বা বিষ্ণুপদ লাভ করতে চাই না। মাতৃস্নেহরূপ পর্বত বা আকাশই আমার পরম কাঙ্ক্ষিত। জাগতিক সম্পদ বা স্বর্গীয় মুক্তিসুখ আমার প্রয়োজন নেই। হে বিধাতা! প্রতি জন্মে যেন ববনা (রাজেন্দ্র মিশ্রের মাতার ডাকনাম) আমার মাতা হন।

আলোচ্য শতককাব্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র প্রসঙ্গক্রমে নমস্যা মাতৃমণ্ডলের নাম স্মরণ করেছেন। এই কাব্যে মহাদের শক্তির আধার তথা লীলাসঙ্গিনী শর্বাণী, নারায়ণের পাদসেবী তথা লীলাসঙ্গিনী লক্ষ্মী, বাগদেবী সরস্বতী, ইন্দ্রপত্নী শচী, কামদেবের পত্নী রতি, মনুর স্ত্রী শতরূপা, ঋষি কশ্যপের দ্বিতীয়া পত্নী তথা দেবমাতা অদিতি, ঋষি অত্রির স্ত্রী অনসূয়া, স্বয়ম্ভূব মনুর কন্যা তথা ঋষি কর্দমের পত্নী দেবহূতী, ঋষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী, অগস্ত্যের স্ত্রী লোপামুদ্রা, ঋষি গৌতম-পত্নী অহল্যা, জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা, চ্যবন মুনির স্ত্রী সুকন্যা, দৈত্যরাজ পৌলমের কন্যা ও ইন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী পৌলমী, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদাত্রী মাতা কৌশল্যা, শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী মাতা দেবকী ও পালয়িত্রী মাতা যশোদা, পাণ্ডব-মাতা পৃথা বা কুন্তী, সত্যকামের মাতা জবালা, ঐতরেয়ের মাতা ইতরা, গৌতম বুদ্ধের মাতা মায়া এঁরা স্ব স্বমহিমার দ্বারা বিশ্বে কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কবির মতে গৃহী তাপস ও রাজর্ষিগণের চেয়েও মহিমায় এঁরা অগ্রগণ্যা।

জগতে সৃষ্টির নিয়ামক বিবিধ শক্তিকে কবি মাতৃরূপে সম্বোধন করেছেন। চন্দ্রজ্যোৎস্না, সূর্যের দীপ্তি, সলিলের আর্দ্রতা, প্রকৃতি, পৃথিবী, ত্রিসন্ধ্যা, দামিনী প্রমুখের প্রশস্তি রয়েছে এই শতকে।

মহাপ্রাণ ও মহর্ষিগণের কীর্তির মূল হোতা মাতৃমণ্ডল সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বগুণান্বিত। কবি স্বীয় গর্ভধারিণী মাতা অভিরাজী দেবীকে এঁদের সমমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন-

তথাহং জননীং সাধ্বীং মৎকৃতে ব্যথযার্দিতাম্।

অভিরাজীং মনোবাগভ্যাং কর্মণা চ প্রসাদযে॥[৮]

অর্থাৎ আমার (গর্ভধারণ ও পোষণের) জন্য ব্যথা ভোগকারী সাধ্বী জননী অভিরাজীকে মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা প্রসন্ন করতে চাই।

এই শতককাব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চার বছর বয়সে, কবির আড়াই বছর বয়সে এবং জন্মাবধি বিকলাংগ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রের মাত্র কয়েক মাস বয়সে পিতা দুর্গাপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। তারপর কবির বিদ্যার্জন, কর্মজীবন, যশোলাভ, হিন্দী, ভোজপুরী ও সংস্কৃত ভাষায় কাব্যচর্চা, ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়, মায়ের প্রতি সন্তানদের কর্তব্যে অবহেলা ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। *মাতৃশতকের* অন্তিম অংশে কবির জন্মস্থান ও বংশপরিচয় রয়েছে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র নিজেকে কালিদাস, শ্রীহর্ষ, জয়দেব, বিল্হণ প্রমুখ কবিগণের উত্তরসূরীরূপে পরিচয় দিয়েছেন-

সংসারেঽজনি কালিদাসসুকবির্ভূত্বা য আদৌ ধ্রুবং

শ্রীহর্ষস্য ততোঽভিধামুপযযৌ বৈদর্ভবাচস্পতেঃ।

পশ্চাদ্যো জযদেববিগ্রহধরোঽভূদ্ বিল্হণোঽনন্তরং

সোঽযং পণ্ডিতরাজদেহিনিলযো রাজেন্দ্রমিশ্রোঽধুনা॥[৯]

এই বিশ্বে প্রথমে যিনি কবি কালিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তৎপরবর্তীকালে শ্রীহর্ষ, জয়দেব, বিহ্লণ, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথরূপে শরীর ধারণ করেছেন। বর্তমানে তিনি রাজেন্দ্র মিশ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

৩.৩ প্রভাতমঙ্গলশতক

১০৪ টি শ্লোকে নিবদ্ধ *প্রভাতমঙ্গলশতকে* প্রমুখ দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। প্রতিটি শ্লোকে কবি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রশস্তিপূর্বক সুপ্রভাত প্রার্থনা করেছেন।

প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদির রীতি সুপ্রাচীন। ভারতের ধর্মীয় জীবনচর্যার এক সুপরিচিত ও অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হল প্রভাতকালীন ইষ্টবন্দনা বা প্রাতঃস্মরণ। বেদ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র তথা অর্বাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে প্রাতঃস্মরণ পূর্বক দিনের শুভারম্ভ করার উপদেশ ও নিয়ম কথিত আছে। এই শতককাব্যেও প্রাতঃকালীন বন্দনা সূচিত হয়েছে। এখানে প্রমুখ দেবতা, মাতৃভূমি, ভারতের বিবিধ নগরী, ক্রান্তদর্শী ঋষিসমূহের মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে।

প্রভাতমঙ্গলশতকের প্রারম্ভে বিঘ্ননাশকারী, উদ্যোগে সাফল্য দানকারী গণেশের স্তুতিপূর্বক সুপ্রভাত প্রার্থনা করা হয়েছে-

বিঘ্নব্রজাপসরণব্যবসাযদক্ষঃ
সিন্দূরপুরপরিভূষিতকান্তকাযঃ।
দ্বৈপাযনাননবচোমৃতপূতমেধো
বিঘ্নেশ্বরো দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[১০]

তারপর অন্যান্য দেবতার একাধিক বার, একাধিক নামে অভিহিত করে স্তোত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। শিব (আশুতোষ, স্থানু, পরিপীতহলাহল, ভস্মাম্বর, কপালী, গঙ্গাধর, শ্রীকণ্ঠ), দুর্গা (কাত্যায়নী, বগলা, শারদা), সরস্বতী (হংসাসনা, সারদা, ভারতী, ব্রাহ্মী), লক্ষ্মী (বিষ্ণুপ্রিয়া, পদ্মালয়া, ইন্দিরা), ব্রহ্মা, বিষ্ণু (বিশ্বম্ভর, সর্বেশ্বর, নারায়ণ, লক্ষ্মীপতি), রাঘব, কামদেব, হনুমান (প্রাভঞ্জ, কপিরাজ, মারুতি), ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের প্রমুখ দেবতার বন্দনা করা হয়েছে।

অতঃপর কবি ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্মত নবগ্রহ, যথা- সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু তথা দিকসমূহ, আকাশ প্রভৃতির স্তুতি করেছেন।

দেশ তথা দেশের পুন্যতোয়া নদী, পবিত্র তীর্থস্থান, সপ্তকুলাচল, সপ্ততীর্থ, বিবিধ নগরী, সপ্ত অমর ব্যক্তিত্ব (বেদব্যাস, অশ্বত্থামা, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য, পরশুরাম, মার্কণ্ডেয়) প্রভৃতির স্তুতি রয়েছে এই শতককাব্যে। রাজেন্দ্র মিশ্র ভারতের ভৌগোলিক রূপের এভাবে স্তুতি করেছেন-

কাশ্মীরমস্তকবতী হিমবত্ কিরীটা
গঙ্গাকলিন্দতনযোভযনেত্রপদ্মা।
দেবপ্রিযা তমিলকেরলপাদযুগ্মা
ভূর্ভারতী দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[১১]

কাশ্মীর যার মস্তকস্বরূপ, হিমালয় কিরীট, গঙ্গা ও যমুনা দুটি নেত্র, তামিলনাড়ু ও কেরল যাঁর দুটি পদ, সেই ভারতভূমি আমায় সুপ্রভাত দান করুন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়, লব্ধকীর্তি রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রথমে সীরধ্বজের নামোল্লেখ করেছেন। রাজর্ষি জনকের প্রকৃত নাম হল সীরধ্বজ। তিনি বিদেহরাজ নামেও পরিচিত। তাই সীতার আর এক নাম বৈদেহী। এর পর অন্যান্য রাজাদের মধ্যে শরণাগতের প্রাণ রক্ষার্থে বাজপাখিকে স্বশরীর থেকে মাংস দানের মহিমায় উজ্জ্বল হস্তিনাপুররাজ শিবি, বিষ্ণুভক্ত তথা সাংসারিক অর্থ-সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত, প্রজাবৎসল রন্তিদেব, কুরুবংশের খ্যাতকীর্তি প্রাচীন রাজা তথা পুরুর পিতা যযাতি, বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন। অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞ সপ্তর্ষি, যথা অত্রি, মরীচি, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্যের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে পাণ্ডব-মাতা কুন্তী, জনক-দুহিতা তথা রামচন্দ্রের ধর্মপত্নী সীতা, শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদা, রাজা উত্থানপাদের পত্নী তথা শ্রীনারায়ণের স্নেহলব্ধ ধ্রুবের মাতা সুনীতি, হরিভক্ত প্রহ্লাদের মাতা কয়াধূ এবং রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যার নাম উল্লেখ পূর্বক সুপ্রভাত প্রার্থনা করা হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব, চিরবন্দিত আদিকবি বাল্মীকি, বৈয়াকরণ পাণিনি, মহাভারত ও পুরাণকার বেদব্যাস, মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষি তথা ব্যাখ্যাকার বৌধায়ন, বররুচি, গর্গ প্রমুখ ও নাট্যকার ভাসের স্তুতি রয়েছে। রাজেন্দ্র মিশ্র কালিদাসের বন্দনা এইভাবে করেছেন-

সংকেতকাকুবচনেঙ্গিতশব্দযোগৈঃ

কাব্যাধিকং প্রিযতরং কিল ভাষমাণঃ।

সারস্বতামৃতঘটঃ কবিকালিদাসো

নিত্যং তনোতু মম মঙ্গলসুপ্রভাতম্॥[১২]

সাংকেতিত, কাকু, ব্যঞ্জক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যার কাব্য অত্যন্ত উপাদেয় সেই সারস্বত অমৃতের ঘটস্বরূপ কবি কালিদাস প্রত্যহ সুপ্রভাত দান করুন।

এরপর কবি জয়দেব, কুমারদাস, বাণভট্ট, ভট্টি, ভবভূতি, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের বন্দনা রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শংকরাচার্য, বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রবক্তা রামানুজ, নিম্বার্ক মতের স্রষ্টা বল্লভাচার্যের স্তুতি রয়েছে এই শতককাব্যে।

ভারতের জনজীবনে ভাব, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন-

নানাবিচারমতবাদমতান্তরাণাং

নানাশনব্যসনভাষণভূষণানাম্।

সুস্রোতসামিব সমুদ্রনিভাঽন্বিতিস্সাঽ

স্মত্সংস্কৃতির্দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[১৩]

বিবিধ বিচার, মতবাদ, খাদ্যাভ্যাস, রুচি, ভাষা, পরিধানের ধারারূপ সংস্কৃতিসিন্ধু ভারতবর্ষ আমাকে নবপ্রভাত প্রদান করুন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর *প্রভাতমঙ্গলশতকে* সংস্কৃত ভাষার প্রশস্তি করেছেন- জন্ম, পরিণয়, মৃত্যু বিবিধ সংস্কারে সংস্কৃত ভাষা (মন্ত্র) উচ্চারিত হয়ে থাকে। সেই ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন কাল থেকে আগম-নিগম, সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করা হয়েছে। একাক্ষর ওঁ উচ্চারণ এর দ্বারা মানবের মুমুক্ষুত্ব লাভ হয় এবং এর দ্বারা বস্তুর ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্যতা তৈরী হয়।

প্রভাতমঙ্গলশতকের শেষ দিকে কবি চিত্তবৃত্তির উন্নতি সাধন ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বাঞ্ছা প্রকাশ করেছেন। অপরের প্রতি মিত্রভাব, পরোপকার, সর্বোপরি অপরের জন্য জীবনোৎসর্গের কথা বলেছেন। কবি বলেছেন, তাঁর মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করেও যদি অন্যের চিত্তে আনন্দলাভ হয়, তাহলেও তিনি জীবনের সার্থকতা বলে মনে করবেন।[১৪]

কবি মাত্র একরাত্রি জেগে *প্রভাতমঙ্গলশতক* রচনা করেন। কাব্যটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তাঁর এই কাব্য কীর্তি, অমঙ্গল নাশ, অর্থ, কান্তাসম্মিত উপদেশ দানের জন্য নয়। যুবাদের রসাস্বাদনের জন্য এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণজনিত শ্রান্তির বিরামের জন্য কবির এই কাব্যরচনা। তিনি আস্তিক ও মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রবোধনের জন্য *প্রভাতমঙ্গলশতক* রচনা করেছেন, এটি খেলার বস্তু নয়।[১৫]

৩.৪ সুভাষিতোদ্ধারশতক

১০২ টি শ্লোকে নিবদ্ধ *সুভাষিতোদ্ধারশতক* সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপর রচিত নয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র শতকটির শুরুতেই জানিয়েছেন-

যুগৰোধং সমাদৃত্য প্রত্নসূক্তিসমীক্ষিতাঃ।

পুনরেবং বিলিখ্যন্তে সূক্তযো নবদর্শনাঃ॥[১৬]

অর্থাৎ বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত, লোকমুখে প্রচারিত প্রাচীন সূক্তিগুলিকে কবি সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লিখেছেন। শ্লোকগুলির উৎস প্রাচীন সূক্তি হলেও যেহেতু বিন্যাস ও বিষয়বস্তু কবির নবীন চিন্তাপ্রসূত, তাই একে কোষকাব্য বলা যায় না।

এখানে কবির বক্তব্য কোথাও নির্মল হাস্যরসপূর্ণ, কোথাও সমাজের প্রতি তির্যক কটাক্ষ। কোথাও বা হাস্যের অন্তরালে তিরস্কার। যেমন হাস্যাত্মক শ্লোক-

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।

পুরুষা যত্র পূজ্যন্তে তত্র কিং দৈত্যদানবাঃ॥

নির্ভূষাং বিদূষীং কন্যামর্পযন্নাহ তত্ পিতা।

স্থিরং বাগভূষণং মন্যে ক্ষীযতেঽখিলভূষণম্॥[১৭]

যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে দেবতাগণ অবস্থার করেন। আর যেখানে পুরুষ পূজিত হন, সেখানে কি দৈত্য-দানব বাস করে? নির্ভূষণ কন্যাকে সম্প্রদানকালে পিতা বলল অবশ্যই বাগভূষণ পৃথিবীর সমস্ত ভূষণকে পরাজিত করে।

ব্যঙ্গার্থবোধক শ্লোক-

নিসর্গজিহ্মতা ভব্য নোৎপাদযতি জাতু চিত্।

দৃষ্টিরাকেকরা ক্বাপি নো কটাক্ষসমা মতা॥

দানে তপসি শৌর্যে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।

উত্ কোচগ্রহণে তস্য মন্যে সুনিশ্চিতোন্নতি॥[১৮]

স্বভাববক্রতা থেকে ভাল কিছু হয় না। টেরা দৃষ্টি কখনই কটাক্ষের মতো হতে পারে না। দান, তপস্যা ও শৌর্যের দ্বারা যার উন্নতি হয় না, উৎকোচ গ্রহণের দ্বারা তার উন্নতি নিশ্চিত।

রাজেন্দ্র মিশ্রের অন্যন্য শতককাব্যের মতো এই কাব্যের বিষয়ে স্থান পেয়েছে রাজনীতি, উৎকোচ, শিক্ষাব্যবস্থা, মানবিক মূল্যবোধ, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি।

কবি বীণাপাণি সরস্বতীর বন্দনা করেছেন-

বাণীং ভগবতীং বন্দে ক্রোডীকৃতবিপঞ্চিকাম্।

রাজতেঽবিগলং যস্যাঃ কবীনাং চারুমূর্চ্ছনাঃ॥[১৯]

গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আজকাল গুরুরা যেহেতু বাচাল, তাই শিষ্যগণকেও তাদের আদেশ পালনের পূর্বে বিবেচনা করা আবশ্যক। অর্থাৎ গুরুর আদেশ বিচার করে তবেই পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত কে বা জ্ঞানী নন। মহান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাথরও দেবত্ব লাভ করতে পারে। যিনি পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রকে প্রশ্নপত্র তুলে দেন, তিনি হলেন গুরু। আর যে বিনামূল্যে গুরুকে বিবিধ দ্রব্য উপহার দেয়, সে হল প্রকৃত ছাত্র।

বর্তমান সময়ে উৎকোচ একটি নিন্দনীয় অথচ বহুল প্রচলিত দ্রব্য। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন দান, তপস্যা ও শৌর্যের দ্বারা যার যশের প্রসার ঘটে না, উৎকোচের দ্বারা তার অবশ্যম্ভাবী উন্নতি। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, তেমনই উৎকোচ অসফলকে সাফল্যমণ্ডিত করে। এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিত্ ক্রিযা ফলবতী ভবেত্।

তস্মাদ্ দ্রব্যং পুরস্কৃত্য বিজ্ঞঃ কার্যাণি সাধযেত্॥

অদ্রব্যে নিহিত ক্রিয়া কখনও ফলবতী হয় না। তাই দ্রব্যাদি প্রদান করে বিজ্ঞেরা কার্যসাধন করে থাকে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কবি বলেছেন, যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে কর্তা ইচ্ছানুসারে দ্রব্য প্রস্তুত করতে পারে, সেরকম নেতারাও আসনের প্রভাবে সবকিছু করতে পারে। রূপ-যৌবনসম্পন্ন, উচ্চবংশজাত, বিদ্যাহীন ব্যক্তিও শোভা পায়, যদি সে বিধায়ক হয়। সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় ভুলে নির্বাচনে যোগ দাও। এতে পাপ নেই। এখন নির্গুণতাই সম্মনার্হ, ধিক্কার গুণ-গৌরবকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিধায়ক-মন্ত্রীদের সচিব (আজ্ঞাবহ) হয়ে থাকে।

বিদ্বান ও মূর্খের পার্থক্য বিষয়ে কবির বক্তব্য, বিদ্দজ্জনেরা ততক্ষণ পর্যন্ত শোভা পান না, যতক্ষণ তারা কিছু না বলেন। মূর্খরা ততক্ষণ শোভা পায়, যতক্ষণ তারা কিছু না বলে। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র মহৎ ব্যক্তিকে কর্পূরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কর্পূর যেমন বাতাসের দ্বারা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তেমন মহৎ ব্যক্তিরাও স্বল্পায়ু হন। অন্যদিকে যারা নাস্তিক, নিষ্ক্রিয়, গুরু ও শাস্ত্রের লঙ্ঘনকারী, অধর্মচারী, তারাই এই কলিতে দীর্ঘায়ু হয়। অন্যদিকে অক্রোধী, সত্যবাদী, জীবের প্রতি অহিংস, অসূয়া-দোষরহিত তারা বেশিদিন জীবিত থাকেন না। অর্থাৎ তাদেরকে বাঁচতে দেওয়া হয় না। এখানে কবির বক্তব্য হল, এই সমাজ সৎ, জ্ঞানী মানুষদের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। পক্ষান্তরে এখানে অসৎ ব্যক্তিরাই সম্মানিত হচ্ছে। এই স্খলিত সমাজে সভ্য ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাদর প্রদর্শিত হয় না।

পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যে অবহেলা, চৌর্য, লুঠতরাজ, সজ্জনের অবজ্ঞা ও কুটিলের সমাদর, মিথ্যাজ্ঞানের আস্ফালন, অপরিণাদর্শিতা প্রভৃতি সমাজের সমসাময়িক সমস্যাগুলিকে কবি তির্যগ্ বাকবিন্যাসের দ্বারা পরিবেশিত করেছেন। *মাতৃবত্ পরদারেষু-* এই সূক্তিটিকে কবি এভাবে বলেছেন-

মাতৃবত্ পরদারেষু মন্যে মত্বেতি লম্পটাঃ।

যেন কেন প্রকারেণ জাযন্তে তত্স্তনন্ধযা॥[২০]

অর্থাৎ পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃভাব রাখবে- এই নীতিবাক্য শুনে লম্পটরা পরস্ত্রীর স্তনের প্রতি আসক্ত হচ্ছে।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত্ যাবজ্জীবনং সুখং জীবেত্- চার্বাকদের এই উক্তিটি কবি অন্যভাবে বলেছেন- যতদিন জীবন, ততদিন সুখেই থাক। প্রয়োজনে ঋণ করে হলেও ঘি খাও। চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঋণ তো সন্তান পরিশোধ করবে। কবি এখানে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে মানুষের অপরিণামদর্শিতার নিন্দা করেছেন। আত্মসর্বস্ব মানুষ সর্বদা নিজের জন্যই বাঁচে, অপরের চিন্তা করে না। তাঁদের পরলোকব্যসনের ভয় থাকে না। তাই ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই তারা প্রাধান্য দেয়। ফলে পরিবার, সমাজ, সর্বোপরি এই দেশ তাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় না।

শ্রীমদ্ভগবতগীতার দুটি বহুল পরিচিত শ্লোক শ্লেষের দ্বারা কবি এভাবে বলেছেন-

পরিত্রাণায দস্যূনাং বিনাশায চ সৎকৃতাম্।
পাপসংবর্ধনার্থায নেতা জাতো যুগে-যুগে॥
যদা-যদা হ্যধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতে।
অভ্যুত্থানং চ ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ॥[২১]

দস্যুদের পরিত্রাণ, সৎ ব্যক্তির বিনাশ এবং পাপবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক নেতারা জন্মগ্রহণ করে। যখন যখন পৃথিবীতে অধর্মের গ্লানি হয় এবং ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে তখন তখন এই নেতারা অধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে প্রকটিত করে।

যদিও কবি তাঁর কাব্যের প্রথম দিকেই ঘোষণা করেছেন যে, এই কাব্যটি কারোর নিন্দা বা অবমাননা করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি, কেবল মনোরঞ্জনের জন্য এই পরিশ্রম করা।[২২] কিন্তু *সুভাষিতোদ্ধারশতকের* প্রায় অধিকাংশ শ্লোকেই বক্রোক্তির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন নিন্দনীয় কর্মপদ্ধতী, মানসিকতার সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন রাজেন্দ্র মিশ্র।

৩.৫ চতুর্থীশতক

অভিরাজসপ্তশতী শতকসমুচ্চয়ের অন্তর্গত পঞ্চম শতককাব্য হল *চতুর্থীশতক*। পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'নমস্' শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। আলোচ্য শতককাব্যে নমস্কারাত্মক ভঙ্গিতে খল, দুশ্চরিত্রের নিন্দা করা হয়েছে। তাই আলোচ্য শতককাব্যের নাম *চতুর্থীশতক*।

কবি মনে করেন যে, দেববাণীর পূজা, অর্চনার জন্য গোবিন্দ তাঁকে নীরোগ রেখেছেন। তাই মঙ্গলাচরণে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়েছেন। তারপর বিষয়ে প্রবেশ করেছেন। শুরুতেই কবি নীচ, খল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

মন্যে ঋণত্রযাদূর্ধ্বং খলানামৃণগৌরবম্।

খলেশ্বরায পাপায তস্মাত্প্রণতিরর্প্যতে॥

ৰৃহত্কুলং সমালোক্য খলানাং বিকসদ্দ্রুহাম্।

বিশ্বরূপায নীচায নমোবাকং প্রশাস্মহে॥[২৩]

তারপর কবি বলেছেন যার মুখে সংস্কৃত বাণী পংকে পতিতা গাভীর মতো দুঃখ পায়, সেই অসংস্কৃত ব্যক্তিকে নমস্কার। কায়-মন-বাক্যে ভিন্ন, বঞ্চনামাত্র জীবিকা যে ব্যক্তির, সেই প্রকৃতিগত নীচ ব্যক্তিকে নমস্কার। চন্দন, কেশরের তিলকও যার ললাট শুভ্র করতে পারেনা, সেই ব্যক্তিকে সতত নমস্কার। স্বার্থের অক্ষক্রীড়ায় যে ঈশ্বরকেও বিভীতক মনে করে, সেই শূদ্রকে নমস্কার করি। সৌম্যদর্শন অথচ অসৌম্য, আপাত ধার্মিক অথচ অধার্মিক, বাহ্যাভ্যন্তরে ভিন্ন দ্বিজিহ্বকে (সর্পকে) নমস্কার।

এরপর কবি বিভক্তি বিষয়ক ব্যঙ্গাত্মক শ্লোক প্রস্তুত করেছেন। প্রথমা বিভক্তি পরীক্ষায় সিদ্ধ হল না। অর্থাৎ বিভাজনের কার্য (ছলনা) ফলভূত হল না। এখন পশ্চাত্তাপ ব্যতীত কিছু করার নেই। কর্মহীনতার জন্য যার দ্বিতীয়া ফলবতী হল না, সেই অকর্মণ্য, অদ্বিতীয় ব্যক্তিকে নমস্কার। অনাদরের কারণে তৃতীয়া যার প্রিয় হল না, সেই তৃতীয় পুরুষরূপী (নপুংসক) সুন্দর পতিকে নমস্কার। দানের বিরোধীতার কারণে চতুর্থী যার প্রিয় নয়, এইরূপ কৃপণ রাজা ও ভিক্ষুককে নমস্কার। সন্তান, বন্ধু, শিষ্য প্রভৃতি থেকে যার ভয় উৎপন্ন হয়েছে, সেই সন্ত্রস্ত, অপাদানবিরুদ্ধ ব্যক্তিকে নমস্কার। অনাদরে প্রদত্ত বস্তুর ষষ্ঠী (ছয় ভাগের এক ভাগ) রুচিকর হয় না। নামের দ্বারা সম্বোধন যার কাছে মৃত্যুতুল্য, সেই কাষ্ঠবৎ জীবন্মৃতকে নমস্কার।

এরপর রাজেন্দ্র মিশ্র অনুরূপভাবে কৃদন্ত, সন্নন্ত, যঙন্ত এবং ণিজন্ত বিষয়ক শ্লোক রচনা করেছেন। ধূর্ত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি ব্যক্তিদের প্রশংসা (নিন্দা) করেছেন। বর্তমান সময়ে অধিকার রক্ষার জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিন্দা প্রসঙ্গে কবি একটি মনোজ্ঞ শ্লোক রচনা করেছেন-

দ্বন্দ্বে জাতেঽধিকারার্থং সঙ্গতো নৈকশেষতাম্।

ইতরেতরবিদ্ধায নিরাশায নমো নমঃ॥[২৪]

এছাড়া দুর্জনের বিদ্যা লাভের বিফলতা, বাগ্মিতার অভাব, ধর্মের ভেকধারী দুষ্ট ব্যক্তি, দ্যূতক্রীড়া, অহেতুক ভাগ্যের দোষান্বেষণ, অক্ষমের পরশ্রীকাতরতা, স্বজনের প্রতি বৈরীভাব, দুর্জন জ্ঞাতি, স্বার্থের লোভে বন্ধুর প্রতি শত্রুভাব প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোক এই শতককাব্যে পাওয়া যায়।

৩.৬ ভারতদণ্ডক

এই কাব্যটি দণ্ডক ছন্দে বিন্যস্ত। এখানে ৮টি পদ্যভাগ রয়েছে। ভারত, ভারতীয় সংস্কৃতি, জ্ঞান সাধনা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, মহামানব, রাজন্যবর্গ, ঋষি প্রভৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত ভারতকে কবি বার বার প্রণতি জানিয়েছেন।

প্রথম পদ্যে কবি সংস্কৃত ভাষার এইভাবে প্রশস্তি করেছেন- ভারতের অলংকার স্বরূপা, দেবভাষারূপা, পুণ্যসারস্বত জ্ঞানগম্ভীরা, অবনীর ভূষণরূপা, প্রীতিদাত্রী, মুক্তিদাত্রী, শক্তিদাত্রী, ভক্তিদাত্রী, অন্তঃকরণ পবিত্রকারিণী, অখিল মানবের ছায়াস্বরূপা, মাতৃরূপা, ভূভাগ থেকে উত্থিত উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায়, প্রৌঢ়জ্ঞানসঞ্চারিণী, দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য প্রভৃতির নাশকারিনী, মূর্খের অন্তঃস্থল থেকে জ্ঞানের উদ্বোধনকারিনী, সুখের মন্দাকিনী স্বরূপা, মূঢ়তার নাশকারিনী, দেবগণের দ্বারা সমাদৃতা, কাব্যশালিনী, ষড়দর্শনা, নীতিবিশারদা, রীতি-প্রীতি-গীতিময়ী সংস্কৃত ভাষা। এইভাষায় শকুন্তলার (অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের) উপাদেয়তা রয়েছে, ব্যঞ্জনার বাহুল্য রয়েছে। মাঘ, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ, গুণাঢ্য প্রমুখ খ্যাতকীর্তি কবিগণের প্রিয় এই সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমি সর্বদা বিনত হই।

দ্বিতীয় পদ্যে বলা হয়েছে ভারতীয়দের জীবনপাবন এই ভারতবর্ষ কাব্যচর্চার বনস্বরূপা, পার্থিব নন্দনকাননরূপা। যার শীর্ষে কাশ্মীর, মেখলার ন্যায় বিন্ধ্যাচল, পাদাম্বুজে নীল সমুদ্র। যেখানে গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু প্রভৃতি পুন্যতোয়া নদীর জল শ্রদ্ধাভরে পান করা হয়, যেখানে সুসংহত ও চমৎকারজনক কলা, নাট্যাদি সম্ভাবিত হয়, সংস্কৃতিরূপা বীণা থেকে ঝংকার উৎপন্ন হয়- সেইরূপ ভারতবর্ষকে নমস্কার করি।

কবি তৃতীয় পদ্যে বলেছেন আমি (এইরূপ) ভারতের জয়গান করি যেখানে হৃদয়ের অনুরূপ আদর্শ বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে রন্তিদেব, হরিশ্চন্দ্র, শিবি, রামচন্দ্র, অম্বরীষ, নৃগ, রঘু, সুহোত্র, অজমীঢ়, গয় প্রমুখ আদর্শের প্রতিমূর্তি রাজব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ পদ্যে ভারতের ঋতুবৈচিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে ষড়ঋতুর প্রভাবে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়। বসন্তে উদ্যান, বনপ্রকৃতি যেন পুষ্পবস্ত্র পরিধান করে থাকে। চম্পক পুষ্প প্রোষিতভর্তৃকা রমণীদের বিরহব্যথাকে উদ্দীপিত করে। চামেলী প্রণয়ীর অনুরাগকে বাড়িয়ে তোলে। বন্ধুজীব (একধরণের হলুদ ও সাদা ছোট ফুল, বসন্তকালে ফোটে) পদ্মের দৈন্যদশা দেখে আনন্দিত হয়। বস্তুত বসন্তকালে জলাশয়ের জল কমতে থাকে। তাই এসময় পদ্মের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বসন্তকালে বনপ্রকৃতি, ঝর্ণা, নদী, উদ্যান, মন্দির ও গৃহের প্রাঙ্গন প্রভৃতি পুষ্পস্তবকের দ্বারা অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করে। অতঃপর গ্রীষ্ম আসে। এইসময় মনে হয় সূর্য যেন অগ্নিবর্ষণ করছে। আবার বর্ষাকালীন আকাশে মেঘ শোভা পায়। বীণার ঝংকারের ন্যায় বৃষ্টির ধারা পৃথিবীর সর্বত্র পতিত হয়। ফলে গ্রীষ্মের তাপজনিত কষ্ট নিবারিত হয়। শরৎকালে জলাশয়ে শ্বেতপদ্ম ও নদীতটে কাশফুল ফোটে। তারপর মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। হেমন্তে দুঃসহ শীত অনুভূত হয়, কবির ভাষায়- *হেমন্তকে মৃত্যুতুল্যং দৃঢং নির্ধনানাং কৃতে ভৈরবং দারুণং দন্তসীত্ কারকারি ক্ষুধাবর্ধকং চক্রবালং ঋতুনামহো।*[২৫]

পঞ্চম পদ্যে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও নদ-নদীর কথা বলা হয়েছে। কৈলাস, গঙ্গার তটভূমি, হিমালয়, গোমুখ গুহা (যা থেকে মন্দাকিনী, ভাগীরথী, অলকানন্দার উৎপত্তি হয়েছে) প্রভৃতি তীর্থ তথা কৃষ্ণের প্রিয় যমুনা, গোমতী, সরস্বতী, নারায়ণী, গণ্ডকী, চর্মন্বতী, শিপ্রা, সিন্ধু, বেত্রবতী, তমসা, শোনভদ্রা, নর্মদা, তাপ্তী, ময়ূরাক্ষী, মহানদী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদীর জলদ্বারা স্নাত তীর্থসমূহের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো হয়েছে।

ষষ্ঠ্যাংশে ভারতবর্ষের ভাষাবৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কথ্য ও লেখ্য ভাষা যথা- হিন্দী, মারাঠী, সিন্ধী, ডোগরী, কাশ্মীরী, মৈথিলী, বাংলা, অসমিয়া, গুজরাতি, উড়িয়া, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, তেলুগু প্রভৃতি ভাষা রয়েছে। কবি শেষে সংস্কৃত ভাষার স্তুতি করেছেন। এই ভাষায় রচিত কাব্য, কবিগণের নামোল্লেখ করেছেন। রাজেন্দ্র মিশ্র এই অংশে সংস্কৃত সাহিত্যের লব্ধকীর্তি প্রায় সমস্ত কবিগণের নামোল্লেখ করেছেন।

সপ্তম পদ্যে কবি ভারতের জাতীয়তাবোধ, পররাষ্ট্রনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। কবি সর্বধর্মাত্মক, সৌম্যকর্মাত্মক, বিশ্বভ্রাতৃত্বভাবসম্পন্ন, দীনের রক্ষক, যুদ্ধ-হিংসাদিমুক্ত, স্বাবলম্বী, বিশ্বশান্তির প্রচারক, সীমান্তরক্ষক, জ্ঞান-যোগ-ভক্তির কেন্দ্রস্থল, ন্যায়পক্ষপাতী, বন্ধুর সমৃদ্ধি ও শত্রুর উৎপাটনে যত্নবান্ ভারতবর্ষকে নমস্কার করেছেন।

অষ্টম তথা অন্তিম পদ্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সরস্বতীর জয়গানপূর্বক স্বীয় ব্যাক্তিজীবনের সামান্য উল্লেখ করেছেন। এখানে জানা যায়, কবি প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব রীডার ছিলেন। এছাড়া কবির বিবিধ পুরস্কার লাভ, বালিদ্বীপে নিযুক্তি, সংস্কৃত-হিন্দী-ভোজপুরী এই তিন ভাষায় কাব্যরচনা প্রভৃতি তথ্য পাওয়া যায়।

৩.৭ সম্বোধনশতক

অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত এই শতকে ১০০টি শ্লোক রয়েছে। রাজেন্দ্র মিশ্র এই শতকটির শেষে বলেছেন-

ক্বচিন্নু সম্বোধ্য পরোক্ষরীত্যা প্রত্যক্ষমেবাথ জডাজডৌ দ্বৌ।
নিজানুভূতিং সহজং ব্যনক্তি রাজেন্দ্রমিশ্রঃ প্রথিতোঽভিরাজঃ॥[২৬]

অর্থাৎ কখনও চেতন, কখনও বা অচেতন বস্তুতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে কবি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এই শতকটি কাব্যরসিকদের প্রশংসার যোগ্য। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

ন রোদিতি ক্রোশতি নাপি বক্ষঃ সন্তাড্য ভূমৌ লুঠতি প্রকামম্।
কীদৃক্কুপাত্রং বিধিনোপনীতেত্যলং নু সন্তাপ্য বৃথা ব্যথে! মে॥[২৭]

অর্থাৎ (কেউ) কাঁদে না, সন্তাপ করে না, বক্ষতাড়ন করে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয় না। বিধি কেমন পাত্রকে নির্মাণ করেছেন। হে ব্যথা! তুমি ব্যর্থ। এখানে ব্যথা বা কষ্টকে তিরস্কারের মাধ্যমে কবি নিজেকেই ভর্তসনা করেছেন। অভিধেয় অর্থে *কুপাত্র* শব্দের দ্বারা ব্যথাকে বোঝালেও কবি নিজের কষ্টকে ব্যক্ত করেছেন। এখানে কবি বুঝিয়েছেন- তাঁর ব্যথায় কেউ কষ্ট পায় না, কেউ কাঁদে না।

এই শতককাব্যে কবি মানব মনের বিভিন্ন অনুভূতি তথা অবস্থার উল্লেখ করেছেন। সুখ, দুঃখ, হৃদস্পন্দন, ভাগ্য, মৃত্যু প্রভৃতির কখনও প্রশংসা, কখনও বা নিন্দার মাধ্যমে মানুষের আন্তরিক দৈন্যতা নিবারণের চেষ্টা করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও পর্বতের

অক্ষততা, কটুতা সত্ত্বেও নিম বৃক্ষের গুরুত্ব, সমাজে দোষদর্শী ব্যক্তির উপযোগিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই কাব্যে বলা হয়েছে।

সম্বোধনশতকের তিনটি শ্লোকে (শ্লোক নং ১৪ থেকে ১৬) মেঘের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন- তোমার (আকাশে) গমনাগমন ও বিদ্যুতের নৃত্য পুরাঙ্গনা ও সারসদের দৃষ্টিসুখ বিধান করে। হে মেঘ! তুমি বড়ই রসিক। মেঘ! তুমি কামকীট শোভিত নগরের পথ ও রমণীদের অট্টালিকা ছেড়ে কোনো মালভূমিতে বর্ষিত হও, যেখানে তোমার একটি বিন্দুও সোনার মতো দামী। নগরে (নগরবাসীরা) পংকভয়ে তোমার নিন্দা করবে। তোমার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে সেখানে। তার চেয়ে তুমি গ্রামে যাও। সেখানে উল্লাসভরে শিশুরা (তোমার জলে) কেলি করবে।

তারপর কবি পাখিদের স্বাধীনবৃত্তি, অসুন্দর সত্ত্বেও কোকিলের সুমিষ্ট স্বর, মৌমাছির মধুকর বৃত্তি, প্রকৃতির বিবিধ ঋতুপরিবর্তন, বৃক্ষ, শমীলতা প্রভৃতির গুণাবলি উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন।

বর্তমান জনজীবনে বিজ্ঞানের কুপ্রভাব প্রসঙ্গে কবি বলেছেন- ব্যাধ যেমন বাঁশির সুরের দ্বারা হরিণকে মোহিত করে তারপর হত্যা করে, তেমনি বিজ্ঞান মূঢ়বুদ্ধি মানুষকে মোহিত করছে। তারপর কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিশেষ বিশেষ কার্যক্ষমতার জন্য শূকর, বিঁছে সরীসৃপ এবং বিভিন্ন প্রাণীর সম্বোধন করেছেন। বর্তমান সময়ে ক্রিকেটের প্রতি তরুণ প্রজন্মের উন্মাদনা লক্ষ্য করে তিনি হাস্যরসের অবতারণা করেছেন।

অন্যান্য শতকগুলির মতো এই শতককাব্যেও কবি রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের নিন্দা করেছেন-

> ন বাণিজে নাধ্যযনে গতিস্তে কলাসু নোদ্যগচযে রুচির্বা।
> অলং নু সন্তপ্য তথাপি বত্স যতস্ব তে রাজনযেঽস্তি সর্বম্॥
> যদি বিমানসুখেঽস্তি কুতূহলম্ যদি চ শাসিতুমিচ্ছসি ভূতলম্।
> ঋজুপথং প্রবিহায সমাচর ত্বমপি রাজনযং প্রিযবৎসক॥[২৮]

বৎস! ব্যবসা, অধ্যয়ন, বিবিধ কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে যদি রুচি না থাকে, তবুও সন্তাপ করার কিছু নেই। কারণ রাজনীতিতে সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে। যদি বিমানযাত্রার বাসনা থাকে, যদি পৃথিবী শাসনের ইচ্ছা থাকে, তাহলে রাজনীতির সহজ পথে হাঁটো।

উৎকোচ প্রথা, ক্ষমতা দখলের লড়াই, সংস্কৃত ভাষার প্রতি অবহেলা প্রভৃতি নিন্দনীয় চিত্তবৃত্তি এবং সামাজিক অপরাধগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে কবি বৃক্ষ, বীজ, পশু, পক্ষীর দোষ-গুণের উল্লেখ করেছেন।

মাতৃভূমি, প্রয়াগ তীর্থ, নর্মদা-যমুনা, সুরবাণী সংস্কৃত, মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতির বন্দনা পূর্বক সম্বোধন করেছেন।

রেলগাড়িকে সাম্যের স্থান মনে হয়েছে কবির। কারণ এর ভিতরে ধনী-দরিদ্র সকলেই একত্র অবস্থান করতে পারে। এই অদ্ভুত যানে মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমায়, আর যান অবিরাম চলতে থাকে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র ০৬.০৩. ১৯৮৭ সালে, সন্ধ্যায় এই কাব্যটির রচনা সম্পূর্ণ করেন-

মার্চমাসদিনে ষষ্ঠে সপ্তাশীতিমিতেঽব্দে।
সম্বোধনশতী সেযং সাযং সম্পূর্যতে মযা॥[২৯]

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু সর্বদাই সমাজ ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কেবল একেকটি রচনার ও বক্তব্যের আঙ্গিক পরিবর্তিত হয়েছে। *অভিরাজসপ্তশতীতেও* তার ব্যত্যয় হয়নি। *নব্যভারতশতকে* কবি স্পষ্টভাবে স্বার্থপরতা, নীচতা, আত্মদৈন্য, জাতীয়তাবোধের অভাব, বঞ্চনা প্রভৃতি মানুষের চারিত্রিক দোষগুলির নিন্দা করেছেন। আবার *চতুর্থীশতকে* এই বক্তব্যগুলিকেই বক্র-বাগভঙ্গির দ্বারা বলেছেন। *সুভাষিতোদ্ধারশতকেও* কবি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার দ্বারা স্ববক্তব্যের উপস্থাপন করেছেন।

কবির কাব্যে আর একটি উল্লেখ্য দিক হল, তিনি ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতি আপন আস্থা রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই বিশ্বকে পথ দেখাবে। কবি বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, সাম্যাবাদে বিশ্বাসী।

সংস্কৃত ভাষাকে কবি ভারতীয় সংস্কৃতির আধার বলেছেন। তাঁর মতে এই সংস্কৃতের জন্যই বিশ্ব ভারতবর্ষকে চিনেছে। ভারতীয় জনজীবন সম্বন্ধে তাদের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। তাই এই সংস্কৃত যতদিন থাকবে, ততদিনই ভারতের সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকবে। ততদিনই বহির্বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষ সম্মাননা লাভ করবে।

অন্ত্যটীকা

---

১. নব্যভারতশতক ১

২. তদেব, ১৭

৩. সাম্যবাদী ন কোঽপ্যদ্য ন স্বতন্ত্রো ন সোশলঃ।
কাংগ্রেসীযোঽথবাঽন্যোবা জনতাদলসমর্থকঃ॥
হিন্দূকুলসমুত্নো মুস্লিমানুপসেবতে।
কেবলং মতপত্রায় কেবলং হিনকারণাত্॥
মিথ্যাভিনযকর্মাণো মিথ্যাপ্রণযদর্শিনঃ।
বর্তমানসমাজস্যাভিনেতারো বিধাযকাঃ॥ তদেব, ২৩, ২৫, ৩২

৪. ন রাষ্ট্রং ধ্রিযতে সৈন্যৈঃ ন চাপি নেতৃমণ্ডলৈঃ।
বিদ্যযা ধ্রিযতে রাষ্ট্রং ধ্রিযতে জ্ঞানরাশিভিঃ॥ তদেব, ৫৬

৫. তদেব, ৯৮

৬. মাতৃশতক ১

৭. তদেব, ৬,৭

৮. তদেব, ৩৬

৯. তদেব, ১০৩

১০. প্রভাতমঙ্গলশতক ১

১১. তদেব, ৬৫

১২. তদেব, ৮১

১৩. তদেব, ৮৬

১৪. তুষ্যন্তু নাম যদি মাং নিতরাং বিনিন্দ্য
মিথ্যাকলঙ্কবচনৈরপি বা সভাজ্য।
কেচিত্তদেব মম জন্মকৃতার্থতা স্যাত্
তেষাং কৃতে ভবতু মে নবসুপ্রভাতম্॥ তদেব, ৯৪

১৫. নামূলং কবযামি বচ্মি নিভৃতং নো বাঽনপেক্ষং ক্বচিত্
নো কীর্ত্যৈন শিবেতরক্ষতিকৃতে নার্থায কাব্যং বৃণে।
কান্তাসম্মিতদেশনায ন যুনঃ সদ্যো রসাবাপ্তযে
নিস্স্বার্থং চ পরিভ্রমণ ভ্রমকরস্সোঽহং বিরৌম্যাত্মনা॥
রাত্রিজাগরসম্ভূতং কাব্যমেতন্ময়া কৃতম্।
আস্তিকানাং মুমুক্ষূণাং প্রৰোধায ন কেলযে॥ তদেব, ১০১, ১০২

১৬. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩

১৭. তদেব, ৮৯, ১০০

১৮. তদেব, ৯, ২৬

১৯. তদেব, ২

২০. তদেব, ৭

২১. তদেব, ৫৪, ৫৫

২২. কস্মৈচিদত্র নাক্ষেপঃ কস্যাপি নাবমাননা।
মনোরঞ্জনমাত্রায কৃত এষ পরিশ্রমঃ॥ তদেব, ৪

২৩. চতুর্থীশতক ২,৩

২৪. তদেব, ২৬

২৫. ভারতদণ্ডক পদ্য ৪

২৬. সম্বোধনশতক ৯৯

২৭. তদেব, ৩

২৮. তদেব, ৪৮,৪৯

২৯. তদেব, ১০০

চতুর্থ অধ্যায়

অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ভারতীয় সভ্যতায় অলংকারশাস্ত্রের ধারণা সুপ্রাচীন। মহর্ষি ভরতের সময়কাল থেকে কাব্যশাস্ত্রের অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। মানব-শরীর পর্যবেক্ষণ করে সৌন্দর্যচেতা মানুষ যেমন বস্ত্র, অলংকার, অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতির সুচারু তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, সেইরকম কাব্যতাত্ত্বিকগণও কাব্যকে পর্যবেক্ষণ করে তার সৌন্দর্য বিধায়ক বিবিধ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। সৌন্দর্য-চেতনা একটি মানসিক ব্যাপার। কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রের দ্বারা এর সর্বজনগ্রাহ্য স্বরূপ পাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক একই কথা কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই কাব্যতত্ত্বের আলোচনা অনেক প্রাচীন হলেও আলংকারিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

নারী-অবয়বের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অতিক্রম না করে যখন বাহ্যিক অলংকারাদি বিন্যস্ত হয়, তখন তা আরও বেশি রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়। সেরকম কাব্যের মূলভূত রসের অনুকূল শব্দ, অর্থ, অলংকার, রীতি প্রভৃতির প্রয়োগে কাব্য সহৃদয়শ্লাঘ্য সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়। তাই অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি মতবাদের চেয়ে রসবাদ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ রসই হল কাব্যের আত্মা।

তবে দোষ-গুণ প্রভৃতি যেমন মানবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বস্তু, সেইরকম কাব্যেরও কিছু উৎকর্ষ-অপকর্ষ রয়েছে। শব্দার্থময় কাব্যের বাহ্য ও আভ্যন্তরে বিশেষে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দোষ-গুণ নির্ণীত হয়। শব্দার্থময় রচনা কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কাব্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ স্বীকৃত হয়- এইসবের আলোচনা রয়েছে অলংকারশাস্ত্রে। তাই কবি ও সহৃদয় পাঠক- এই উভয়েরই অলংকারশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

গবেষণা-প্রবন্ধের আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয় হল রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত কাব্যগুলির কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা। এই অধ্যায়ে কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ, রীতি, রস, ধ্বনি প্রভৃতির ভিত্তিতে কাব্যমূল্য বিচার্য।

৪.১ ছন্দো বিশ্লেষণ:

আহ্লাদার্থক চদ্ বা ছদ্ ধাতু [চন্দ্ + অস্ (অসুন্) কর্তৃবাচ্যে চ এর স্থানে ছ আদেশ] থেকে *ছন্দোস্* শব্দের নিষ্পত্তি। *সিদ্ধান্তকৌমুদী* অনুসারে *চন্দয়তি হ্লাদয়তি ইতি ছন্দঃ*। অর্থাৎ

যা আনন্দ বিধান করে বা আহ্লাদিত করে, তা'ই হল ছন্দো। এছাড়া অপসারণ, সংবরণ বা আচ্ছাদন অর্থেও চুরাদিগণীয় ছদ্ বা ছদি ধাতু প্রযুক্ত হয়ে থাকে। *ছান্দোগ্যোপনিষদ* অনুসারে দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যখন ত্রয়ীবিদ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা নিজেদেরকে ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন।[১] যাস্কাচার্যও অনুরূপ লক্ষণ করেছেন- *ছন্দাংসি ছাদনাত্*।[২]

সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যের প্রাক্কালে পদ্যরচনায় ছন্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ ছিল। বৈদিক ঋষিগণ মন্ত্রোচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। কারণ অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে যজমানের উপকারের পরিবর্তে অপকার সাধিত হতে পারে। ছন্দের দ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণসাম্য, ধ্বনিমাধুর্য, বিরামস্থান প্রভৃতি সাধিত হয়। তাই *পাণিনীয়-শিক্ষায়* ছন্দোকে বেদের পদদ্বয় বলা হয়েছে।[৩] এই ছন্দো ষড়বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম। বৈদিক সংহিতায় বিপুল পদ্যভাগে ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ তথা উপনিষদগুলিতে ছন্দো শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।[৪] *ঋক্-প্রাতিশাখ্য, শ্রৌতসূত্র,* কাত্যায়নের *সর্বানুক্রমণী, নিদান* ও *উপনিদানসূত্র* প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদিক ছন্দোবিষয়ক আলোচনা রয়েছে। এছাড়া বেদের ভাষ্যকারগণ প্রতিটি সূক্তের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্দিষ্ট মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, দেবতা ও ছন্দের উল্লেখ করেছন।

ঋগ্বেদ সর্বানুক্রমণীতে (কাত্যায়ন) ছন্দের লক্ষণ করা হয়েছে- *যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ*।[৫] এখানে অক্ষরসংখ্যার ভিত্তিতে ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে। পিঙ্গলের 'ছন্দঃ' এই অধিকার সূত্রের বৃত্তিতে হলায়ুধ বলেছেন- *ছন্দঃ শব্দেন অক্ষরসংখ্যাবত্ ছন্দোঽত্রাভিধীয়তে*।[৬] তবে প্রাচীনকাল থেকেই অক্ষর ও মাত্রা- এই উভয়ের ভিত্তিতে ছন্দো নির্ণয়ের রীতি প্রচলিত ছিল।

বেদের সাতটি প্রধান ছন্দো, যথা- গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। এই সাতটি ছন্দো আবার আর্ষী, দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্য, যজুঃ, সাম্নী এবং ব্রাহ্মী ভেদে বিভক্ত। বৈদিক ঋষিদের প্রিয় ছন্দো হল উষ্ণিক। এই ছন্দোগুলি ছাড়াও সাতটি অতিছন্দো ও সাতটি বৃহচ্ছন্দো স্বীকৃত হয়েছে। সাতটি অতিছন্দো যথাক্রমে- অতিজগতী, শক্করী, অতিশক্করী, অষ্টি অত্যষ্টি, ধৃতি ও অতিধৃতি। বৃহচ্ছন্দোগুলি হল- কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি সংকৃতি অতিকৃতি এবং উৎকৃতি। এভাবে মোট একুশটি বৈদিক ছন্দো ধরা হয়।

প্রাচীনকাল থেকে ছন্দোপ্রয়োগের বাহুল্য দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে অনুশীলনের জন্য ছন্দোশাস্ত্রও বর্তমান ছিল। লিখিত আকারে না থাকলেও শ্রুতিরূপে ছিল। ঋষি পিঙ্গল তাঁর ছন্দো-বিষয়ক গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী বেশ কয়েকজন ছন্দোশাস্ত্রকারের নামোল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের আদি প্রবক্তা আচার্য পিঙ্গল। পিঙ্গলের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক। তাঁর ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থের নাম *ছন্দোসূত্র* বা *ছন্দোবিচিতি*। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম সূত্র পর্যন্ত বৈদিক ছন্দো এবং পরবর্তী অংশে লৌকিক ছন্দের আলোচনা রয়েছে। পিঙ্গল ছন্দের দৈব উৎপত্তিবাদের কথা বলেছেন। পিঙ্গলের *ছন্দোসূত্র* পরবর্তীকালে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পিঙ্গলের *ছন্দোসূত্রের* অনুসরণে নারায়ণ ও চন্দ্রশেখর যথাক্রমে *বৃত্তোক্তিরত্ন* ও *বৃত্তিমৌক্তিক* রচনা করেছেন। অনেকে *বৃত্তিমৌক্তিককে* পিঙ্গলের *ছন্দোসূত্রের* বার্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পিঙ্গলের পরে আচার্য ভরতের নাম উল্লেখযোগ্য। *নাট্যশাস্ত্রের* পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে ছন্দোবিষয়ক আলোচনা রয়েছে। ভরতের আলোচনায় পিঙ্গলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। *অগ্নিপুরাণের* ৩২৮ থেকে ৩৩৫তম অধ্যায় পর্যন্ত লৌকিক ছন্দের আলোচনা রয়েছে। *অগ্নিপুরাণে* ছন্দের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। পিঙ্গলের *ছন্দোসূত্রের* পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছন্দো-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ হল জয়দেব রচিত *জয়দেবচ্ছন্দ*। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতক। জয়দেব তাঁর গ্রন্থের কিছু অংশে পিঙ্গলকে অনুসরণ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই স্বকীয় মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। পিঙ্গলের গ্রন্থে সূত্রাকারে ছন্দোলক্ষণ আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে জয়দেব একক বাক্যের দ্বারা ছন্দোগুলির লক্ষণ প্রদান করেছেন। জয়দেব অধ্বন্ এবং অন্যান্য আরও ছয়টি প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি মাত্রাবৃত্ত, সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত, বিষমবৃত্ত এবং বর্ণবৃত্ত ছন্দের আলোচনা করেছেন। মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে প্রচলিত একটি ছন্দোগ্রন্থ হল *শ্রুতবোধ*। এখানে মোট চুয়াল্লিশটি শ্লোকে বিবিধ ছন্দের আলোচনা বিধৃত হয়েছে। ছন্দের প্রদত্ত লক্ষণগুলিতে কাব্যিক দ্যোতনা রয়েছে। *শ্রুতবোধের* ভাষা সহজবোধ্য। কবি বলেছেন- তাঁর এই গ্রন্থ শ্রবণমাত্রই ছন্দোসমূহের লক্ষণ বোধগম্য হবে।[৭] জনাশ্রয় নামক এক ব্যক্তি *ছন্দোবিচিতি* শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাই গ্রন্থটির অপর নাম *জনাশ্রয়ী ছন্দোবিচিতি*। রচনাকারের সময়কাল আনুমানিক ৫৮০ থেকে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দ। এই গ্রন্থে সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত, বিষমবৃত্ত, জাতি, বৈতালীয়, আর্যা প্রভৃতি ছন্দের আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থকার ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ছন্দোশাস্ত্রকারদের

নামোল্লেখ করেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থের অনেক অংশে প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে। কালিদাসের রচনারূপে প্রচারিত অপর একটি গ্রন্থ হল *বৃত্তরত্নাবলী*। আবার অনেকের মতে এটি অষ্টাদশ শতকীয় রামচন্দ্র চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের রচনা। *ছন্দোবিচিতি* নামক অন্য একটি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থটি দণ্ডীর রচিত বলে প্রচারিত হলেও কীথ এটিকে ভামহের রচিত বলে মনে করেছেন। *ছন্দোবিচিতি* কোনো মৌলিক গ্রন্থ নয়, *ছন্দোশাস্ত্রের* নির্দেশক বা সহায়ক গ্রন্থ। কেদারভট্টের একটি রচনা হল *বৃত্তরত্নাকর*। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টিয় নবম শতক। মতান্তরে একাদশ শতক। ছয়টি অধ্যায়ে মণ্ডিত এই গ্রন্থে ১৩৬ টি ছন্দো আলোচিত হয়েছে। *ছন্দোশাস্ত্রের* অন্তর্গত গ্রন্থগুলির মধ্যে *বৃত্তরত্নাকরের* উপরে সর্বাধিক টীকা রচিত হয়েছে। জনার্দন, দিবাকর, শ্রীনাথ, রামচন্দ্র, নারায়ণ প্রমুখ টীকাকারদের টীকা রয়েছে এই গ্রন্থের উপর। খ্রিস্টিয় দশম শতকে হলায়ুধ পিঙ্গলের *ছন্দোসূত্রের* উপর বৃত্তি রচনা করেছেন। একাদশ শতকীয় কবি ক্ষেমেন্দ্রের ছন্দোশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ হল *সুবৃত্ততিলক* অথবা *সুবৃত্তিতিলক*। *সুবৃত্ততিলকে* চব্বিশটি লৌকিক ছন্দের উদাহরণসহ আলোচনা রয়েছে। এছাড়া এখানে বিভিন্ন রসের উপযোগী ছন্দোপ্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রথিতযশা সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কোন কবির কি প্রিয় ছন্দো- এইবিষয়ে ক্ষেমেন্দ্র আলোচনা করেছেন। যেমন- কালিদাসের প্রিয় ছন্দো মন্দাক্রান্তা, ভারবির প্রিয় বংশস্থবিল, ভবভূতির শিখরিণী, পাণিনির উপজাতি প্রভৃতি। লৌকিক সংস্কৃতে সর্বাধিক সমাদৃত ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থ হল আচার্য গঙ্গাদাসের *ছন্দোমঞ্জরী*। আচার্য গঙ্গাদাসের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতক (মতান্তরে একাদশ শতক)। *ছন্দোমঞ্জরী* সাতটি স্তবকে বিভক্ত। প্রথম স্তবকে মকারাদি গণ, লঘু-গুরু নির্ণায়ক সূত্র, যতি, সমবৃত্তের নাম ভেদ প্রভৃতি, দ্বিতীয় স্তবকে সমবৃত্ত ছন্দের আলোচনা, তৃতীয় স্তবকে অর্ধসমবৃত্ত, চতুর্থ স্তবকে বিষমবৃত্তের আলোচনা, পঞ্চম স্তবকে বক্রছন্দের আলোচনা, ষষ্ঠ স্তবকে মাত্রাবৃত্তের আলোচনা এবং সপ্তম স্তবকে গদ্যছন্দের আলোচনা রয়েছে। *ছন্দোমঞ্জরীতে* সর্বসমেত ২৮০টি ছন্দের আলোচনা রয়েছে।

আচার্য গঙ্গাদাস ছন্দোকে মূলত দুইভাগে ভাগ করেছেন, যথা- বৃত্ত ও জাতি। অক্ষর গণনার ভিত্তিতে হয় বৃত্ত। আর মাত্রার সংখ্যা অনুসারে হয় জাতি। বৃত্তছন্দের তিনটি ভাগ যথা- সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত এবং বিষমবৃত্ত।[৮] মাত্রাও অক্ষর বর্জিত নয়। অক্ষর উচ্চারণের সময়-ভিত্তিক পরিমাপই হল মাত্রা। গঙ্গাদাস সমবৃত্ত প্রভৃতির লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন-

সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্ধসমং পুনঃ॥

আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদন্তুর্য্যা দ্বিতীযকম্।

ভিন্নচিহ্ন চতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্॥[৯]

অর্থাৎ যে ছন্দের চারটি চরণে সমপরিমাণ অক্ষর থাকে, তাকে বলা হয় সমবৃত্ত। যার প্রথম ও তৃতীয় পাদের, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের অক্ষরসংখ্যা সমান হয়, তাকে বলে অর্ধসমবৃত্ত। আর যে ছন্দের চারটি চরণই ভিন্নসংখ্যক অক্ষরে নিবদ্ধ হয়, তাকে বলা হয় বিষমবৃত্ত।

আচার্য গঙ্গাদাস ছন্দোনির্ণায়ক দশটি গণের উল্লেখ করে সেগুলির লক্ষণ প্রদান করেছেন।[১০] দশটি গণ হল যথাক্রমে- ম, ন, ভ, য, জ, র, স, ত, ল এবং গ। লঘু-গুরু অক্ষরের ক্রম অনুসারে গণগুলি এইভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে-

ম = S S S	ন = I I I
ভ = S I I	য = I S S
জ = I S I	র = S I S
স = I I S	ত = S S I
ল = I	গ = S

সংস্কৃত পদ্যকাব্য পাঠকালে যতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বহু অক্ষর সমন্বিত শ্লোক এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা কষ্টকর। অন্যদিকে পদ্যকাব্যের যথাস্থানে উচ্চারণ-বিরতি না হলে কাব্য শ্রুতিমধুর শোনায় না। এই বিরতির স্থানগুলিকে ছন্দোশাস্ত্রে যতি বলা হয়। ছন্দোকারগণ ছন্দের আলোচনাবসরে যতির গুরুত্ব স্মরণে রেখেছেন। আচার্য গঙ্গাদাস যতির লক্ষণ করেছেন-

যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।

সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছযা॥[১১]

অর্থাৎ যেখানে জিহ্বা স্বেচ্ছায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, তাকে কবিগণ যতি বলেন। বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি যতিরই পর্যায় বাচক শব্দ। *ছন্দোমঞ্জরী*কার বিবিধ সংখ্যাবাচক শব্দের দ্বারা ছন্দে যতি নির্দেশ করেছেন। যেমন- *শালিনী* ছন্দের লক্ষণ: *মাত্তৌ গৌচেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ*।[১২] 'বেদ' ও

'লোক' এই দুটি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে চার (চতুর্বেদ) ও সাত (সপ্তলোক) সংখ্যাকে নির্দেশ করে। তাই *শালিনী* ছন্দের প্রতিটি পাদের চতুর্থ অক্ষরে এবং পরবর্তী সপ্তম অক্ষরে বা পাদান্তে যতি থাকে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দোসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আচার্য গঙ্গাদাসকৃত *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের ছন্দোলক্ষণগুলিকে ছন্দোনির্ণায়ক সূত্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছে। লঘুবর্ণ ও গুরুবর্ণ নির্দেশের জন্য যথাক্রমে 'I' ও 'S' চিহ্ন ব্যবহার করা হল। দণ্ডকের লক্ষণ-সঙ্গতির জন্য কেদারভট্টের *বৃত্তরত্নাকরের* লক্ষণ গৃহীত হয়েছে।

আচার্য ক্ষেমেন্দ্র সর্বপ্রথম রস ও বর্ণনীয় বিষয়ের ভিত্তিতে ছন্দোপ্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁর মতে কাব্যাদি চতুষ্টয়ের (শাস্ত্র, কাব্য, শাস্ত্রকাব্য, কাব্যশাস্ত্র) বিভাগ সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি রস ও বর্ণনীয় বিষয় অনুসারে সকল ছন্দের যথাযথ ব্যবহার করবেন।[১৩] অনেক সময় কবি-প্রতিভার দ্বারা কিছু ছন্দো বিশেষত্ব লাভ করে। তাঁদের কাব্যে ছন্দো এমনভাবে প্রযুক্ত হয়, যেন কোনো প্রভু অযোগ্য ভৃত্যের দ্বারা সঠিক কার্য সম্পাদন করিয়ে নিয়েছেন।[১৪] তথাপি স্বেচ্ছায় অস্থানে ছন্দের প্রয়োগ কটিতটে ধারণযোগ্য মেখলা কণ্ঠে পরিধানের মতোই অশোভনীয় হয়। অর্থাৎ প্রতিভার দ্বারা যদিও অস্থানে প্রযুক্ত ছন্দোও কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধন করতে পারে, তবু বিশেষ কারণ ব্যতীত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো উচিত নয়।[১৫]

অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যভিত্তিক ছন্দোবিশ্লেষণ:

নব্যভারতশতক: অনুষ্টুভ্।

মাতৃশতক: বসন্ততিলক (শ্লোক নং ১-৫), দ্রুতবিলম্বিত (শ্লোক নং ৬, ৭), অনুষ্টুভ্ (শ্লোক নং ৮-১০১), শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক নং ১০২, ১০৩)।

প্রভাতমঙ্গলশতক: বসন্ততিলক (শ্লোক নং ১-১০০), শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক নং ১০১), অনুষ্টুভ্ (শ্লোক নং ১০২-১০৪)।

সুভাষিতোদ্ধারশতক: অনুষ্টুভ্।

চতুর্থীশতক: অনুষ্টুভ্।

ভারতদণ্ডক: চূর্ণক।

সম্বোধনশতক: উপজাতি (শ্লোক নং ১-১২, ১৭-২১, ২৫, ২৮, ৫৯-৬২, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৯২), উপেন্দ্রবজ্রা (শ্লোক নং ১৩-১৬, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৪৮, ৫৩-৫৫, ৫৮, ৬৯, ৯৯), দ্রুতবিলম্বিত (শ্লোক নং ৪৯, ৭৪), বংশস্থবিল (শ্লোক নং ২৪, ৪৬, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৮৬-৯১), ভুজঙ্গপ্রয়াত (শ্লোক নং ২৯, ৪০), তোটক (শ্লোক নং ৪১-৪৫, ৭২, ৭৩), বসন্ততিলক (শ্লোক নং ৫০-৫২, ৫৬, ৫৭), মালিনী (শ্লোক নং ৮০, ৮১), শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক নং ৯৪, ৯৫), শিখরিণী (শ্লোক নং ৯৬-৯৮)

৪.১.১ অনুষ্টুভ ছন্দো: *অভিরাজসপ্তশতীতে* প্রযুক্ত ছন্দোগুলির মধ্যে অনুষ্টুভের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। *ভারতদণ্ডক* ও *সম্বোধনশতক* ব্যতীত বাকী পাঁচটি শতককাব্যেই কবি অনুষ্টুভ্ ছন্দো ব্যবহার করেছেন।

দেবৈরপি কৃতো যত্র প্রযত্নো জন্মহেতবে।

জযতাদ্ ভারতী ভূমিঃ ভুক্তিমুক্তিবিধাযিনী॥[১৬]

অর্থাৎ যেইস্থানে জন্মলাভের জন্য দেবতাগণও প্রযত্ন করেন, সেই ভুক্তি-মুক্তি বিধায়িনী ভারতভূমির জয়।

S S I I I S S I I S I S I S I S

দে বৈ র | পি কৃ তো | য ত্র প্র য ত্ন | জ ন্ম হে | ত বে।

I I S S I S S I S I S I I S I S

জ য তাদ্ | ভা র তী | ভূ মি ভু ক্তি মু | ক্তি বি ধা | যি নী

আলোচ্য শ্লোকে চারটি পাদের পঞ্চম বর্ণগুলি (কৃ, ন্ম, র, বি) লঘু হয়েছে। ষষ্ঠ বর্ণগুলি (তো, হে, তী, ধা) গুরু হয়েছ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ (ত, যি) লঘু হয়েছে। আচার্য গঙ্গাদাস অনুষ্টুভ্ ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থযোঃ।

গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষ্বনিযমো মতঃ॥[১৭]

অর্থাৎ যে ছন্দের সমস্ত পাদের পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু হয়, তাকে অনুষ্টুভ ছন্দো বলে। এই বর্ণগুলি ছাড়া অন্যান্য বর্ণের লঘু-গুরুক্রমের

কোনো নিয়ম নেই। অনুষ্টুভ ছন্দের প্রতিটি পাদে আটটি করে অক্ষর থাকে। পাদান্তে যতি থাকে। অতএব *দেবৈরপি.....* প্রভৃতি শ্লোকে অনুষ্টুভ ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে।

ক্ষেমেন্দ্রের মতে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত, কর্তব্য কর্মের উপায় কথন অথবা উপদেশের উদ্দেশ্যে নির্মিত গ্রন্থে অনুষ্টুভ ছন্দের ব্যবহার করা যেতে পরে।[১৮] আলোচ্য শতকসংগ্রহে সরাসরি নীতি উপদেশ না থাকলেও নিন্দার মাধ্যমে সমাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় কল্যাণের নিমিত্ত কর্তব্য কর্মের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট অনুষ্টুভ ছন্দের ব্যবহারে কাব্যে শব্দ ও অর্থের সহজবোধ্যতা অক্ষুন্ন রয়েছে।

৪.১.২ বসন্ততিলক:

ত ভ জ জ গ গ

S S I S I I I S I I S I S S

পূ তাঽ ভি | রা জ জ | ন নী য | দি না ভ | বি | ষ্যত্

জাযেত হন্ত ভুবি জাতু কুতোঽভিরাজঃ।

তস্মাত্ততোঽপি মহতীং মহসাং সবিত্রী-

মম্বাং স্বজীবিতগতিং নিতরাং প্রপদ্যে॥[১৯]

যদি অভিরাজ-জননী না থাকতেন, তবে অভিরাজের (কবির) কী হতো! তাই সবিত্রীকে অনেক বেশি মহান বলে মনে হয়, যিনি আমার মাতাকে সর্বদা জীবিত রেখেছেন।

আচার্য গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- *জ্ঞেযং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ*।[২০] অর্থাৎ যে ছন্দে যথাক্রমে ত, ভ, জ, জ, গ, গ এই গণগুলি থাকে, তাকে বসন্ততিলক ছন্দো বলা হয়। এটি একটি চতুর্দশাক্ষর ছন্দো।

উদ্ধৃত শ্লোকেও ত, ভ, জ, জ, গ, ও গ এই গণগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। তাই এটি একটি বসন্ততিলক ছন্দের উহাহরণ।

সুবৃত্ততিলক অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের অন্তিম বর্ণের আগের বর্ণ যদি আকারান্ত হয় এবং ওজোগুণের অনুকূল বর্ণবিন্যাস থাকে, তাহলে বসন্ততিলক ছন্দের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে।[২১] এছাড়া বীর ও রৌদ্র রসের সংমিশ্রণস্থলে বসন্ততিলক ছন্দো প্রযুক্ত হলে তা কাব্যের শোভা

বর্ধন করে।[২২] কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে ওজোগুণ প্রযুক্ত হয়নি, মাধুর্য প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে বীর বা রৌদ্ররসও প্রযুক্ত হয়নি, শান্তরস প্রযুক্ত হয়েছে। তবে, শ্লোকের ভাবময়তা রসানুবর্তী হয়েছে।

আবার *প্রভাতমঙ্গলশতকের* ওজোগুণান্বিত শ্লোকগুলিতে বীর ও রৌদ্ররস রয়েছে। এখানেও কবি বসন্ততিলক ছন্দের ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-

উল্লঙ্ঘ্য নক্রমকরোল্লসিতং পযোধিং সঞ্চূর্ণ্য গোপুরগবাক্ষবিটংকমালাম্।

রামায দীযত ইতি প্রদহন্ বচোভির্লংকাং তনোতু কপিরাট্ সুখসুপ্রভাতম্॥[২৩]

৪.১.৩ দ্রুতবিলম্বিত:

ন ভ ভ র

I I I S I I S I I S I S

ন হি বি | র ঞ্চি প | দং ন শি | বা স্প দং ন চ মুকুন্দপদং তপসা বৃণে।

ননু বৃণে পদমাস্পদমঞ্জসা যদি তু মাতুরদোঽদ্রিভুবোঽথবা॥[২৪]

গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন- *দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ*।[২৫]

অর্থাৎ যে ছন্দে যথাক্রমে ন, ভ, ভ, র এই গণগুলি থাকে, তাকে *দ্রুতবিলম্বিত* ছন্দো বলা হয়। দ্রুতবিলম্বিত দ্বাদশাক্ষর ছন্দো। আলোচ্য শ্লোকের প্রতি পদে ন, ভ, ভ, র এই গণগুলি রয়েছে। অতএব এটি *দ্রুতবিলম্বিত* ছন্দো।

ক্ষেমেন্দ্র এই ছন্দে পদ্যের আদিতে দ্রুত উচ্চারণের জন্য লঘু বর্ণ এবং শেষে বিলম্বিত বা গুরু বর্ণের ব্যবহারের কথা বলেছেন।[২৬] আলোচ্য শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রথম আদি তিনটি বর্ণই লঘু হয়েছে এবং অন্তিম একটি করে বর্ণ গুরু হয়েছে।

৪.১.৪ শার্দূলবিক্রীড়িত:

ম স জ স ত ত গ

S S S I I S I S I I I S S S I S S I S

না মূ লং | ক ব যা | মি ব চ্মি | নি ভৃ তং | নো বাঽ ন | পে ক্ষ ক্ষ | চিত্

নো কীর্ত্যৈ ন শিবেতরক্ষতিকৃতে নার্থায কাব্য বৃণে।

কান্তাসম্মিতদেশনায ন যুনঃ সদ্যো রসাবাপ্তযে

নিস্পার্থং চ পরিভ্রমন্ ভ্রমকরস্পোঽহং বিরৌম্যাত্মনা॥[২৭]

(আমি অর্থাৎ কবি) অহেতুক কাব্যরচনা করি না বা বলি না, কারুর প্রশস্তির জন্য কিংবা নিজ অমঙ্গল নাশের জন্য এই কাব্য নয়। কান্তাসুলভ উপদেশ দানের জন্যও আমি কাব্য রচনা করি না, কেবল যুবাদের রসাস্বাদনের জন্য এবং ইতস্তত ভ্রমণ জনিত নিজ ক্লান্তি লাঘবের জন্য এই কাব্য রচনা।

আচার্য গঙ্গাদাস শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ করেছেন- *সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীডিতম্*।[২৮] অর্থাৎ যে ছন্দে যথাক্রমে ম, স, জ, স, ত, ত, গ এই গণগুলি থাকে, তাকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দো বলা হয়। এটি একটি ঊনবিংশতি অক্ষর সমন্বিত ছন্দো।

আলোচ্য শ্লোকে ম, স, জ, স, ত, ত, গ এই গণগুলি ক্রমান্বয়ে রয়েছে। তাই এটি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের উদাহরণ।

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দো সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্রের বক্তব্য হল প্রতি চরণের আদ্যাক্ষর আকারান্ত, এবং পাদের অন্তিম অক্ষর বিসর্গযুক্ত হলে এই ছন্দো গুণান্বিত হয়। সেই বিসর্গ যদি আবার অবিকল থাকে অর্থাৎ বিসর্গের স্থানে ও-কার বা উ-কার না হলেও শার্দূলবিক্রীড়িত শোভা বর্ধন করে। এর বিপরীত হলে দোষাবহ হয়। এছাড়া প্রথম দুটি চরণ সন্ধি বা সমাসের দ্বারা যুক্ত না থাকলে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ সন্ধি বা সমাসের দ্বারা যুক্ত থাকলে এই ছন্দো শোভনীয় হয়।[২৯]

আলোচ্য শ্লোকের দুটি পাদের আদ্যাক্ষর আকারান্ত কিন্তু দ্বিতীয় চরণের অন্তিম বর্ণ বিসর্গযুক্ত হলেও অন্যান্য চরণগুলিতে বিসর্গ নেই। বিসর্গটি অবিকল রয়েছে। এখানে চারটি চরণই পরস্পর আলাদা অর্থাৎ সন্ধি বা সমাসের দ্বারা যুক্ত নয়।

ক্ষেমেন্দ্রের মতে রাজন্যবর্গের শৌর্য, বীর্যাদির প্রশংসায় শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের প্রয়োগ করা উচিত।[৩০] এই সংকলনের কাব্যগুলিতে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর মাতা অভিরাজীর, কাব্য রচনায় তাঁর নিজস্ব সংস্কার প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে এই ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

৪.১.৫ উপেন্দ্রবজ্রা:

জ ত জ গ গ

I S I S S I I S I S S

গু রো র | পি ত্বং সু | ম হান্ হি | তৈ | ষী কুদৃষ্টিসংশোধনরীতিদক্ষঃ!

যদন্ধতাং চারুদৃশোরপোহ্য সদোপনেত্র! প্রতনোষি দৃষ্টিম্॥ ১৩

শ্লোকার্থ হল হে উপনেত্র (চশমা)! তুমি কুদৃষ্টি সংশোধনের ক্ষেত্রে (বিদ্বান্) গুরুর চেয়েও অধিক মহান। কারণ অন্ধকারকে অপসারণ করে তুমি দৃষ্টির চারুতা বৃদ্ধি করো।

উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে আচার্য গঙ্গাদাস বলেছেন- *উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা*।[৩১] অর্থাৎ যে ছন্দের প্রথম অক্ষর লঘু হয় এবং অন্যান্য বর্ণগুলি ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের অনুরূপ হয়, তাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো বলে। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে যথাক্রমে ত, ত, জ, গ, গ গণগুলি থাকে। উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দে আদ্যক্ষর লঘু হয়। ফলে আদিগণ 'ত' এর পরিবর্তে 'জ' গণ হয় অর্থাৎ জ, ত, জ, গ, গ গণ হলে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো হয়।

আলোচ্য শ্লোকেও যথাক্রমে জ, ত, জ, গ, গ এই গণগুলি রয়েছে। অতএব এটি উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো।

৪.১.৬ উপজাতি:

জ ত জ গ গ

I S I S S I I S I S S

মৃ কা র | যো গে ন | মৃ তাঽ সি | নূ নং

জ ত জ গ গ

I S I S S I I S I S S

দু কা র | যো গে ন | চ দূ ষি | তা ন্তা।

জ ত জ গ গ

I S I S S I I S I S S

প্র বী ণ | লূ তাঽ সি | ল কা র | যো গাত্

ত ত জ গ গ

S S I S S I I S I S S

ত্ব ন্না ম | সূ ত্রং মৃ | দূ লে! স্ফু | ট স্মে॥[৩২]

আচার্য গঙ্গাদাস উপজাতি ছন্দের লক্ষণ করেছেন-

অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ পাদৌ যদীযাবুপজাতযস্তাঃ।

ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু বদন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম॥[৩৩]

অর্থাৎ যে পদ্যের দুটি পাদে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো প্রযুক্ত হয়, তাকে উপজাতি ছন্দো বলে। এরকম অন্যান্য দুটি ভিন্ন ছন্দের সমন্বয়েও উপজাতি ছন্দো হয়।

এই শ্লোকের প্রথম তিনটি পাদে উপেন্দ্রবজ্রা ও অন্তিম পাদে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দো রয়েছে। অতএব এখানে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের সহযোগে উপজাতি ছন্দো হয়েছে।

সম্বোধশতকের অন্যান্য কিছু শ্লোকে বিবিধ বিন্যাসে উপজাতি ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন- দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম পাদে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দো, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো রয়েছে। আবার তৃতীয় শ্লোকের প্রথম ও চতুর্থ পাদে উপেন্দ্রবজ্রা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে। *সম্বোধনশতকের* ৯২নং শ্লোকে উপেন্দ্রবজ্রা ও বংশস্থবিল ছন্দো-সহযোগে উপজাতি ছন্দো হয়েছে।

শ্রুতবোধে কৃত উপজাতি ছন্দের লক্ষণ হল-

যত্র দ্বযোরপ্যনযোস্তু পাদা ভবন্তি সীমন্তিনী চন্দ্রকান্তে।

বিদ্বদ্ভিরাদৈঃ পরিকীর্তিতা সা প্রযুজ্যতামিত্যুপজাতিরেষা॥[৩৪]

হে বিন্যস্তকেশী চন্দ্রকান্তি যার প্রথম ও তৃতীয় পাদে ইন্দ্রবজ্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দো থাকে, তাকে উপজাতি ছন্দো বলে। *শ্রুতবোধে* প্রদত্ত উপজাতির লক্ষণ

অনুসারে চারটি পদের মধ্যে কোনটিতে কি ছন্দো হবে- তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এই নিয়ম অনুসারে উপজাতি ছন্দের প্রয়োগ করেননি।

সুবৃত্ততিলক অনুসারে উপজাতি ছন্দো সংকর হলেও এর প্রথম চরণের প্রথম অক্ষর লঘু হওয়া উচিত।[৩৫] *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা সহযোগে উপজাতির সমস্ত শ্লোকে এই নিয়ম লক্ষ্যিত হয়নি।

উপজাতি ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন শৃঙ্গাররসের আলম্বনরূপী নায়িকার রূপ, বসন্তপ্রভৃতি ঋতু তথা ঋতুর বিবিধ অঙ্গের বর্ণনায় এই ছন্দো প্রযুক্ত হয়।[৩৬] *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে শৃঙ্গাররসের প্রয়োগ নেই। তবে *সম্বোধনশতকের* কিছু শ্লোকে (শ্লোক নং ১৫-১৯, ২৫, ২৮, ৬১-৬২, ৬৭-৬৮, ৭০-৭১) মেঘের বর্ষণ, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গ, বনপ্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য প্রভৃতির বর্ণনায় উপজাতি ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে।

৪.১.৭ বংশস্থবিল:

জ ত জ র

I S I S S I I S I S I S

ফ লে ন | মূ লে ন | সু মে ন | ছা য যা বিশুষ্কদেহেন চ সর্বতোমুখম্।

মহোপকারং জগতাং সমাদধত্ ত্বমেব শাখিন্ তনুষে কৃতার্থতাম্॥ ২৪

শ্লোকার্থ: হে বৃক্ষ! তুমি ফল, মূল, মধু, ছায়া, শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা সর্বতোভাবে জগতের উপকার সাধন করো।

গঙ্গাদাস বংশস্থবিল ছন্দের লক্ষণ করেছেন- *বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ*।[৩৭] অর্থাৎ যে ছন্দে যথাক্রমে জ, ত, জ, র এই গণগুলি থাকে, তাকে বংশস্থবিল ছন্দো বলা হয়।

ফলেন..... ইত্যাদি শ্লোকে যথাক্রমে জ, ত, জ, র এই গণগুলি রয়েছে। অতএব এখানে বংশস্থবিল ছন্দো হয়েছে।

সুবৃত্ততিলক অনুযায়ী বংশস্থ ছন্দে নিবদ্ধ শ্লোকে চরণের সংযোগ যদি কবির ঈপ্সিত হয়, তবে তা সন্ধির দ্বারা করতে হবে, সমাসের দ্বারা করা যাবে না। সন্ধি যদি বিসর্গস্থানীয় হয়,

তবে অতি উত্তম। আর সন্ধির সম্ভাবনা না থাকলে বিসর্গ স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হবে। এই ছন্দে পাদের অন্তে বিসর্গযুক্ত পদ থাকলে অধিক শোভা বর্ধন করে।[৩৮]

আলোচ্য শ্লোকে চরণগুলি পরস্পর বিযুক্ত। *মহোপকারং* পদে সন্ধি থাকলেও তা বিসর্গস্থানীয় নয়। পাদের অন্তেও বিসর্গ নেই। *সম্বোধনশতকে* বংশস্থবিল ছন্দে নিবদ্ধ শ্লোকগুলির কোনোটিতেই ক্ষেমেন্দ্র প্রদত্ত বিধানগুলির সর্বতোভাবে প্রয়োগ ঘটেনি।

৪.১.৮ ভুজঙ্গপ্রয়াত:

য য য য

I S S I S S I S S I S S

বি শা লে | ধ রা চ | ত্ব রে হ | ন্ত শে কুর্ন যে স্নেহসৌজন্যভাবৈর্বিহতুম্।

অহো রাবণাস্তে বিরোঢুং যতন্তে বিধুম্মঙ্গলং শুক্রমাত্মাভিমানৈঃ॥[৩৯]

আচার্য গঙ্গাদাসকৃত ভুজঙ্গপ্রয়াতের লক্ষণ হল- *ভুজঙ্গপ্রযাতং চতুর্ভির্যকারৈঃ*।[৪০] অর্থাৎ যে ছন্দে চারটি 'য' গণ হয়, তাকে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দো বলা হয়। এই শ্লোকের প্রতিটি পাদে চারটি করে 'য' গণ প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব এটি ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দো।

৪.১.৯ তোটক:

স স স স

I I S I I S I I S I I S

ত ব ভ | ক্ত জ না | বি ল স | ন্তি ন কিং শতশো ভুবি দিক্ষু বিদিক্ষু সুখম্।

নিকৃতাসি তথাপি যদি স্বগৃহে সুরভারতি তন্নু সহেঽথ কথম্॥[৪১]

হে সুরভারতী! তোমার ভক্তজন (সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি) বিশ্বের সর্বত্র সুখে কালাতিপাত করছেন। (অথচ সেই তুমি) স্বগৃহেই (ভারতবর্ষে) যদি উপেক্ষিত হও, তবে তা কীভাবে সহ্য করা যায়!

এই শ্লোকের প্রতিটি চরণে চারটি স গণ রয়েছে। গঙ্গাদাস তোটকের লক্ষণ করেছেন- *বদ তোটকমব্ধিসকারযুতম্*।[৪২] অর্থাৎ যে ছন্দের প্রতিটি চরণে চারটি করে 'স' গণ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তাকে তোটক ছন্দো বলে।

দোধক, তোটক, নর্কুট প্রভৃতি ছন্দে রচিত মুক্তক শোভনীয় হয়। রসের ভিত্তিতে এই ছন্দোগুলির কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োগস্থান নেই।[৪৩] ক্ষেমেন্দ্রের মতানুসারে সঙ্গীতের দ্রুত তাল-লয় যেমন শ্রোতার মনকে আন্দোলিত করে, তেমনই রুক্ষবর্ণের দ্বারা তোটক ছন্দো শ্রোতার মনকে ময়ূরের মতো নাচায়।[৪৪] কিন্তু *সম্বোধনশতকে* তোটক ছন্দে বিধৃত শ্লোকগুলিতে রুক্ষাক্ষর নেই বললেই চলে।

৪.১.১০ মালিনী:

ন ন ম য য

I I I I I I S S S I S S I S S

যু গ ন | য ন বি | তা নে সৌ | ম্য সি ন্ধু | র্দ যা যাঃ

হৃদি ভরতজনানাং ভূরিকল্যাণভাবঃ।

নবযুগরচনাযাঃ প্রৌঢশক্তিশ্চ পাণৌ

বিলসসি ননু রাষ্ট্রে নব্যঝাঁসীশ্বরী ত্বম্॥[৪৫]

হে নব্যঝাঁসীশ্বরী (কাব্য)! নয়নযুগলে অসীম দয়া, হৃদয়ে ভারতবাসীর কল্যাণভাব নিয়ে স্বহস্তে নবযুগ রচনার প্রবল শক্তি ধারণ করে এই রাষ্ট্রে অবতীর্ণ হও।

মালিনী ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে *ছন্দোমঞ্জরীতে* বলা হয়েছে- *ননমযযযূতেঽযং মালিনী ভোগিলোকৈঃ*।[৪৬] অর্থাৎ যে ছন্দের প্রতিটি চরণে ন, ন, ন, য, য এই গণগুলি থাকে, তাকে মালিনী ছন্দো বলা হয়। *ভোগীন্* শব্দের দ্বারা নাগকে বোঝায়। শাস্ত্রে অষ্টনাগের কথা বলা আছে। *লোক* বলতে সপ্তলোককে বোঝায়। অতএব এই ছন্দে প্রথম অষ্টমাক্ষরে এবং পরবর্তী সপ্তমাক্ষরে বা পাদান্তে যদি থাকে।

সুবৃত্ততিলক অনুযায়ী পাদান্তে (বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অন্তে) বিসর্গ না থাকলে মালিনী ছন্দো পুচ্ছহীন হরিণ অথবা পত্রহীন লতার ন্যায় অশোভনীয় হয়। প্রথম ও

দ্বিতীয় চরণে সমাস থাকলে মালিনী নিন্দনীয় হয়। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের মধ্যে সমাস থাকলে তা সুন্দর হয়। বীণার স্বরের সামান্য বেসুরো ধ্বনি যেমন সুর সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিকে উদ্বিগ্ন করে, সেইরকম মালিনী ছন্দে সামান্য সুরের ভুল অজ্ঞ মানুষকেও মর্মাহত করে।[৪৭] এছাড়া সঙ্গীতের শেষভাগে যেমন তালের দ্রুততা শ্রুতিমধুর হয়, তেমন দ্রুতগতির ছন্দো মালিনী সর্গের অন্তিমভাগে প্রযুক্ত হলে শোভা বর্ধন করে।[৪৮]

সম্বোধনশতকের ৮০ ও ৮১ নং শ্লোকে কবি মালিনী ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। ৮০ নং শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে বিসর্গ রয়েছে। তবে ৮১ নং শ্লোকের প্রথম পাদে বিসর্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। দুটি শ্লোকেই চরণগুলি সমাসের দ্বারা যুক্ত হয়নি।

৪.১.১১ শিখরিণী: য ম ন স ভ ল গ

I S S S S S I I I I I S S I I I S

য থা যা | তং যা তং | নি য তি | নি য তং | জী ব ন | দি নং

তদালোচ্য প্রাপ্যং ভবতি কিমহো মে রুচিকরম্?

ন জানে যাত্রেযং কিযদবধিকা দৈবঘটিতা

কুতশ্চ প্রারব্ধা তদিহ শরণম্মে ভগবতী॥[৪৯]

ছন্দোমঞ্জরী অনুসারে শিখরিণী ছন্দের লক্ষণ হল- *রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী*।[৫০] এই ছন্দের প্রতিটি পাদে যথাক্রমে য, ম, ন, স, ভ, ল, গ এই গণগুলি প্রযুক্ত হয়। এই শ্লোকেও উদ্দিষ্ট গণগুলি প্রযুক্ত হয়েছে।

শ্রুতবোধ অনুসারে শিখরিণী ছন্দের লক্ষণ হল-

যদা পূর্বো হ্রস্বঃ কমলনযনে ষষ্ঠকপরা

স্ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিসুকুমারাঙ্গি লঘবঃ।

ত্রযোঽন্যে চোপান্ত্যাঃ সুতনুজঘনাভোগসুভগে

রসৈরুদ্রৈর্যস্যাং ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী॥[৫১]

হে কমলনয়না স্বভাবসুন্দরদেহী যদি পূর্ব বা প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, চতুর্দশ, হে সুন্দরজঘনা! পঞ্চদশ এবং শোড়ষবর্ণ লঘু হয় এবং যার ষষ্ঠ ও তৎপরবর্তী একাদশাক্ষরে যতি থাকে, তাকে শিখরিণী ছন্দো বলে।

শিখরিণী ছন্দো প্রসঙ্গে ক্ষেমেন্দ্রের অভিমত হল বিসর্গান্ত শব্দের দ্বারা শিখরিণী সৌন্দর্য লাভ করে। অন্যদিকে লুপ্ত বিসর্গ থাকলে তা অশোভনীয় হয়। সূত্রখণ্ড থেকে মুক্তাহার ছিঁড়ে গেলে তার স্বরূপ যেমন নষ্ট হয়, সেরকম ছোট ছোট পদের দ্বারা রচিত হলে *শিখরিণীর* সৌন্দর্য নষ্ট হয়।[৫২] *সম্বোধনশতকের* ৯৬ থেকে ৯৮ নং শ্লোক পর্যন্ত *শিখরিণী* ছন্দে বিধৃত হয়েছে। ৯৮ নং শ্লোকে বড় বড় পদ রয়েছে কিন্তু অন্যান্য শ্লোকগুলি ছোট ও মাঝারি শব্দের দ্বারা বিন্যস্ত।

৪.১.১২ দণ্ডক: *ভারতদণ্ডক* কাব্যে দণ্ডক ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে। আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে সপ্তবিংশতি অক্ষরসমন্বিত দণ্ডক বৃত্তির অন্তর্গত চারটি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। যথা- *সিংহবিক্রীড়, অশোকমঞ্জরী, মত্তমাতঙ্গলীলাকর* এবং *সিংহবিক্রান্ত*। যেখানে কেবলমাত্র য-গণের দ্বারা প্রতিটি পাদ রচিত হয়, তাকে বলে *সিংহবিক্রীড়*। যে ছন্দে প্রতিটি পাদে প্রথমে র-গণ ও পরে জ-গণ ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে বলে *অশোকমঞ্জরী*। যে ছন্দো কেবলমাত্র র-গণের দ্বারা রচিত হয়, তাকে বলা হয় *মত্তমাতঙ্গলীলাকর*। আর যেখানে ক্রমান্বয়ে প্রথম দুটি ন-গণ, একটি ল-গণ দুটি গ-গণ এবং শেষে য-গণ থাকে, তাকে বলা হয় *সিংহবিক্রান্ত* ছন্দো।[৫৩]

রাজেন্দ্র মিশ্র কৃত *ভারতদণ্ডকে* প্রযুক্ত দণ্ডক ছন্দের আদিতে দুটি ন-গণ ও পরে অনবরত র-গণ প্রযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে আচার্য গঙ্গাদাস প্রদত্ত দণ্ডকের লক্ষণ-সঙ্গতি হয় না।

আচার্য কেদারভট্ট প্রণীত *বৃত্তরত্নাকর* গ্রন্থে এরকম দণ্ডকের লক্ষণ করা হয়েছে। *বৃত্তরত্নাকর* অনুসারে দুটি ন-গণের পর সাতটি র-গণ হলে চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত দণ্ডক হয়। একইভাবে দুটি ন-গণের পরে যথাক্রমে আটটি র-গণ থাকলে অর্ণাখ্য, নয়টি থাকলে অর্ণব, দশটি থাকলে ব্যাল, এগারটি থাকলে জীমূত, বারোটি থাকলে লীলাকর, তেরটি থাকলে উদ্দাম এবং চোদ্দটি থাকলে শঙ্খ নামক দণ্ডক হয়।[৫৪]

দণ্ডকের এই ভেদগুলি ছাড়াও ছন্দোশাস্ত্রে বৈকুণ্ঠ, কাসার, নীহার প্রভৃতি ভেদের উল্লেখ রয়েছে। দণ্ডক মূলত অনিয়তাক্ষর ছন্দো। তাই এই ছন্দের অক্ষরসংখ্যা কবির স্বেচ্ছাধীন।

অর্থাৎ দুটি ন-গণের পরবর্তী অনেকগুলি র-গণের সমন্বয়ে দণ্ডক রচিত হতে পারে। রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত *ভারতদণ্ডকের* প্রতিটি পদ্যে কবি আশিটিরও বেশী র-গণের প্রয়োগ করেছেন।

জনৈক কবি দণ্ডকের অক্ষরসংখ্যা সম্বন্ধে বলেছেন-

একোনসহস্রাক্ষরপর্যন্তা দণ্ডকাংঘ্রযঃ প্রোক্তাঃ।
বর্ণত্রিকগণবৃদ্ধ্যা ন দ্বিতযাদ্যা মহামতিভিঃ॥[৫৫]

অর্থাৎ দণ্ডকের পাদ একোনসহস্রাক্ষর পর্যন্ত হতে পারে। এক বা দুটি বর্ণের বৃদ্ধির দ্বারা এর গণ বিবেচিত হবে না। তিনটি করে বর্ণের দ্বারাই গণের বৃদ্ধি হবে।

অভিরাজসপ্তশতী মুক্তক সংকলনে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিবিধ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। *নব্যভারতশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* এবং *ভারতদণ্ডক* একক ছন্দে রচিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কাব্যগুলিতে যথা- মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক এবং সম্বোধনশতক মিশ্রছন্দে রচিত হয়েছে। *সম্বোধনশতকে* কবি দশপ্রকার সমবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

শব্দার্থময় কাব্যে দুই রকম সৌন্দর্য থাকে। একটি হল আভ্যন্তর সৌন্দর্য, অন্যটি বাহ্যিক সৌন্দর্য। অর্থগত চারুতা, প্রতীয়মানার্থ প্রভৃতি আভ্যন্তর বিষয়, যা সহৃদয়ের চিত্তকে আহ্লাদিত করে। আর বাহ্যিক সৌন্দর্য পাঠক ও শ্রোতাকে শ্রবণসুখ প্রদান করে। যথাযথ শব্দের ব্যবহারে কাব্যের শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি পায়। ছন্দো হল শ্রুতিমধুর, সুগম, নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিপ্রবাহ। ছন্দো কাব্যকে গতি প্রদান করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *ভাষা ও ছন্দো* শীর্ষক কবিতায় বলেছেন-

মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তা'রে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,- সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্য গীতে ঘিরে,-
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে।[৫৬]

অযত্নে বিন্যস্ত শব্দের দ্বারা কাব্য সুষমামণ্ডিত হয় না। তাই কাব্যের বহিরঙ্গ মণ্ডনকলার অন্যতম বস্তু হল ছন্দো। *অভিরাজসপ্তশতী* মূলত নীতি উপদেশমূলক কাব্যসংকলন। নীতি উপদেশমূলক শতককাব্যগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুষ্টুভ, তোটক, দোধক, নর্কুট প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, তাতে মুক্তক শোভনীয় হয়। আলোচ্য শতককাব্যগুলিতে স্বল্প পরিসরে তোটকের ব্যবহার থাকলেও অনুষ্টুভের প্রয়োগে মুক্তককাব্যের স্বভাব-সুন্দর চলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া *প্রভাতমঙ্গলশতকের* কিছু শ্লোকে বসন্ততিলক ছন্দের প্রয়োগে বীর, শান্ত ও অদ্ভুতরস অতিশয় সৌন্দর্য ধারণ করেছে।

৪.২ অলংকার সমীক্ষা:

লৌকিক জীবনে ব্যবহৃত বাক্য এবং কবির বাক্য এক নয়। উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থের সমন্বয় থাকলেও কবির বাক্য ব্যবহারিক শব্দার্থময় বাক্যকে অতিক্রম করে লোকাতীত আনন্দের আধাররূপ কাব্য হয়ে ওঠে। কাব্য-সমালোচনার প্রাক্কাল থেকে কাব্যসৌন্দর্য বিধায়ক সমস্ত কিছুকে 'অলংকার' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে 'অলংকার' শব্দটি কাব্যের সৌন্দর্যের জ্ঞাপক। তাই কাব্যসমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে 'অলংকারশাস্ত্র' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। *কামধেনু* টীকায় বলা হয়েছে- *যোঽযমলংকারঃ কাব্যগ্রহণহেতুত্বেন উপন্যস্যতে তদ্ব্যুৎপাদকত্বাত্ শাস্ত্রমপি অংকারনাম্না ব্যপদিশ্যত ইতি শাস্ত্রস্য অলংকারত্বেন প্রসিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা স্যাদ্ ইতি সূচযিতুমযং বিন্যাসঃ কৃতঃ কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাদ্ ইতি*।[৫৭] তাই ভামহ, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট প্রভৃতি আলংকারিকদের শাস্ত্রের নাম 'কাব্যালংকার' নামে অভিহিত হয়েছে। আচার্য দণ্ডী কাব্যের শোভাবর্ধক ধর্মকেই অলংকার বলেছেন।[৫৮]

আচার্য বামন অলংকার শব্দটির দুটি অর্থ করেছে। একটি হল *অলংকৃতিরলংকারঃ।* যার অর্থ- যা কিছু কাব্যের শোভা বর্ধন করে, তাদেরকে অলংকার বলা হয়। অর্থাৎ এখানে অলংকার শব্দটি সামান্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার দ্বারা গুণ, রীতি প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অর্থটি হল- *অলংক্রিযতেঽনেন ইতি অলংকারঃ।* এর দ্বারা উপমা যমক প্রভৃতি অলংকারকে বোঝায়।[৫৯] এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে শব্দালংকার তথা অর্থালংকারকে বোঝায়। অলংকার প্রস্থানের প্রবক্তা আচার্য ভামহ অলংকারকে নারী-শরীরে ভূষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৬০] তাঁর মতে রমণীর সুন্দর মুখও যেমন কটক, কুণ্ডলাদি ব্যতীত সৌন্দর্য বর্ধন

করে না, সেইরকম অলংকারবিহীন কাব্যও কমনীয়তা প্রাপ্ত হয় না। শব্দ ও অর্থ হল কাব্যের শরীর। আর অলংকার হল সেই কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম।

আচার্য আনন্দবর্ধনও অলংকারকে কটক, কুণ্ডলাদির ন্যায় কাব্যশরীরের শোভাকারক ধর্ম বলেছেন।[৬১] তাঁর মতে রসানুগুণত্বই অলংকারের সাধারণ লক্ষণ-

রসাক্ষিপ্ততযা যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিযো ভবেত্।

অপৃথগযত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মত॥[৬২]

বস্তুত ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের মতে রস যখন নিজেকে প্রকাশ করে, তখন রসের সঙ্গে সঙ্গে অলংকারেরও প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ অলংকার প্রয়োগের জন্য কবিকে স্বতন্ত্রভাবে প্রয়াস করতে হয় না। রসের উপযোগী অলংকার স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্ত হয়। তাই বৃত্তিতে বলা হয়েছে- *যুক্তং চৈতত্ যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদযোঽলংকারাঃ। তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ।*[৬৩]

আচার্য মম্মট এবং বিশ্বনাথও অলংকারকে রসের উপকারকরূপে স্বীকার করেছেন।[৬৪] *অগ্নিপুরাণে* অর্থালংকারহীন কাব্যকে বিধবা নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৬৫] অর্থাৎ অলংকার ব্যতীত রচনা অবশ্যই কাব্য পদবাচ্য হতে পারে কিন্তু তার বাহ্যিক সৌন্দর্য থাকে না। অন্যদিকে আচার্য মম্মট অলংকারকে রসের উপকারকরূপে গণ্য করলেও তাকে কাব্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করেননি। তাঁর কাব্যলক্ষণে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৬] *চন্দ্রালোক* গ্রন্থের রচয়িতা জয়দেব মম্মটোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন-

অঙ্গীকরোতি যঃ কাব্যং শব্দার্থাবনলংকৃতি।

অসৌ ন মন্যতে কস্মাদনুষ্ণামনলংকৃতী।।[৬৭]

তাঁর মতে অগ্নির উষ্ণত্ব যেমন তার স্বাভাবিক ধর্ম, তেমনই কাব্যের স্বাভাবিক ধর্ম হল তার অলংকৃতি। উভয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়। বস্তুত লৌকিক বাক্যের থেকে কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের যে পৃথক বৈশিষ্ট্য, তাকেই তাঁরা অলংকার বা সৌন্দর্যায়ণ বলে মনে করেছেন। বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা আচার্য কুন্তকও অলংকৃত রচনাকেই কাব্য বলেছেন।[৬৮]

শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্যশরীর নির্মিত। তাই অলংকারও শব্দ ও অর্থভেদে দুই প্রকার। অর্থাৎ শব্দালংকার ও অর্থালংকার। আচার্য ভারতের *নাট্যশাস্ত্রে* শব্দালংকার ও

অর্থালংকারের ভেদ বিষয়ক আলোচনা নেই। পরবর্তীকালে ভামহ, দণ্ডী প্রমুখের অলংকারশাস্ত্রীয় আলোচনায় শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রভেদ আলোচিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এই উভয় প্রকার অলংকারের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ- এই প্রসঙ্গে আলংকারিকদের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু হয়। ভামহের উক্তিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়- *শব্দাভিধেয়ালংকারভেদাং ইষ্টং দ্বয়ং তু নঃ*।[৬৯] ভামহ উভয় প্রকার অলংকারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে উভয়ালংকার রূপে শব্দার্থময় এক পৃথক অলংকার স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ সর্বসমেত অলংকার তিন প্রকার- শব্দালংকার, অর্থালংকার ও উভয়ালংকার। যেখানে বর্ণ বা শব্দ বিন্যাসের দ্বারা চমৎকৃতি সৃষ্টি হয়, তাকে বলে শব্দালংকার। যেখানে অর্থগত ব্যঞ্জনার দ্বারা চমৎকৃতি সৃষ্টি হয়, তাকে বলে অর্থালংকার। আর যেখানে চমৎকৃতি সৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থ উভয়ের উপযোগিতা থাকে, তাকে বলা হয় উভয়ালংকার।

মহর্ষি ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* চারটি অলংকারের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- উপমা রূপক দীপক এবং যমক।[৭০] ভারতের এই বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি এই অলংকারগুলির প্রবক্তা নন। তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যগণ এই চারটি অলংকারের উল্লেখ করেছেন। *অগ্নিপুরাণের* ৩৪২ থেকে ৩৪৪ নং অধ্যায়ে অলংকার বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। এখানে সর্বসমেত ৩৩ টি অলংকার স্বীকৃত হয়েছে। যেখানে ১০ প্রকার যমক, ৭ প্রকার চিত্রবন্ধ ও ১৬ প্রকার প্রহেলিকা প্রভৃতির আলোচনা রয়েছে। আচার্য ভামহের *কাব্যালংকার* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক আচার্য পাঁচ প্রকার অলংকার স্বীকার করেছেন। যথা- অনুপ্রাস, যমক, রূপক, দীপক এবং উপমা।[৭১] তবে আচার্য ভামহ স্বয়ং ৩৮ টি অলংকার স্বীকার করেছেন। *কাব্যালংকার* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শব্দালংকার ও অর্থালংকার বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। আচার্য দণ্ডীর *কাব্যাদর্শের* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সর্বসমেত ৩৫টি অলংকার আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যমকের আলোচনা রয়েছ। *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের* চতুর্দশতম অধ্যায়ে ১৭ প্রকার অলংকারের উল্লেখ রয়েছে। এখানে উপমা অলংকারের উল্লেখ নেই। উদ্ভট তাঁর *অলংকারসারসংগ্রহ* গ্রন্থে ৪১ টি অলংকারের কথা বলেছেন। রুদ্রট বলেছেন 68 টি অলংকারের কথা। ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থে অলংকারের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এখানে ২৪টি শব্দালংকার, ২৪ টি অর্থালংকার এবং ২৪ টি উভয়ালংকারের উল্লেখ রয়েছে। মম্মটের

কাব্যপ্রকাশে ৬১ প্রকার অলংকারের আলোচনাসহ অলংকারের বিভিন্ন দোষের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া রুয্যক, বাগভট, হেমচন্দ্র, জয়দেব, বিশ্বনাথ, অপ্যর্য দীক্ষিত তথা পন্ডিতরাজ জগন্নাথ যথাক্রমে ৪১, ৩৯, ৩৪, ১০৮, ৮৪, ১২৩ এবং ৭০ টি অলংকার স্বীকার করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সংস্কৃত আলংকারিকদের অলংকার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অলংকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভিরাজসপ্তসতীর অন্তর্গত শতকগুলিতে বিবিধ শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শব্দালংকার হল অনুপ্রাস। অর্থালংকারগুলি হল উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তূপমা, অর্থান্তরন্যাস, বিরোধাভাস, কাব্যলিঙ্গ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অতিশয়োক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, উল্লেখ, উদাত্ত, বিষম, ব্যাজস্তুতি, অর্থাপত্তি, স্বভাবোক্তি, পরিসংখ্যা, অনুকূল প্রভৃতি। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে আচার্য বিশ্বনাথ কৃত *সাহিত্যদর্পণ* অনুসারে অলংকার নির্ণয় করা হয়েছে।

এক জাতীয় স্বরবর্ণযুক্ত, অধিক দূরে নয় এইরকম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বলে অনুপ্রাস। অনুপ্রাস সর্বজন স্বীকৃত একটি অর্থালংকার। শ্রব্যকাব্যমাত্রে অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। *অভিরাজসপ্তশতীতেও* তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। *মাতৃশতকে* কবি তাঁর মাতার প্রতি ভক্তি-ভাবনা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে-

মনসা কর্মণা বাচা ধর্মলীনমনোরথা।

ধর্মভাবা ধর্মরুচির্ধর্মাকাঙ্খাঽসি দেবতে॥[৭২]

আচার্য বিশ্বনাথ অনুপ্রাসের লক্ষণ করেছেন- *অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যত্।*[৭৩] এখানে 'শব্দ' বলতে বোঝায় বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ। এই বর্ণ হল ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণের বিষমতা বা বৈসাদৃশ্য থাকলেও ব্যঞ্জনবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছের একাধিকবার আবৃত্তি হলে তাকে বলে অনুপ্রাস।

আচার্য রুদ্রট অনুপ্রাসের লক্ষণ করেছেন-

একদ্বিব্র্যন্তরিতং ব্যঞ্জনমবিবক্ষিতস্বরং বহুশঃ।

আবর্ততে নিরন্তরমথবা যদসাবনুপ্রাসঃ॥[৭৪]

অর্থাৎ একটি দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবধান থাকলেও অথবা নিরন্তরক্রমে আবর্তিত হলে অনুপ্রাস অলংকার হয়। এখানে স্বরবর্ণের হিসেব করা হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রচনায় ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় স্বরবর্ণও আবৃত্ত হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুপ্রাস স্বীকৃত হয় না। অলংকারিকদের মতে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মতো উচ্চারণে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে না।[৭৫]

আচার্য বিশ্বনাথ অনুপ্রাসের পাঁচটি ভাগের কথা বলেছেন- ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যনুপ্রাস এবং লাটানুপ্রাস। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যদি স্বরূপ ও ক্রমানুসারে সাদৃশ্য অবলম্বন করে একবার আবর্তিত হয়, তাহলে হয় ছেকানুপ্রাস।[৭৬] শুধুমাত্র বর্ণগত সাদৃশ্যকে বলে স্বরূপ-সাদৃশ্য। যেমন- 'রস সর'। বর্ণের পৌর্বাপর্য নিয়ম অনুযায়ী যে সাদৃশ্য, তাকে বলে ক্রম-সাদৃশ্য যেমন 'রস রস'। অনেক ব্যঞ্জনের স্বরূপ অনুসারে অথবা স্বরূপ ও ক্রম- উভয় প্রকারে বার বার আবৃত্তি হলে তাকে বলে বৃত্ত্যনুপ্রাস।[৭৭] যে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণস্থান সমান, এরকম বর্ণের আবৃত্তিকে বলে শ্রুত্যনুপ্রাস।[৭৮] পাদের অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অনুস্বার, বিসর্গ বা স্বরবর্ণ যেইভাবে যুক্ত থাকে, সেইভাবে যদি পাদের আদিস্থিত বর্ণের সঙ্গে আবৃত্তি হয়, তাহলে তাকে বলে অন্ত্যনুপ্রাস।[৭৯] তাৎপর্যগত পার্থক্য থাকলেও শব্দ ও অর্থের পৌনরুক্তি হলে তাকে লাটানুপ্রাস বলে।[৮০]

আলোচ্য শ্লোকের প্রথম পাদে 'মনসা কর্মণা' অংশে ম-কারের একবার আবৃত্তি হয়েছে। তাই এখানে **ছেকানুপ্রাস**। ন ও ণ-কারের উচ্চারণসাম্য রয়েছে। তাই এখানে **শ্রুত্যনুপ্রাস**। দ্বিতীয় পাদে ধ ও ম-কারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়েছে। এই আবৃত্তি ক্রমানুসারে হওয়ায় **বৃত্ত্যনুপ্রাস** অলংকার হয়েছে।

প্রভাতমঙ্গলশতকে স্বয়ম্ভূ মহাদেবের স্তুতি প্রসঙ্গে অনুপ্রাসের প্রয়োগ দেখা যায়-

লীলাবিলাসপুরুষোত্তমমুচ্চিকীর্ষুনানাপ্রপঞ্চরচনাচতুরঃ স্বযম্ভূঃ।
আত্মাভিরুচ্যনুমতাখিললোকসৃষ্টি: স্রষ্টা তনোতু মম মঙ্গলসুপ্রভাতম্॥[৮১]

অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা! লীলা বিলাসের জন্য বিবিধ প্রপঞ্চ রচনায় দক্ষ, নিজ অভিরুচির অনুরূপ অখিল বিশ্ব সৃজনের স্রষ্টা আমায় সুপ্রভাত প্রদান করুন।

এখানে 'লীলাবিলাস' পদে ল-কারের বার বার আবৃত্তি হয়েছে। তাই **বৃত্ত্যনুপ্রাস**। 'রচনাচতুর' অংশে চ-কারের **ছেকানুপ্রাস** হয়েছে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র *প্রভাতমঙ্গলশতকে* ভারতীয় সনাতন ধর্মের বিবিধ দেবতার মহিমা, বীরত্ব প্রভৃতির বর্ণনায় শান্ত, বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি রসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগ করে এই শতককাব্যের শ্রুতিমাধুর্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। তবে, অন্যান্য শব্দালংকারের প্রয়োগ দেখা যায় না। *প্রভাতমঙ্গলশতক* ব্যতীত অন্যান্য শতককাব্যগুলিতেও অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় না।

কবির মন কল্পনার তুরীয়-রাজ্যে বিচরণ করে। তাঁর দৃষ্টি থাকে বাস্তব কার্য-কারণসম্পর্কের অনেক উর্ধে। যে শব্দার্থময় বাগবিন্যাসের দ্বারা কবির এই ভাবনা বাহ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, আলংকারিকগণ তাকে বিষম অলংকাররূপে বিশেষিত করেছেন। রাজেন্দ্র মিশ্র মহাদেবের মহিমা বর্ণনাবসরে বিষম অলংকারের একটি চমৎকার প্রয়োগ দেখিয়েছেন-

নাম্না শিবোঽপ্যশিববেষধরঃ কপালী গঙ্গাধরোঽপি দধদম্বকগূহিতাগ্নিম্।

সাক্ষাদ্বিরুদ্ধগুণসঙ্গমনৈকভূমিশশম্ভুস্তনোতু মম মঙ্গলসুপ্রভাতম্॥[৮২]

যিনি শিব নামধেয় অথচ অশিব বেশ ধারণকারী। গঙ্গাধর অথচ নেত্রে ধারণ করেন অগ্নি। সাক্ষাৎ বিরুদ্ধ গুণের একত্র সঙ্গমস্থল শম্ভু! আমাকে নতুন প্রভাত দান করুন।

আচার্য বিশ্বনাথ বিষম অলংকার সম্বন্ধে বলেছেন-

গুণৌ ক্রিযে বা চেত্ স্যাতাং বিরুদ্ধে হেতুকার্যযোঃ।

যদারব্ধস্য বৈফল্যমনর্থস্য চ সম্ভবঃ।

বিরুদ্ধযোঃ সঙ্ঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্॥[৮৩]

অর্থাৎ যেখানে কারণের গুণ ও কার্যের গুণ তথা কারণের ক্রিয়া ও কার্যের ক্রিয়া পরস্পর বিজাতীয় হয় অথবা কোনো আরব্ধ কর্ম অভীষ্ট ফল উৎপাদন না করে অনিষ্ট বা অনভীষ্ট ফল উৎপাদন করে অথবা যখন পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থগুলি একই অধিকরণে বর্তমান থাকে, তখন সেখানে বিষম অলংকার স্বীকৃত হয়।

আলোচ্য শ্লোকে শিবনামধেয়ত্ব এবং ভস্মাদি লেপন, চর্ম পরিধান প্রভৃতি অশিব বা অশিষ্ট বেশধারণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম। অন্যদিকে জটায় গঙ্গাধারণ এবং নেত্রে অগ্নির অবস্থান পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ জল ও অগ্নির সহাবস্থান সম্ভব নয়। অতএব এখানে পরস্পর বিরুদ্ধ

ধর্মের একই অধিকরণে অবস্থানের দ্বারা **বিষম** অলংকার হয়েছে। দুটি বস্তুর পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম বস্তুত কবি-প্রতিভার দ্বারা পরিবেশিত হয়ে থাকে। বাস্তব কার্যকারণ সম্বন্ধে এই বিরোধ স্বীকৃত না হলেই এই অলংকার অধিক মনোগ্রাহী হয়।

বহুবিধ সাদৃশ্যের মধ্যে প্রতিভাত রমণীয়তার প্রকাশক হল হয় উল্লেখ অলংকার। এই উল্লেখ অলংকারের দ্বারা কবি রাজেন্দ্র মিশ্র স্বীয় মাতা অভিরাজী দেবীর সর্বাতিশায়ী মহিমার বর্ণনা করেছেন-

জননাজ্জননী সা মে পালনাচ্চ পিতাঽপি সা।

সমেষাং ভাববন্ধানামেকা সৈব গতির্মম॥[৮৪]

অর্থাৎ তিনি জন্মদাত্রী তাই আমার জননী। আমায় পালন-পোষণ করেছেন, তাই আমার পিতা। তিনি আমার সমস্ত ভাব-বন্ধনের একমাত্র আধার। এই শ্লোকটি কবি তার মাতার স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন।

আচার্য বিশ্বনাথ প্রদত্ত উল্লেখ অলংকারের লক্ষণ হল-

ক্বচিদ্ ভেদাদ্ গ্রহীতৃণাং বিষযাণাং তথা ক্বচিত্।

একস্যানেকধোল্লেখো যঃ স উল্লেখ উচ্যতে॥[৮৫]

একই বস্তু বা বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে অর্থাৎ গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির ভিত্তিতে বিশেষিত হলে উল্লেখ অলংকার হয়। এই অলংকার দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত একই বিষয় বা ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা দেখতে পারে। দ্বিতীয়ত একই বিষয় বা ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারে।

এখানে একই ব্যক্তি (কবির মাতা অভিরাজী দেবী) জন্মদাত্রী এবং পালয়িত্রী ভেদে জননী ও পিতারূপে কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিভাত হয়েছেন। অতএব এখানে **উল্লেখ অলংকার** হয়েছে।

এছাড়া গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উল্লেখ অলংকারের দ্বারা একটি শ্লোক রচনা করেছেন-

ন কস্য রোগস্য নিদানমস্তি তে ন কস্য সন্দেহলবস্য চোত্তরম্।

গুরুঃ পিতা ৰন্ধুজনঃ প্রসূ স্বসা বপুষ্মতাং গ্রন্থ! ন কোঽসি জীবনে॥[৮৬]

হে (অবয়ব বিশিষ্ট) গ্রন্থ! তোমার কাছে কোন রোগের নিদান নেই, কোন সন্দেহের উত্তর নেই। মানুষের কাছে তুমি গুরু, পিতা, বন্ধু, মাতা, ভগিনী- কে নও? অর্থাৎ মানুষের জীবনে তুমিই সব। এখানেও গুরু, পিতা, মাতা প্রভৃতিরূপে কবির দৃষ্টিতে গ্রন্থ প্রতিভাত হওয়ায় **উল্লেখ** অলংকার।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিষয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এর অবনতি বর্ণনা করতে কবি পরিসংখ্যা অলংকারের প্রয়োগ করেছেন-

কো গুরু:? প্রশ্নপত্রং যস্তনুতে প্রাক্ পরীক্ষণাত্।

কশ্চ শিষ্যো বিনামূল্যং যো বস্তূণি যচ্ছতি॥[৮৭]

অর্থাৎ গুরু কে? যিনি পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রদান করেন। আর শিষ্য কে? যে গুরুকে বিনামূল্যে বিবিধ দ্রব্য প্রদান করে।

পরিসংখ্যা শব্দে 'পরি' উপসর্গের অর্থ হল পরিহার করা। 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ হল বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি। অর্থাৎ পরিসংখ্যা শব্দের অর্থ হল প্রকৃত বিচার বা বিশ্লেষণের পরিহার করা। যখন কোনো প্রশ্নের উত্তররূপে বা জিজ্ঞাসা ছাড়াই মনে মনে সম্ভাবিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের পরিবর্তে অন্য একটি উত্তরকে স্বীকার করা হয়, তখন তাকে বলে পরিসংখ্যা অলংকার।

আচার্য বিশ্বনাথ এই অলংকারের লক্ষণ দিয়েছেন-

প্রশ্নাদপ্রশ্নতো বাপি কথিতাদ্বস্তুনো ভবেত্।

তাদৃগন্যব্যপোহশ্চেচ্ছাব্দ আর্থোঽথবা তদা।।

পরিসংখ্যা।[৮৮]

অর্থাৎ যেখানে প্রশ্নপূর্বক বা প্রশ্ন না করেই কোনো বস্তুর স্তুতি বা বর্ণনার দ্বারা তদ্ভিন্ন অন্য বস্তুকে শব্দগত বা অর্থগতভাবে নিষেধ করা হয়, সেখানে পরিসংখ্যা অলংকার হয়।

আলোচ্য শ্লোকে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে যথার্থ উত্তরের পরিবর্তে নিন্দাবাচক উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এখানে প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের পরিবর্তে অন্য উত্তর স্বীকার করায় **পরিসংখ্যা** অলংকার হয়েছে। অনুমান ও উত্তর অলংকারেও প্রশ্নোত্তর থাকে। কিন্তু এই উভয়

অলংকারের প্রশ্নটি ব্যঞ্জনার দ্বারা অনুমিত হয় এবং উত্তরটিও চমৎকারজনক ও ভাবব্যঞ্জক হয়।

যখন কোনো বস্তু বা ব্যক্তির গুণ-গরিমার বর্ণনা লোকোত্তর পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাকে বলে উদাত্ত অলংকার। কাব্যে এই অলংকারের রসময়তা অনস্বীকার্য। *সম্বোধনশতকের* অনেক শ্লোকে কবিপ্রতিভার স্পর্শে সামান্য বস্তুধর্ম অসামান্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। গৃহের দ্বার সম্বন্ধীয় একটি শ্লোকে কবি উদাত্ত অলংকারের প্রয়োগ করেছেন-

প্রসার্য বাহু তরসা সমোদং কুটুম্বিনো নন্দসি সৌম্যরীত্যা।
ইযং প্রথা তে নিতরাং যশস্বিনী কপাট! মে রোচতে এব নিত্যম্॥[৮৯]

হে কপাট! তুমি আনন্দ-পূর্বক বাহু প্রসারিত করে কুটুম্ববর্গকে আহ্বান করে আহ্লাদিত করো। তোমার এই নীতি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

আচার্য বিশ্বনাথ উদাত্ত অলংকারের লক্ষণ করেছেন-

লোকাতিশযসম্পত্তিবর্ণনোদাত্তমুচ্যতে।
যদ্বাপি প্রস্তুতস্যাঙ্গং মহতাং চরিতং ভবেত্॥[৯০]

বর্ণনীয় বস্তুর অলৌকিক সমৃদ্ধি বর্ণিত হলে অথবা কোনো মহাত্মার মাহাত্ম্য-প্রকাশক চরিত্র বর্ণিত হলে উদাত্ত অলংকার স্বীকৃত হয়।

আলোচ্য শ্লোকে দ্বারের সামান্য বৈশিষ্ট্য কবিপ্রতিভার স্পর্শে অলৌকিক মহিমায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই এখানে বস্তুর অসামান্য মহিমা বর্ণনের দ্বারা **উদাত্ত** অলংকার হয়েছে।

ব্যক্তির মহিমা বর্ণনের দ্বারা উদাত্ত অলংকারের উদাহরণ-

মাযাবগুণ্ঠনবিমোহিতসর্বলোকঃ স্বেচ্ছাবিখণ্ডিততদীযদুরন্তবন্ধঃ।
লীলাবিলাসনিপুণশিশুকেলিলীনো নারাযণো দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[৯১]

যাঁর মায়া-আবরণের দ্বারা ত্রিলোক বিমোহিত হয়, যিনি স্বশরীর স্বেচ্ছায় বিখণ্ডিত করেছেন, সেই লীলাক্রীড়ানিপুণ শিশুরূপে লীন শ্রীনারায়ণ আমাকে নবপ্রভাত দান করুন। আলোচ্য শ্লোকে নারায়ণের সর্বাতিশায়ী মহিমা কীর্তিত হয়েছে। তাই এখানে ব্যক্তির অলৌকিক মহিমা-বর্ণনের দ্বারা **উদাত্ত** অলংকার স্বীকৃত।

প্রতিকূল বিষয় যদি অনুকূলরূপে প্রতিভাত হয়, তখন হয় অনুকূল অলংকার। কবি অযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিন্দা প্রসঙ্গে অনুকূল অলংকারের প্রয়োগ করেছেন-

নৈর্গুণ্যমেব সাধীযো ধিগস্তু গুণগৌরবম্।

বৈধেযা মন্ত্রিণঃ সন্তি প্রাজ্ঞাঃ সাচিব্যশালিনঃ॥[৯২]

নির্গুণতারই সাধনা করা উচিত। ধিক্কার গুণগৌরবকে। মন্ত্রীরাই আজ বৈধ। তাদেরই মন্ত্রীত্ব প্রাপ্তির প্রজ্ঞা রয়েছে।

বিশ্বনাথ প্রদত্ত অনুকূল অলংকারের লক্ষণ- *অনুকূলং প্রাতিকুল্যমনুকূলানুবন্ধি চেত্*।[৯৩] অর্থাৎ অনিষ্টকর কার্যের আচরণ ইষ্টজনক হলে অনুকূল অলংকার হয়। বস্তুত যেখানে কোনো প্রতিকূল বিষয় অনুকূলভাবে কবির বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়, সেখানে অনুকূল অলংকার হয়।

সাধারণত লোকব্যবহারে গুণীর সমাদর করা হয়, গুণহীনের সমাদর করা হয় না। কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে তার বিপরীত ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এখানে গুণহীনের সমাদর ও গুণবানের নিন্দার দ্বারা **অনুকূল** অলংকার হয়েছে।

ভামহ, বিশ্বেশ্বর, মম্মট প্রমুখ আলংকারিকগণ অনুকূল অলংকারকে স্বতন্ত্র অলংকাররূপে স্বীকার করেন নি। ভরতের উত্তরকালে অলংকারের সংখ্যা ও অবান্তরভেদ প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পেয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথের দ্বারা স্বীকৃত অনেক অলংকারই পূর্ববর্তী আলংকারিকগণের শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তবে অনুকূল অলংকারের রসময়তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত শৃঙ্গারমূলক শ্লোকে এই অলংকার অত্যন্ত উপাদেয় হতে পারে।

কবি-প্রতিভার দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের বা উপমেয়ের যখন উপমানের সঙ্গে অভেদ আরোপিত হয়, তখন হয় রূপক অলংকার। আচার্য ভরতের পূর্ববর্তীকাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সমস্ত আলংকারিক রূপক অলংকার স্বীকার করেছেন। *অভিরাজসপ্তশতীর* অনেক শ্লোকে রূপক অলংকারের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্তি সম্বন্ধে কবি একটি শ্লোকে বলেছেন-

যদ্বক্ত্রপঙ্কজবিনিসৃতগূঢবাচ পার্থোঽপি নো গণযিতুং সহজং ক্ষমোঽভূত্।

রাধাপদাব্জরতিজাতমনোবিনোদো যোগেশ্বরস্স কুরুতাং নবসুপ্রভাতম্॥[৯৪]

অর্থাৎ যাঁর মুখপদ্ম-নিঃসৃত নিগূঢ় বচন অর্জুনও সহজে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি, রাধার পাদপদ্মাভিলাষী মনোবিনোদের যোগেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) নবপ্রভাত দান করুন।

বিশ্বনাথ রূপকের লক্ষণ করেছেন- *রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে নিরপহ্নবে*।[৯৫] অর্থাৎ যে অলংকারে উপমেয়ে রূপিত পদার্থের বা উপমানের আরোপ ঘটে, তাকে বলা হয় রূপক। এই অলংকারে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্যবশত অভেদ আরোপিত হয়।

রূপক প্রধানত তিন প্রকার যথা- পরম্পরিত, সাঙ্গ এবং নিরঙ্গ।[৯৬] যে রূপকে একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমান প্রয়োগের কারণ হয়, তাকে বলে পরম্পরিত রূপক।[৯৭] এই পরম্পরিত রূপক আবার শ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন ও অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন ভেদে দুইপ্রকার। এদের প্রত্যেকটি আবার কেবল ও মালা ভেদে দুইপ্রকার। অতএব পরম্পরিত রূপক মোট চার প্রকার।[৯৮] অনেকার্থবোধক শব্দের দ্বারা যে রূপক অলংকার হয়, তাকে বলে শ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন পরম্পরিত রূপক। আর একার্থবোধক শব্দের দ্বারা হয় অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন পরম্পরিত রূপক।

অঙ্গসহ উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ আরোপিত হলে হয় সাঙ্গ রূপক।[৯৯] সাঙ্গ রূপক আবার সমস্তবস্তুবিষয় ও একদেশবিবর্তি ভেদে দুইপ্রকার।[১০০] যেখানে আরোপ্য পদার্থসমূহ সরাসরি শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হয়, তাকে বলে সমস্তবস্তুবিষয় এবং যে সাঙ্গরূপকে আরোপিত পদার্থগুলি অর্থগম্য হয়, তাকে বলে একদেশবিবর্তি।[১০১]

বিষয়মাত্রে (উপমেয়ে) বিষয়ীমাত্রের (উপমানের) অভেদ আরোপিত হলে নিরঙ্গ রূপক হয়। এখানে অঙ্গসমূহ পরিত্যাগ করে উপমেয়ে উপমানের অভেদ আরোপিত হয়। নিরঙ্গ রূপকও কেবল ও মালা ভেদে দুইপ্রকার। অতএব রূপক সর্বসমেত আট প্রকার। যথা-

চারপ্রকার পরম্পরিত-

শ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন কেবল পরম্পরিত

শ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন মালা পরম্পরিত

অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন কেবল পরম্পরিত

অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন মালা পরম্পরিত

দুইপ্রকার সাঙ্গ রূপক-

সমস্তবস্তুবিষয় সাঙ্গ রূপক

একদেশবিবর্তি সাঙ্গ রূপক

দুইপ্রকার নিরঙ্গ রূপক-

কেবল নিরঙ্গ রূপক

মালা নিরঙ্গ রূপক

আলোচ্য শ্লোকের 'বক্ত্রপঙ্কজ' পদে উপমেয় বক্ত্রে উপমান পঙ্কজের অভেদ আরোপ, 'রাধাপদাব্জ' অংশে উপমেয় পদে উপমান অব্জের অভেদারোপ এবং 'মনোবিনোদ' অংশে উপমেয় মনে উপমান বিনোদের অভেদারোপ হয়েছে। তিনটি রূপকেই একেকটি উপমেয়ে একটি করে উপমানের অভেদ আরোপিত হয়েছে। তাই এখানে **কেবল নিরঙ্গ** রূপক।

আবার, সরস্বতীর স্তুতি প্রসঙ্গেও কবি রূপকের ব্যবহার করেছেন-

যৎপাদপঙ্কজসমাহিতমঞ্জুমাধ্বীমাস্বাদ্য জাতপুলকো মধুপায়মানঃ।

কাব্যানি গায়ন্তি কবী রসবন্তি সা মে ব্রাহ্মী তনোতু নবমঙ্গলসুপ্রভাতম্॥[১০২]

অর্থাৎ যাঁর পাদপদ্মে সমাহিত মনোজ্ঞ মধু আস্বাদন করে মধুপায়ীগণ (সহৃদয় পাঠক) পুলকিত হন, কবিগণ কাব্য-গান করেন, সেই রসময়ী ব্রাহ্মী অর্থাৎ সরস্বতী মঙ্গলময় নবপ্রভাত দান করুন। আলোচ্য শ্লোকে 'পাদ' হল উপমেয়। পঙ্কজ, মাধ্বী- এই উপমানগুলি উপমেয়ে আরোপিত হয়েছে। এখানে উপমেয় পাদে উপমান পঙ্কজের আরোপের দ্বারা যথাক্রমে মঞ্জু ও মাধ্বী উপমান দুটিও আরোপিত হয়েছে। অতএব এখানে **অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন পরম্পরিত রূপক** অলংকার স্বীকার্য।

আবার, *পঙ্কজসমাহিতমঞ্জু মাধ্বীমাস্বাদ্য* অংশে উপমেয় সরস্বতীর চরণ, উপমান পঙ্কজস্থিত মনোজ্ঞ মধুর দ্বারা বা উপমানের দ্বারা উপমেয়ের নিগরণ করা হয়েছে, তাই এখানে **অতিশয়োক্তি** অলংকার।

বিশ্বনাথ অতিশয়োক্তির লক্ষণ করেছেন- *সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে*।[১০৩] অর্থাৎ যেখানে সিদ্ধ অধ্যবসায় হয়, সেক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। অধ্যবসায়ের লক্ষণ

প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণের* বৃত্তিতে বলা হয়েছে- *বিষয়নিগরণেনাভেদপ্রতিপত্তির্বিষয়িনোঽধ্যবসায়ঃ*। 'নিগরণ' শব্দের অর্থ হল গ্রাস করা। অর্থাৎ বিষয় বা উপমেয়কে গ্রাস করে বিষয়ী বা উপমান কর্তৃক উপমেয়ের সঙ্গে অভেদ প্রতিপত্তিকে বলে অধ্যবসায়।

এই অধ্যবসায় দুইপ্রকার- সিদ্ধ ও সাধ্য। যেখানে উপমানটি সম্পূর্ণরূপে উপমেয়ের নিগরণ করে কিন্তু বাক্যে অকথিত থাকে, সেখানে হয় সিদ্ধ অধ্যবসায়। আর যেখানে উপমানের দ্বারা উপমেয়ের অভেদ কল্পিত হয় মাত্র, তাকে বলে সাধ্য অধ্যবসায়। উৎপ্রেক্ষা অলংকারের অধ্যবসায়টি সাধ্য। আলোচ্য শ্লোকে অধ্যবসায়টি সিদ্ধ হওয়ায় **অতিশয়োক্তি** অলংকার হয়েছে।

এখানে রূপক ও অতিশয়োক্তির সংমিশ্রণে সংকর অলংকার হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথের মতে সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মণি-মাণিক্যাদির সহাবস্থানে অলংকার যেমন অধিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, সেইরকম পৃথক পৃথক অলংকারের সংমিশ্রণে কাব্যও অধিক শোভাবর্ধন করে।[১০৪] তিনি সংকরালংকার প্রসঙ্গে বলেছেন-

অঙ্গাঙ্গিত্বেঽলংকৃতীনাং তদ্বদেকাশ্রযস্থিতৌ।

সন্দিগ্ধত্বে চ ভবতি সংকরস্ত্রিবিধঃ পুনঃ॥[১০৫]

পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব, একাশ্রয়ে অবস্থান এবং সন্দিগ্ধভাব- এই তিনপ্রকার সংকর অলংকার হয়।

আলোচ্য শ্লোকে রূপক ও উৎপ্রেক্ষার মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাববশত **সংকর** অলংকার হয়েছে।

বস্তু-স্বভাবের যথাযথ বর্ণনই হল স্বভাবোক্তি। কিন্তু কেবলমাত্র বস্তুর স্বভাব-বর্ণনের দ্বারা উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে না। কবির কল্পনা যখন স্বহৃদয়ের হৃদয়াহ্লাদজনক বর্ণনায় উত্তীর্ণ হয়ে বস্তুর গুণকীর্তন করে, তখন স্বভাবোক্তি অলংকার হয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ, তিতিক্ষার বর্ণনাবসরে স্বভাবোক্তির সার্থক প্রয়োগ করেছেন-

আজীবনং হৃদযভিদ্বিপদধ্বনীনঃ সন্ত্যক্তপার্থিবসুখো বিহিতান্যসৌখ্যঃ।

ভূভারভঞ্জনরতো বিরতো বিলাসাদ্ রামেশ্বরো দিশতু মে নবপ্রভাতম্॥[১০৬]

আজীবন বিপদধ্বনিতে যাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে, যিনি সকল পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করে অন্যের সুখ বিধান করেছেন, সেই ধরণীর ভার হরণকারী বিলাস ব্যসন থেকে বিরত রামেশ্বর আমাকে নবপ্রভাত প্রদান করুন।

বিশ্বনাথ প্রদত্ত স্বভাবোক্তি অলংকারের লক্ষণ- *স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্*।[১০৭] যখন কবিগণ তাঁদের কল্পনাশক্তির দ্বারা সূক্ষ্ম তথা সহৃদয়-সংবেদ্য পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করেন, তখন স্বভাবোক্তি অলংকার হয়।

এই শ্লোকে রামচন্দ্রের জীবনদর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে কবি মনোজ্ঞরূপে বর্ণনা রয়েছে। তাই এখানে **স্বভাবোক্তি** অলংকার হয়েছে।

ব্যাজস্তুতি একটি অত্যন্ত উপাদেয় অর্থালংকার। *সুভাষিতোদ্ধারশতকে* চিকিৎসকের অমানবিকতার নিন্দা-প্রসঙ্গে কবি ব্যাজস্তুতির প্রয়োগ করেছেন-

বৈদ্যরাজ! নমস্তুভ্যং যমরাজসহোদর!
হরিষ্যতি যমঃ প্রাণাংস্তবাপীতি বিচিত্রকম্॥[১০৮]

অর্থাৎ হে বৈদরাজ, যমের সহোদর! তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রাণও যমই হরণ করবেন। কী বিচিত্র!

'ব্যাজ' শব্দের অর্থ হল ছল, চাতুর্য প্রভৃতি। 'স্তুতি' শব্দের অর্থ প্রশংসা, গুণাদির বর্ণন প্রভৃতি। কাব্যে যখন কোনো বস্তুর স্তুতি বা প্রশংসার দ্বারা নিন্দা অথবা নিন্দার দ্বারা স্তুতি করা হয়, তখন ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়। আচার্য বিশ্বনাথ ব্যাজস্তুতির লক্ষণ করেছেন-

উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।
নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দযোঃ॥[১০৯]

অর্থাৎ যেখানে নিন্দার দ্বারা স্তুতি এবং স্তুতির দ্বারা নিন্দা গম্য (ব্যঙ্গ্য) হয়, সেখানে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়। অনেক সময় বাচ্যার্থের দ্বারা নিন্দা বোঝালেও প্রশংসা প্রযুক্ত হয়। বিপরীতক্রমে বাচ্যার্থের দ্বারা প্রশংসা বোঝালে নিন্দা প্রযুক্ত হয়। *অলঙ্কারকৌস্তুভে* ব্যাজস্তুতির লক্ষণ করা হয়েছে- *মুখে স্তুতি নিন্দা বা হৃদযে ব্যাজস্তুতিঃ স্যাত্তদন্যথা*।[১১০]

আলোচ্য শ্লোকে বাচ্যার্থের দ্বারা বৈদ্য বা চিকিৎসকের প্রশংসা বোঝালেও ব্যঙ্গার্থের দ্বারা নিন্দা প্রযুক্ত হয়েছে। তাই এখানে **ব্যাজস্তুতি** অলংকার।

একটি বস্তুর দোষ-গুণ, ক্রিয়াদির বর্ণনার জন্য তৎসদৃশ অন্য কোনো বস্তুর গুণাবলির সাদৃশ্য বর্ণিত হলে তাকে বলে উপমা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ বস্তুর সাদৃশ্যমাত্রকেই উপমা বলেছেন। ফলে অন্যান্য সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার যথা- রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতিও উপমার অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার পরবর্তীকালে এটি একটি স্বতন্ত্র অলংকাররূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে। *সম্বোধনশতকে* একটি উপমা অলংকারের উদাহরণ-

উপচ্ছন্দযত্যেণবৃন্দং বধার্থং যথা লুব্ধকো বেণুনাদৈর্নিতান্তম্।
তথা মানবান্ মূঢবুদ্ধীন্ মুমূর্ষূন্ অলম্মোহযস্যদ্য বিজ্ঞান! নিত্যম্॥[১১১]

অর্থাৎ ব্যাধ যেমন বধের জন্য হরিণকে বেণুনাদের দ্বারা মোহিত করে তারপর হত্যা করে, তেমন বিজ্ঞানও স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে মোহগ্রস্ত করে।

আচার্য বিশ্বনাথ উপমার লক্ষণ করেছেন- *সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ*।[১১২] একটি বাক্যে দুটি পদার্থের অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের বিরুদ্ধধর্ম-রহিত এবং ইবাদি সাম্যবাচক শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত সাম্যই হল উপমা অলংকার।

আলোচ্য শ্লোকে উপমানবস্তু হল 'লুব্ধক', উপমেয় 'বিজ্ঞান', সাধারণ ধর্ম 'মোহগ্রস্ততা' এবং ঔপম্যবাচি শব্দ 'যথা'। এখানে বিজ্ঞানের স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত করা এবং ব্যাধের দ্বারা হরিণকে মোহাচ্ছন্ন করা- এই উভয় বস্তুর মধ্যে অবৈধর্ম সাধিত হয়েছে। অতএব এখানে **উপমা** অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে।

বিশ্বনাথ উপমার মূলত দুটি ভাগ করেছেন। যথা- পূর্ণোপমা ও লুপ্তোপমা। যে উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং ঔপম্যবাচি শব্দ- এই চারটি উপাদানই বাচ্যার্থের দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাকে বলে পূর্ণোপমা। চারটির কোনো একটি, দুটি বা তিনটি উপাদানের অনুল্লেখে হয় লুপ্তোপমা।[১১৩]

অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত উপর্যুক্ত শ্লোকে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ বিদ্যমান। তাই এটি একটি **পূর্ণোপমা** অলংকার।

শ্রৌতী ও আর্থীভেদে পূর্ণোপমা ও লুপ্তোপমা এই উভয় অলংকার দুইভাগে বিভক্ত। যেখানে যথা, ইব, বা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎরূপে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধ নির্দেশিত হয়, তাকে বলে শ্রৌতী উপমা। যখন অর্থানুসন্ধানের দ্বারা এই সম্বন্ধ বুঝতে হয়, তখন হয় আর্থী উপমা।[১১৪]

আলোচ্য শ্লোকে বাচ্যার্থের দ্বারাই উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য স্থাপিত হয়েছে। তাই এটি **শ্রৌতী পূর্ণোপমা**।

শ্রৌতী ও আর্থী উপমা আবার তিন প্রকার, যথা- তদ্ধিতগত সমাসগত ও বাক্যগত। যেখানে ইবাদি শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, তাকে বলে তদ্ধিতগত। ইবাদি পদ সমাসযুক্ত হলে তাকে বলে সমাসগত এবং যেখানে বাক্যের দ্বারাই উপম্যটির বোধ হয়, তাকে বলে বাক্যগত উপমা।

এই শ্লোকে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধজ্ঞাপক 'যথা' পদটির সঙ্গে প্রত্যয় বা সমাস যুক্ত হয়নি। বাক্যের দ্বারা ঔপম্যটি সাধিত হয়েছে। তাই এটি **বাক্যগত উপমা**। অর্থাৎ আলোচ্য শ্লোকে **বাক্যগত শ্রৌতী পূর্ণোপমা** অলংকার হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষণ-কার্যে নিযুক্তির বিরোধিতা করে কবি বলেছেন-

বিশ্ববিদ্যালযে কো বা নিযুক্তো ন বুধাযতে।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥[১১৫]

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত কে বা বিজ্ঞ নয়। মহান ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরখণ্ডও দেবত্ব লাভ করে। এখানে অর্থাপত্তি অলংকার হয়েছে।

বিশ্বনাথ অর্থাপত্তি অলংকারের লক্ষণ করেছেন- *দণ্ডাপূপিকযান্যার্থাগমোঽর্থাপত্তিরিষ্যতে*।[১১৬] কোনো বস্তুর একটি ধর্মের সামর্থ বশত তৎসহচরিত অপর বস্তুতে সেই ধর্মের নিশ্চয় প্রতিপাদিত হওয়াকে বলে দণ্ডাপূপিকা ন্যায়। এই ন্যায় অনুসারে একটি ধর্মের জ্ঞান থেকে অপর পদার্থের জ্ঞান হলে অর্থাপত্তি অলংকার স্বীকৃত হয়।

আলোচ্য শ্লোকে মহান ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরের দেবত্ব সূচনার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি গৃহীত হয়েছে। তাই এখানে **অর্থাপত্তি** অলংকার হয়েছে।

এখানে বাচ্যার্থের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রতিপাদিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বক্তব্যটির বিরোধিতা করা হয়েছে। তাই এখানে প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা প্রতিপাদনের দ্বারা **ব্যাজস্তুতি** অলংকার হয়েছে।

কবি যখন উপমান বস্তুর গুণাবলী বর্ণনার দ্বারা তাঁর বিবক্ষিত বিষয়ের বা উপমেয়ের বর্ণনা করে থাকেন, তখন হয় অপ্রস্তুতপ্রশংসা অর্থালংকার। *মাতৃশতকে* কবি স্বীয় মাতার স্তুতি প্রসঙ্গে এই অলংকারের সার্থক প্রয়োগ করেছেন-

নগেশাদুচ্চতা গুর্বী বনাত্তচ্ছীর্যশস্বিনী।

সাগরাদপি গম্ভীরাঽগাধতা ননু কীর্ত্যতে॥[১১৭]

অর্থাৎ পর্বতের চেয়ে তার উচ্চতা মহৎ, বনের চেয়ে বনের সৌন্দর্য রমণীয়, সাগরের চেয়ে তার গভীরতা প্রশংসাযোগ্য।

বিশ্বনাথ কৃত অপ্রস্তুতপ্রশংসার লক্ষণ-

ক্বচিদ্বিশেষঃ সামান্যাত্ সামান্যং বা বিশেষতঃ।

কার্যান্নিমিত্তং কার্যং চেদ্ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা স্যাত্॥[১১৮]

অর্থাৎ ১. সামান্য থেকে বিশেষ ২. বিশেষ থেকে সামান্য ৩. কার্য থেকে কারণ ৪. কারণ থেকে কার্য এবং ৫. সাদৃশ্যভাব অর্থাৎ সমান অপ্রস্তুত থেকে সমান প্রস্তুতের ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতীতি হলে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার হয়। পঞ্চম প্রকার অপ্রস্তুতপ্রশংসার ক্ষেত্রে অপ্রস্তুত সামান্য হলে প্রস্তুতও সামান্য হবে, অপ্রস্তুত বিশেষ হলে প্রস্তুতও বিশেষ হবে। এই নিয়ম কার্য ও কারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত যেখানে প্রস্তুতের পরিবর্তে তার তুল্য বস্তুর অর্থাৎ অপ্রস্তুতের প্রশংসা বা স্তুতি বর্ণিত হয়, তাকে বলে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার। অপ্রস্তুতের প্রশংসার দ্বারা প্রস্তুতের প্রশংসা প্রতিপাদিত হয় বলে একে অপ্রস্তুত প্রশংসা বলা হয়।

আলোচ্য শ্লোকে কবির মাতা অভিরাজী দেবীর স্তুতি হল প্রস্তুত বিষয়। পর্বতের উচ্চতা, বনানীর সৌন্দর্য এবং সমুদ্রের গভীরতা এগুলি হল অপ্রস্তুত বিষয়। কবি তাঁর মাতার মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে আলোচ্য অপ্রস্তুত বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন। শ্লোকের তাৎপর্য হল পর্বতের

চেয়ে যেমন তার উচ্চতা মহৎ, বনের মধ্যে যেমন বনের সৌন্দর্য মহৎ এবং সাগরের চেয়ে তার গভীরতা যেমন মহৎ একইভাবে পৃথিবীর চেয়ে মাতার স্নেহ মহৎ। অর্থাৎ এই পৃথিবী মহৎ কিন্তু মাতার স্নেহ-সান্নিধ্য মহত্তর। অতএব এখানে সমান অপ্রস্তুত থেকে ব্যঞ্জনার দ্বারা সমান প্রস্তুতের প্রতীতি হয়েছে। অর্থাৎ সামান্যের দ্বারা বিশেষের প্রশংসারূপ **অপ্রস্তুতপ্রশংসা** অলংকার স্বীকার্য।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর কাব্যে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতাদেরকে বার বার তিরস্কার করেছেন। তাদের অভ্যন্তরে অনিষ্ট চিন্তা, অথচ বাইরে সর্বদা তারা সৌম্যমূর্তি ধারণ করে থাকে। বিষয়টিকে কবি বিভাবনা ও বিশেষোক্তি অলংকারের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন-

যচ্চেতসি ন তদ্বাণ্যাং যদ্বাণ্যাং তন্ন কর্মণি।

যৎকর্মণি ন তদ্বাণীমনসোর্বিদ্যতে ধ্রুবম্॥[১১৯]

অর্থাৎ যা মনে থাকে, তা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। যা বাক্যে থাকে, তা কর্মের দ্বারা প্রকটিত হয় না এবং যা কর্মের দ্বারা প্রকটিত হয়, তা বাক্য ও মনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিশ্বনাথ কৃত বিশেষোক্তির লক্ষণ হল- *সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তিঃ*।[১২০]

অর্থাৎ যেখানে ফলের হেতু বা কারণ থাকলেও কার্যোৎপত্তি বা ফলোৎপত্তি হয় না, সেখানে বিশেষোক্তি অলংকার স্বীকৃত হয়।

ব্যক্তির মনে যা থাকে, তা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে তা ঘটেনি। একইভাবে যা বাক্যে থাকে, তাই কার্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেছে। উভয় ক্ষেত্রেই কারণ থাকলেও যথার্থ ফলের অভাব ঘটেছে। তাই এখানে **বিশেষোক্তি** অলংকার হয়েছে।

আবার, *যত্ কর্মণি ন তদ্বাণীমনসোর্বিদ্যতে* এই অংশে বাক্য ও মনের সংকল্প ব্যতীত কর্মের উৎপত্তি প্রতিপাদনে **বিভাবনা** অলংকার হয়েছে।

আচার্য বিশ্বনাথ বিভাবনার লক্ষণ করেছেন- বিভাবনা বিনাহেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।[১২১]

অর্থাৎ যেখানে হেতু বা কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তি ঘটে, সেখানে হয় বিভাবনা অলংকার। আলোচ্য শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের *যত্ কর্মণি ন তদ্বাণীমনসোর্বিদ্যতে* এই অংশে কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তিতে বিভাবনা অলংকার হয়েছে।

বিভাবনা ও বিশেষোক্তি- এই উভয় প্রকার অলংকার উক্তনিমিত্ত ও অনুক্তনিমিত্ত ভেদে দুই প্রকার। বিভাবনায় প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতীত অপ্রসিদ্ধ কারণের দ্বারা কার্যোৎপত্তি ঘটে। এই অপ্রসিদ্ধ কারণ কখনও উক্ত হয়, কখনও বা অনুক্ত হয়। কারণ উক্ত হলে হয় উক্তনিমিত্ত। আর অনুক্ত হলে হয় অনুক্তনিমিত্ত। আলোচ্য শ্লোকে বিভাবনা ও বিশেষোক্তির অপ্রসিদ্ধ কারণ হল মানুষের অসততা। এখানে তা উল্লিখিত হয়নি। তাই এখানে **অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি** ও **বিভাবনা** হয়েছে।

বি-রুধ্+ঘঞ্= বিরোধ। এর অর্থ হল বৈষম্য, বৈপরীত্য, অসদ্ভাব প্রভৃতি। কাব্যে এরকম অনেক উক্তি থাকে, যেখানে এক বা একাধিক বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের আভাস থাকে। তখন সেক্ষেত্রে হয় বিরোধ বা বিরোধাভাস অলংকার। কবি মানুষের চারিত্রিক স্খলন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিরোধাভাস অলংকারের প্রয়োগ করেছেন-

নিত্যদানী নৃশংসোঽদ্য স্মিতপ্রাণো হি বঞ্চকঃ।

মাযাবী মৃদুভাষী স্যাত্কুটিলো বিনযপারগঃ॥[১২২]

অর্থাৎ নিত্যদানী আজ নৃশংস, স্মিতহাস্যময় আজ বঞ্চক। যারা মায়াবী তারাই আজ মৃদুভাষী, যারা কুটিল. তারাই বিনয়গুণবিশিষ্ট।

আচার্য বিশ্বনাথ বিরোধাভাসের লক্ষণ করেছেন-

জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যাদ্যৈর্গুণো গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ।

ক্রিযা ক্রিযাদ্রব্যাভ্যাং যদ্ দ্রব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ॥

বিরুদ্ধমিব ভাসেত বিরোধোঽসৌ দশাকৃতিঃ।[১২৩]

অর্থাৎ জাতি, দ্রব্য, গুণ অথবা ক্রিয়ার সঙ্গে জাতির, গুণ, ক্রিয়া অথবা জাতির সঙ্গে গুণের, ক্রিয়া ও দ্রব্যের সঙ্গে ক্রিয়ার অথবা দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিরোধ প্রতীত হলে দশপ্রকার বিরোধাভাস অলংকার হয়। বস্তুর পারস্পরিক অসঙ্গতিই হলো বিরোধ। কারও কারও মতে

যখন কোনো ক্রিয়া অস্বাভাবিক বা বিরুদ্ধ ফল উৎপাদন করে, সেক্ষেত্রেও বিরোধালংকার স্বীকৃত হয়। তাই আচার্য দণ্ডী বিরোধ অলংকারের লক্ষণ করেছেন-

বিরুদ্ধানাং পদার্থানাং যত্র সংসর্গদর্শনম্।

বিরোধদর্শনাযৈব স বিরোধঃ স্মৃতঃ॥[১২৪]

যেখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থগুলির সহাবস্থান ঘটে, সেই বিরুদ্ধ সংসর্গ দেখানোর জন্য তাকে বলে বিরোধ।

যিনি দানাদি মহৎ কর্মে রত থাকেন, তিনি নৃশংস হন না। সরলমতি ব্যক্তি বঞ্চক হন না। অন্যদিকে যে মায়াবী বা ছলপ্রবণ, সে মৃদুভাষী হয় না। কুটিলের বিনয়গুণ থাকে না। এই ধর্মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে এই বিরুদ্ধ ধর্মগুলির সহাবস্থান ঘটেছে। অতএব এখানে **বিরোধাভাস** অলংকার হয়েছে।

অর্থালংকারগুলির মধ্যে কাব্যলিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ অলংকার। কোনো বাক্য বা পদের অর্থ যখন কোনো বর্ণনীয় বিষয়ের কারণরূপে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রযুক্ত হয়, তখন কাব্যলিঙ্গ অলংকার স্বীকৃত হয়। *নব্যভারতশতকের* একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

ন প্রতিষ্ঠাঽদ্য সত্যস্য কর্মণো ন শুভা গতিঃ।

লেপনং নবনীতস্য সর্বসিদ্ধিপ্রদাযকম্॥[১২৫]

অর্থাৎ আজ সত্যের প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি নেই, কর্মের দ্বারা যথার্থ শুভফল লাভ হয় না। মাখন লেপনই সমস্ত কার্যের সিদ্ধি প্রদান করে।

বিশ্বনাথ প্রদত্ত কাব্যলিঙ্গ অলংকারের লক্ষণ- *হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে*।[১২৬] অর্থাৎ কোনো কার্যের প্রতি কোনো বাক্য বা পদার্থের কারণ ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধ্য হলে কাব্যলিঙ্গ অলংকার স্বীকৃত হয়।

আলোচ্য শ্লোকে সত্যের অস্বীকৃতি এবং কর্মের দ্বারা যথার্থ ফলের অনুপলব্ধির কারণরূপে তোষণ নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোষামোদের দ্বারাই বর্তমান সময়ে কার্যসিদ্ধি ঘটে থাকে। তাই সত্যবাদিতা, পরিশ্রম প্রভৃতির মূল্য নেই। এটিই কবির মূল বক্তব্য।

এখানে কার্যসিদ্ধির জন্য তোষামোদের নিন্দা করা হয়েছে এবং সততা ও পরিশ্রমের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ ব্যঞ্জনার দ্বারা সূচিত হয়েছে। অতএব এখানে **কাব্যলিঙ্গ** অলংকার।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারগুলির মধ্যে প্রতিবস্তূপমা একটি অন্যতম অলংকার। রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত প্রতিবস্তূপমার একটি উদাহরণ-

অদ্য নাদ্রিযতে জ্ঞানী কলাবান্ ন চ পণ্ডিতঃ।

কলহংসা ন পূজ্যন্তে বকপূজৈব বর্ততে॥[১২৭]

অর্থাৎ আজকাল জ্ঞানী, বিদ্বান, পণ্ডিত এখন আর সমাদৃত হন না। রাজহংস এখন পুজিত হয় না। বক পূজিত হয়।

আচার্য বিশ্বনাথ প্রতিবস্তূপমা সম্বন্ধে বলেছেন-

প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যযোর্গম্যসাম্যযোঃ।

একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো নির্দিশ্যতে যত্র পৃথক্॥[১২৮]

অর্থাৎ যে অলংকারে দুটি বাক্যের (উপমের ও উপমানের) মধ্যে সাদৃশ্যটি ইবাদি শব্দের দ্বারা প্রতীত না হয়ে তাৎপর্যের দ্বারা প্রতীত হয় এবং দুটি বাক্যে একটিই সাধারণ ধর্ম থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা কথিত হয়, তাকে প্রতিবস্তূপমা অলংকার বলে। প্রতিবস্তূপমায় ঔপম্যটি গম্য হয়। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবসম্বন্ধ থাকে।

আলোচ্য শ্লোকে জ্ঞানী, বিদ্বান তথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনাদর এবং রাজহংসের পূজা না করা- এইদুটি বাক্যের মধ্যে সাম্য প্রতীত হয়। কিন্তু উভয়ের সাধারণ ধর্ম ভিন্ন। প্রথমটি হল অনাদর (নাদ্রিযতে) এবং দ্বিতীয়টি হল পূজা না করা (ন পূজ্যন্তে)। তা সত্ত্বেও উপমেয় বাক্য *নাদ্রিযতে জ্ঞানী কলাবান্ ন চ পণ্ডিতঃ,* এবং উপমান বাক্য *কলহংসা ন পূজ্যন্তে* এই উভয়ের মধ্যে বস্তু-প্রতিবস্তুভাব বশত তাৎপর্যের দ্বারা সাদৃশ্যের প্রতীতি হয়েছে। তাই এখানে **প্রতিবস্তূপমা** অলংকার হয়েছে।

আবার, সম্পূর্ণ শ্লোকটির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ *বকপূজৈব বর্ততে* এই অংশসহ পর্যালোচনা করলে এখানে কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয়। কারণ সম্মান বা পূজার উপযোগী পণ্ডিত ব্যক্তিরা সমাদৃত না হওয়ার কারণ হল সামাজিক অবক্ষয় এবং পণ্ডিতের ভেকধারী মানুষের সর্বত্র

বিচরণ। কবি এই বক্তব্যটিকে *বকপূর্জৈব বর্ততে* এই বাক্যের দ্বারা ব্যঞ্জিত করেছেন। তাই এখানে **কাব্যলিঙ্গ** অলংকার।

যখন একই রকম ধর্মের দ্বারা উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে তুলনা প্রতীত হয়, তখন তাকে বলা হয় তুল্যযোগিতা অলংকার। কাব্যরসিকগণের কাছে এই অলংকার অত্যন্ত উপাদেয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র প্রিয়া-বিচ্ছেদে রোদনরত এক চাতককে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তুল্যযোগিতা অলংকারে মণ্ডিত একটি শ্লোক রচনা করেছেন-

রামোঽপি সম্প্রাপ বিলীনসীতাং দময়ন্তসা চাপি নলং ববার।
ক্ব তে প্রিযা গূঢতরং নিলীনা শৃণোতি নো চাতক! রোদনন্তে॥[১২৯]

অর্থাৎ রামচন্দ্র অপহৃতা সীতাকে ফিরে পেয়েছেন, দময়ন্তীও নলকে পেয়েছেন। তোমার প্রিয়া এমন কোথায় লুকিয়েছে যে তোমার কান্না শুনতে পাচ্ছে না।

আচার্য বিশ্বনাথ তুল্যযোগিতার লক্ষণ করেছেন-

পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেত্।
একধর্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা॥[১৩০]

অর্থাৎ প্রস্তুত বা উপমেয় এবং অপ্রস্তুত বা উপমান পদার্থগুলি একই ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে তুল্যযোগিতা অলংকার হয়।

আলোচ্য শ্লোকে বর্ণনীয় বিষয় হল চাতকের তার প্রিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলন। অপ্রস্তুত বিষয়গুলি হল রাম-সীতার ও নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন। এই অপ্রস্তুত বিষয়দুটি মিলনরূপ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকের তাৎপর্য হল রাম যেমন অপহৃতা সীতাকে ফিরে পেয়েছেন, দময়ন্তী যেমন অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাও নলের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছেন, তেমনই চাতকও তার প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে। এই বক্তব্যটিকে কবি প্রশ্নবোধক বাক্যের দ্বারা সমর্থন করেছেন। অতএব এখানে **তুল্যযোগিতা** অলংকার হয়েছে।

সংস্কৃত আলংকারিকগণের দ্বারা প্রশংসিত অর্থালংকারগুলির মধ্যে অর্থান্তরন্যাস অন্যতম। শ্যামাপদ চক্রবর্তী এই অলংকারকে বলেছেন গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। কারণ

এই অলংকারে গভীর অধ্যয়নের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়। *চতুর্থীশতকে* দুষ্ট ব্যক্তির বিদ্যা লাভের অসারতা সম্বন্ধে রচিত একটি শ্লোকে অর্থান্তরন্যাসের প্রয়োগ করেছেন-

দৌর্জন্যে স্ফারতাং যাতে বিদ্যাপি কিং করিষ্যতি।

মণিভূষায সর্পায ভযদায নমো নমঃ॥[১৩১]

অর্থাৎ দুর্জনের মধ্যে প্রচুর বিদ্যা থাকলেও কী লাভ? মনিভূষণ ভয়ংকর সর্পকে নমস্কার।

আচার্য বিশ্বনাথ অর্থান্তরন্যাস অলংকারের লক্ষণ করেছেন-

সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।

কার্যঞ্চ কারণেনেদং কার্যেন চ সমর্থ্যতে।

সাধর্ম্যেনেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা॥[১৩২]

অর্থাৎ সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কার্যের দ্বারা কারণ এবং কারণের দ্বারা কার্য সমর্থিত হলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়। এই চার প্রকার অর্থান্তরন্যাস আবার সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বশত সর্বসমেত আট প্রকার। এখানে 'অর্থ' শব্দের দ্বারা উক্তি, ধারণা বা বক্তব্যকে বোঝায়। 'অন্তর' এর অর্থ হল অন্য বা পৃথক। আর 'ন্যাস' শব্দের অর্থ হল স্থাপনা, বর্ণনা বা প্রতিষ্ঠা। অতএব কবির বর্ণনীয় বিষয় বা উক্তি যখন তৎসদৃশ অন্য কোনো উক্তির দ্বারা যুক্তিসিদ্ধ হয়, তখন হয় অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

এই শ্লোকে বিষধর সর্পের মস্তক স্থিত মনির দ্বারা সমাজের উপকারের অনুপযোগিতা সামান্য বিষয়। এখানে সামান্যের অর্থ হল সর্বজন বিদিত বা সর্বজন স্বীকৃত। সর্পের মণি মানুষের জন্য উপকারী হলেও তা যতক্ষণ সর্পের মস্তকে থাকে ততক্ষণ মানুষের কোনো কাজে লাগে না। কারণ সর্পদংশনের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যা হল আত্মিক ও সামাজিক উন্নতির সাধক। কিন্তু তা নির্ভর করে বিদ্বানের মানসিকতার উপরে। দুর্জন প্রভূত বিদ্যার্জন করলেও সামাজিক কর্মে তার প্রয়োগ করবে না।

এখানে সর্পের মস্তকস্থিত মণির অনুপযোগিতা এই সামান্যের দ্বারা দুর্জনের বিদ্যা লাভের অসারতা এই বিশেষ সমর্থিত হয়েছে। সামান্য-বিশেষের ধর্মটি এখানে সাধর্ম্যের দ্বারা

স্বীকৃত হয়েছে। তাই এখানে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে সাধর্ম্যরূপ **অর্থান্তরন্যাস** অলংকার হয়েছে। আবার দুর্জনের প্রশংসার দ্বারা নিন্দা করায় **ব্যাজস্তুতি** অলংকার হয়েছে।

কবিকল্পনার স্পর্শে একটি বস্তু যখন প্রবল সাদৃশ্য বশত অন্য বস্তুরূপে পরিভাবিত হয়, তখন হয় উৎপ্রেক্ষা অলংকার। এই সাদৃশ্যটিও কবির কল্পনারই আতিশয্য। তাই এই অলংকারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য প্রতীত হলেও উভয়কে এক করা যায় না। রাজেন্দ্র মিশ্র দেবী সরস্বতীর স্তুতি-প্রসঙ্গে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ করেছেন-

যা কালিদাসভবভূতিকবিত্বনীরস্রোতোঽনুভূতনবযামুনগাঙ্গসঙ্গা।
সা তীর্থরাজধরনীব বিমুক্তিশক্তা হংসাসনা দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[১৩৩]

আলোচ্য শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে *সা তীর্থরাজধরনীব* অংশে প্রকৃত বা উপমেয় *সা* (হংসাসনা বা সরস্বতী) অপ্রকৃত বা উপমানরূপে (তীর্থরাজধরনীরূপে) সম্ভাবিত হয়েছে।

আচার্য বিশ্বনাথ উৎপ্রেক্ষার লক্ষণ করেছেন- *ভবেত্ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা*।[১৩৪] অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত বা উপমেয় পর বা উপমানরূপে উৎকট সম্ভাবনা হয়, তাকে বলে উৎপ্রেক্ষা। এখানে এই সম্ভাবনাটি সাধ্য অধ্যবসায়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অতিশয়োক্তি অলংকারের আলোচনাবসরে অধ্যবসায়ের লক্ষণ ও বিভাগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা দুইপ্রকার- বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। যেখানে সাদৃশ্যবাচক ইবাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাকে বলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। আর যেখানে ইবাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে না, উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্যটি তাৎপর্যের দ্বারা প্রতীত হয়, তাকে বলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। আলোচ্য শ্লোকে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্যটি 'ইব' শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। তাই এখানে **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** অলংকার।

আবার, *কবিত্বনীরস্রোতোঽনুভূত* অংশে কবিত্বে নীরের আরোপ হয়েছে। নীরের আরোপের দ্বারা স্রোতের আরোপও ঘটেছে। ফলে এখানে **অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন পরম্পরিত রূপক** অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে।

আলোচ্য শ্লোকে দুটি ভিন্ন পদে দুটি অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে। তাই **সংসৃষ্টি** অলংকার। সংসৃষ্টির লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন- *মিথোঽনপেক্ষমেতেষাং স্থিতিঃ সংসৃষ্টিরুচ্যতে*।[১৩৫] অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে যদি একাধিক অলংকারের সহাবস্থান দেখা যায়, তবে তাকে

বলে সংসৃষ্টি। এখানে রূপক ও উৎপ্রেক্ষা স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান। তাই এখানে **সংসৃষ্টি** অলংকার হয়েছে। সংসৃষ্টির এই সহাবস্থানটি তিলতণ্ডুলের মতো। অর্থাৎ উভয়ের সংমিশ্রণ হলেও পৃথকরূপে চেনা যায়।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিরচিত *অভিরাজসপ্তশতীতে* বহুল অর্থালংকারের প্রয়োগ রয়েছে। কিছু কিছু শ্লোকে কবির ব্যঞ্জনা সহৃদয়সংবেদ্য। কিন্তু শতককাব্যে বা মুক্তককাব্যে প্রায় সমস্ত শ্লোকেই চমৎকারিত্ব থাকে। সেইরকম অলংকারের প্রয়োগ *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে খুব বেশি দেখা যায় না।

৪.৩ রীতি বিচার:

আচার্য আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ প্রমুখ আচার্যগণ গুণ ও রীতিকে কাব্যস্থিত রসের আন্তর্ধর্ম বলেছেন। অর্থাৎ এই গুণ রসকে অতিশয় উপাদেয় করে তোলে। গবেষণা-প্রবন্ধের এই অংশে *অভিরাজসপ্তশতীতে* বিভিন্ন গুণ ও রীতির প্রয়োগে কাব্যের উপাদেয়তা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা আলোচ্য বিষয়।

অভিরাজসপ্তশতীত গুণ-রীতি বিচারের পূর্বে সংস্কৃত আলংকারিকগণ এগুলিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সংস্কৃত আলংকারিকগণের মধ্যে আচার্য বামন সর্বপ্রথম কাব্যের আত্মানুসন্ধান করেছেন। আচার্য বামন স্পষ্টত বলেছেন- *রীতিরাত্মা কাব্যস্য*।[১৩৬] আচার্য বামন রীতির লক্ষণ করেছেন- *বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ*।[১৩৭] অর্থাৎ বিশেষত্বযুক্ত পদের সন্নিবেশই হল রীতি। আর এই বিশেষত্বই হল কাব্যের গুণ- *বিশেষো গুণাত্মা*।[১৩৮] অতএব শব্দার্থময় যে কাব্যশরীর, তার আত্মা হল রীতি। তাই *কামধেনু* টীকায় বলা হয়েছে- *শব্দার্থযুগলং শরীরম্, অস্যাধিষ্ঠাতা রীতির্নামাত্মা*।[১৩৯]

কামধেনু টীকায় 'রীতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে- *রীণন্তি গচ্ছন্তি অস্যাং গুণা ইতি। রীযতে ক্ষরত্যস্যাং বাঙ্ময়ধারেতি রা রীতিঃ*।[১৪০] অধিকরণার্থে 'রী' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের সমন্বয়ে রীতি পদের নিষ্পত্তি। গুণসমূহ এতে গমন করে বা সমাবিষ্ট হয়, তাই একে রীতি বলে। অথবা এতে মধুধারা বর্ষিত হয়। বিশ্বনাথকৃত *সাহিত্যদর্পণের ভাবপ্রকাশিকা* টীকায় বলা হয়েছে- *রীঙ্গতাবিতি ধাতোঃ স্ত্রিয়াং ক্তিন্ ইতি পাণিনীযানুশাসনেন ক্তিনি রীতিরিতি পদং ব্যুৎপদ্যতে। রীযতে জ্ঞাযতে অনযেতি রীতিপদস্যার্থঃ*।[১৪১] অর্থাৎ দিবাদিগণীয় 'রীঙ্' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের যোগে রীতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার দ্বারা (শব্দার্থময় কাব্যের মাধুর্য) জানা

যায়, তা'ই হল রীতি। বামন বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী- এই তিনপ্রকার রীতি স্বীকার করেছেন।[১৪২] তিনি পূর্বাচার্যদের বক্তব্যের অবতারণা করে বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন।

কাব্যের আত্মা সম্বন্ধীয় বামনের এই সিদ্ধান্তকে অন্যান্য আলংকারিকগণ সমর্থন করেন নি। তাঁরা বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে বামনের মতবাদকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথের মতে শরীরের অঙ্গসংস্থানের ন্যায় এই রীতি হল পদসংঘটনা- *যত্তু বামনেনোক্তং রীতিরাত্মা কাব্যস্যে'তি তন্ন, রীতেঃ সংঘটনাবিশেষত্বাত্, সংঘটনাযাশ্চাবযবসংস্থানরূপত্বাত্, আত্মনশ্চ তদ্ভিন্নত্বাত্*।[১৪৩] অর্থাৎ এই রীতি হল পদসংঘটনা বিশেষ। আর এই সংঘটনা কাব্যশরীরের অবয়ব-সংস্থানরূপ, একে কাব্যের আত্মা বলা যায় না। বিশ্বনাথ চারপ্রকার রীতি স্বীকার করেছেন- বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটী।[১৪৪]

দণ্ডী 'রীতি' শব্দের পরিবর্তে 'মার্গ' পদটি ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে রীতিগুলির পারস্পরিক সূক্ষ্মভেদের কথা উল্লেখ করে বহুবিধ মার্গের মধ্যে কেবলমাত্র গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতিই স্বীকার করেছেন।[১৪৫]

ভামহের মতে নির্দিষ্ট কোনো রীতির উপরে কাব্যের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে না। অলংকারযুক্ত, গ্রাম্যতারহিত, ন্যায়সঙ্গত, অর্থযুক্ত এবং শ্রুতিমধুর রচনা গৌড়ী রীতিতে রচিত হলেও উপাদেয় হয়ে ওঠে। অন্যথায় বৈদর্ভী রীতির রচনাকেও ভাল বলা যায় না।[১৪৬] তাঁর মতে কেবল মূর্খেরাই গতানুগতিকভাবে বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতির পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন।[১৪৭] আচার্য বামন এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন- *বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাত্ ততসমাখ্যা*।[১৪৮] অর্থাৎ অঞ্চলভেদে রচনার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে রীতিগুলির আঞ্চলিক নামকরণ করা হয়েছে।

আচার্য ভামহ থেকে শুরু করে বামন পর্যন্ত কোনো আলংকারিকই কাব্যে রসের প্রাধান্য বিষয়ে চিন্তা করেন নি। তাই বামন কাব্যের শোভাবর্ধক ধর্মকে গুণ বলেছেন এবং যা গুণের বিপরীত বা গুণের অপকর্ষ সাধক, তাকে বলেছেন দোষ।

আচার্য বামন গুণকে রসের ধর্ম না বলে রসকেই গুণের অঙ্গ বলেছেন। আচার্য আনন্দবর্ধন অবশ্য রসের আশ্রয়স্থিত ধর্মকে গুণ বলেছেন- *তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ*।[১৪৯] তিনি মাধুর্য ওজো ও প্রসাদগুণ স্বীকার করেছেন।[১৫০] আচার্য মম্মট আনন্দবর্ধনের

গুণ সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি আনন্দবর্ধনের গুণ-বিষয়ক বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে গুণ হল আত্মার শৌর্যাদি গুণের মতো কাব্যের আত্মারূপ, যা রসের উৎকর্ষ বিধায়ক এবং অপরিহার্য ধর্ম-

যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয ইবাত্মনঃ।

উত্কর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতযো গুণাঃ॥[১৫১]

*সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ পূর্বাচার্য আনন্দবর্ধন ও মম্মটের গুণ-বিষয়ক আলোচনার অনুসরণে স্বকীয় বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন। বিশ্বনাথও গুণকে রসের ধর্ম বলেছেন।[১৫২] তিনি রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে মম্মটোক্ত চিত্তবৃত্তির আধারে গুণের বিভাজন করেছেন। রসানুভূতির সময় চিত্তের তিনপ্রকার অবস্থা থাকে- দ্রুতি বিস্তার এবং ব্যাপ্ত। এই অবস্থাগুলির নিরিখে বিশ্বনাথ ও মম্মট তিনপ্রকার গুণ স্বীকার করেছেন যথা- চিত্তে দ্রুতি বা দ্রবীভাব হলে হয় মাধুর্য। চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তত্ব হলে হয় ওজোগুণ এবং প্রসাদ গুণ হয় চিত্তের ব্যাপ্তির দ্বারা।

গুণ ও অলংকার উভয়ই রসের ধর্ম। উভয়ই রসের উৎকর্ষ বিধান করে। তাহলে গুণ ও অলংকারের মধ্যে পার্থক্য কি? এর উত্তরে বামন বলেছেন- *কাব্যশোভাযাঃ কর্তারো ধর্মা গুণাস্তদতিশযহেতবস্ত্বলংকারাঃ*।[১৫৩] অর্থাৎ যা কাব্যের শোভা বর্ধন করে; তাকে বলে গুণ। আর অলংকার এই শোভাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অতএব তাঁর মতে কাব্যের আত্মা হল রীতি, রীতির আত্মা হল গুণ। তাই গুণসমূহ স্বভাবতই কাব্যের নিত্য বিষয়। কিন্তু অলংকারসমূহ অনিত্য।

আচার্য ভোজরাজ গুণ ও অলংকারের মধ্যে গুণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে অলংকার সমৃদ্ধ হলেও গুণহীন কাব্য শ্রবণের অযোগ্য-

অলংকৃতমযি শ্রব্যং ন কাব্যং গুণবর্জিতম্।

গুণযোগস্তযোর্মুখ্যো গুণালংকারযোগযো॥[১৫৪]

আচার্য মম্মট বামনের গুণ ও অলংকার বিষয়ক মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে একটি বা কিছু সংখ্যক গুণ থাকলেই তা কাব্যপদবাচ্য হতে পারে না। যেমন- *অদ্রাবদ্র প্রজ্জ্বলিত্যগ্নিঃ* প্রভৃতিতে ওজোগুণ থাকলেও তাকে কাব্য বলা যায় না। আবার যদি সমস্ত গুণ

থাকলে কোনো রচনা কাব্যপদবাচ্য হয়, তাহলে গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতির রচনাকে কাব্য বলা যায় না। কারণ এই দুটি রীতিতে সমস্ত গুণ থাকে না।[১৫৫]

অবশ্য আচার্য মম্মটের এই বক্তব্য পণ্ডিত-সমাজের কাছে তেমন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়নি। বস্তুত বামন রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন এবং গুণকে বলেছেন রীতির আত্মা। তিনি রীতিগুলির মধ্যে সমস্ত গুণসমন্বিত বৈদর্ভীকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। কিন্তু কেবল বৈদর্ভীকে কাব্যের আত্মা বলে উল্লেখ করেন নি। তিনি গুণের বিচারে রীতির উৎকর্ষতা এবং রীতির বিচারে কাব্যের উৎকর্ষতা বিধান করেছেন। অতএব বামনের গুণ-রীতি সিদ্ধান্তের দ্বারা কাব্যের উত্তমাধম বিভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে, কাব্য-অকাব্যের ভাগ নির্দেশিত হয়নি। *কামধেনু* টীকায় এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে- *তথা চ পরমতে ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যে ধ্বনিরুত্তমং কাব্যং, গুণভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যং মধ্যমং কাব্যং, সম্ভাবনামাত্রে চিত্রমবরং কাব্যমিতি কাব্যভেদাঃ কথিতাঃ। তথাঽত্রাপি গুণসামগ্র্যে বৈদর্ভী, অবিরোধগুণান্তরানিরোধেন ওজঃকান্তিভূয়িষ্ঠত্বে গৌড়ীয়া, মাধুর্যসৌকুমার্যপ্রাচুর্যে পাঞ্চালীতি কাব্যভেদাঃ কথ্যন্তে*।[১৫৬]

ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের দ্বারা যেমন উত্তম-মধ্যমাদি কাব্যভেদ কথিত হয়েছে, তেমনই বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিভেদের মাধ্যমে কাব্যভেদই নিরূপিত হয়েছে।

বামন ভামহ-স্বীকৃত তিনটি গুণ যথা মাধুর্য, ওজো ও প্রসাদকে গ্রহণ না করে দণ্ডী ও ভরতোক্ত দশটি গুণ স্বীকার করেছেন। এরপর তিনি সেগুলিকে শব্দ ও অর্থভেদে দুইভাগে ভাগ করেছেন। ভোজরাজ চব্বিশটি শব্দগুণ ও চব্বিশটি অর্থগুণ অর্থাৎ সর্বসমেত আটচল্লিশটি গুণ স্বীকার করেছেন। ভোজরাজপ্রদত্ত গুণ-লক্ষণের সঙ্গে বামনের গুণ-লক্ষণের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের গুণ-লক্ষণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত গুণ কোনো একটি নির্দিষ্ট রচনায় থাকা সম্ভব নয়। যেমন- কোনো রচনায় যদি ওজোগুণ (বামন প্রদত্ত লক্ষণানুসারে) থাকে, তবে সেখানে মাধুর্যগুণ থাকা সম্ভব নয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে একটি গুণ থাকলে অপরটির প্রয়োজনীয়তাই আর থাকেনা। এর কারণ হল সমস্ত গুণগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। যে রচনায় ওজোগুণ থাকে, সেখানে স্বাভাবিকভাবে শ্লেষগুণও থাকে। তা সত্ত্বেও এইদুটি ভিন্ন নামে স্বীকৃত। আচার্য বামন সমাধিগুণ সম্বন্ধে বলেছেন- যেখানে গভীর মনঃসংযোগের দ্বারা রচনার অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতীতি হয়, তাকে সমাধিগুণ বলে। কিন্তু

যেখানে গভীর মনযোগ সত্ত্বেও রচনার অর্থপ্রতীতি না হয়, তবে তা কাব্যপদবাচ্যই নয়। কারণ কাব্যে শ্লেষ বা ব্যঞ্জনার স্বাভাবিক ধর্ম হল অর্থের বহুরূপতা। কিন্তু কোনো রচনায় যদি কোনোপ্রকার অর্থের প্রতীতিই না হয়, তবে তা কাব্য হয় কীভাবে! বস্তুত সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বুদ্ধিকে চমৎকৃত করার জন্য প্রচুর সংখ্যক গুণের জন্ম দিয়েছেন। পারস্পরিক অসঙ্গতির কারণে পরবর্তীকালে সেগুলি সাধারণের কাছে আর গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

আচার্য আনন্দবর্ধনের পরবর্তীকালে মম্মট, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ দৃঢ়ভাবে মাধুর্য, ওজো এবং প্রসাদ এই তিনটি গুণই স্বীকার করেছেন[১৫৭] এবং অন্যান্য গুণগুলিকে এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে উপজীব্য কাব্যগুলির ক্ষেত্রেও মাধুর্য, ওজো ও প্রসাদগুণ নির্ণয়ের মাধ্যমে রীতি-সমীক্ষা করা হল-

৪.৩.১ মাধুর্যগুণ: *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত *মাতৃশতকে* কবি তাঁর মাতার মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে মাধুর্যগুণের প্রয়োগ করেছেন-

নহি বিরঞ্চিপদং ন শিবাস্পদং ন চ মুকুন্দপদং তপসা বৃণে।

ননু বৃণে পরমাস্পদমঞ্জসা যদি তু মাতুরদোঽদ্রিভুবোঽথবা॥[১৫৮]

রসোত্তীর্ণ বাক্যই হল মধুর। আর মধুর রচনাই মাধুর্যগুণ-সমন্বিত। বস্তুত রস থাকে বাক্যে বা বর্ণনীয় বস্তুতে। সহৃদয় ব্যক্তিগণ সেই রস মধুকরের ন্যায় আস্বাদন করে আনন্দিত হন। তাই আচার্য দণ্ডী বলেছেন-

মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।

যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনৈব মধুব্রতাঃ॥[১৫৯]

সমস্ত আলঙ্কারিকই মাধুর্যগুণ স্বীকার করেছেন। আচার্য বামন শব্দগত মাধুর্যের লক্ষণ করেছেন- *পৃথকপদত্বং মাধুর্যম্।*[১৬০] 'পৃথকপদত্ব' বলতে বোঝায় দীর্ঘসমাসহীন পৃথক পৃথক পদ। যে বাক্যে দীর্ঘসমাস থাকে না, ছোট ছোট পদের দ্বারা বিন্যস্ত থাকে, তাকে মাধুর্যগুণ বলে। আর অর্থগত মাধুর্যের লক্ষণে তিনি বলেছেন- *উক্তিবৈচিত্র্যং মাধুর্যম্।*[১৬১] অর্থাৎ উক্তির বৈচিত্রই হল মাধুর্যগুণ।

আচার্য বিশ্বনাথ মাধুর্যের লক্ষণ করেছেন- *চিত্তদ্রবীভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে।*[১৬২] অর্থাৎ চিত্তের দ্রবীভাবরূপ আনন্দই হল মাধুর্যগুণ। অর্থাৎ যে রচনায় সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত

দ্রবীভূত হয়, তাকে বলে মাধুর্য। তাঁর মতে সম্ভোগশৃঙ্গার, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার এবং শান্তরসে এই গুণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। আচার্য মম্মট শব্দগত মাধুর্য স্বীকার করেছেন। তবে তিনি অর্থগত মাধুর্যকে অনবীকৃতত্ব দোষের অভাব বলেছেন।

মাধুর্যব্যঞ্জক বর্ণের সন্নিবেশ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেছেন- এখানে ট, ঠ, ড এবং ঢ এই মূর্ধা বর্ণগুলি থাকে না। বর্গের অন্যান্য বর্ণগুলি অন্তিম বা অনুনাসিক (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। র ও ণ বর্ণ লঘু হয়। মাধুর্যগুণ সমাসহীন বা স্বল্পসমাসযুক্ত হয়, এখানে দীর্ঘসমাস থাকে না।[১৬৩]

নহি বিরঞ্চিপদং প্রভৃতি শ্লোকে 'বিরঞ্চিপদং' পদের চ, 'মুকুন্দপদং' পদের দ-কার এবং অঞ্জসা' পদের জ-কার তাদের নিজ নিজ বর্গের অন্তিম বর্ণের (ঞ, ন, ঞ) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং অল্প সমাস রয়েছে। শান্তরসাত্মক এই শ্লোকে কবির স্বীয় মাতার প্রতি অন্তরের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। কবি তাঁর মাতার চরণদ্বয়কে সমস্ত পারমার্থিক প্রাপ্তির উর্ধে রেখেছেন। এখানে কবির বর্ণনা চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। তাই এখানে মাধুর্যগুণ।

নব্যভারতশতকে ভারতবর্ষের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

যস্য রক্ষা কৃতা ভূপৈঃ সূর্যচন্দ্রকুলোদ্ভবৈঃ।

জযতাদ্ ভারতং দেশো বৃন্দারকসুরক্ষিতঃ॥[১৬৪]

অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্রবংশীয রাজাগণ যাকে রক্ষা করতেন সেই দেবরক্ষিত ভারতের জয়।

আলোচ্য শ্লোকের *সূর্যচন্দ্রকুলোদ্ভবৈঃ* পদের দ-কার এবং *বৃন্দারক* পদের দ-কার বর্গের অন্তিম বর্ণ ন-কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই শ্রোকে স্বল্প সমাসবদ্ধ পদ রয়েছে এবং কবির বর্ণনা সরসতা লাভ করেছে। অতএব এখানে মাধুর্যগুণ।

এছাড়া মাধুর্যগুণের দ্বারা বিন্যাস্ত অন্যান্য কিছু শ্লোক-

প্রাচী দিবস্পতি সভাজনতোরণাভা কৌবেরদিক্ তুহিনভূধরভূষিতাঙ্গী।

সা বারুণী যমদিশা চ সমেত্য সর্বাঃ কুর্বন্তু মঙ্গলময়ং মম সূপ্রভাতম্॥[১৬৫]

এখানে 'ভূষিতাঙ্গী' পদের গ-কার, 'কুর্বন্তু' পদের ত-কার এবং 'মঙ্গলময়ং' পদের গ-কার বর্গের অন্তিম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া এই শ্লোকে অল্প সমাস রয়েছে। সূর্য প্রভৃতি দেবগণের নিয়ন্তারূপে বারুণীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।

ইতি মত্বেব ছাগঃ কিং শিরচ্ছেদে ন সীদতি॥[১৬৬]

এই শ্লোকে 'জায়ন্তে', 'ম্রিয়ন্তে' এবং 'ক্ষুদ্রযন্তবঃ' এই পথগুলিতে ত বর্গের আদি বর্ণ ত-কার অন্তিম বর্ণ ন-কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং কোমল পদ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ব্যঙ্গ্যার্থমূলক শ্লোকটি মাধুর্য-গুণব্যঞ্জক।

রম্যাশকুন্তলা ব্যঞ্জনাকুন্তলা মাঘমেঘাঞ্চিতা বাণরেখাংকিতা...।[১৬৭] এই পদ্যাংশেও মাধুর্যের বর্ণসংঘটা দেখা যায়।

বসন্তি রাত্রৌ সসুখং কুলায়ে প্রিয়াদ্বিতীয়া জনয়ন্তি শাবান্।

বকাঃ কৃতঘ্নাঃ স্বপুরীষপুঞ্জৈঃ দহন্তি যস্ত্বাং বট! তেন দূয়ে॥[১৬৮]

এখানে 'বসন্তি', 'জনয়ন্তি' এবং 'দহন্তি' পদের ত-কারগুলি বর্গের অন্তিম বর্ণ ন-কারে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'পুঞ্জৈঃ' পদে চ-বর্গের অন্তিম বর্ণ ঞ-কারের সঙ্গে জ-কার যুক্ত হয়েছে। এবং বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। অতএব এখানে মাধুর্যগুণ রয়েছে।

৪.৩.২ ওজোগুণ: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের অভিরাজসপ্তশতীতে ওজোগুণের প্রয়োগ তেমন নেই। সম্ভবত কবি আড়ম্বরপূর্ণ শব্দপ্রয়োগে বিরত থেকে তাঁর কাব্যকে কাঠিন্যমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তবে প্র*ভাতমঙ্গলশতক* এবং *ভারতদণ্ডকে* ওজোগুণের প্রয়োগ দেখা যায়।

বামনের মতে বন্ধের গাঢ়ত্বই হল ওজো- *গাঢবন্ধত্বমোজঃ*।[১৬৯] অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষরের বহুল প্রয়োগ, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়, প্রথম ও তৃতীয় তথা দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সংযোগ, রেফযুক্ত, বিসর্গযুক্ত, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় বর্ণ এবং সমাসবাহুল্যযুক্ত রচনাকে ওজোগুণ বলা হয়। এটি হল শব্দগত ওজোগুণের লক্ষণ। অর্থগত ওজোগুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বামন বলেছেন- *অর্থস্য প্রৌঢিরোজঃ*।[১৭০] অর্থাৎ অভিধেয় অর্থের প্রতিপাদনবৈচিত্র্যই হল ওজোগুণ। তাঁর মতে অর্থের এই প্রৌঢ়ি পাঁচপ্রকার-

পদার্থে বাক্যবচনং বাক্যার্থে চ পদাভিধা।

প্রৌঢির্ব্যাসসমাসৌ চ সাভিপ্রাযত্বমেব চ॥

অর্থাৎ (ক) বাক্যে এক পদের অর্থবোধের জন্য অনেক পদের কথন (খ) অনেক পদের অর্থবোধের জন্য এক পদের কথন (গ) কোনো অর্থকে বিস্তৃত করে বলা (ঘ) কোনো অর্থকে সংক্ষিপ্ত করে বলা এবং (ঙ) কোনো অর্থকে বিশেষ অভিপ্রায়ে বলা- এই পাঁচপ্রকার প্রৌঢ়ির দ্বারা ওজোগুণ নিষ্পন্ন হয়।

আচার্য বামন ওজোগুণে বন্ধের গাঢ়ত্বের কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উপরে জোর দিয়েছেন। সমাসবদ্ধ পদের উপর তেমন জোর দেন নি। অন্যদিকে দণ্ডী পদের সমাসবাহুল্যকেই ওজোগুণ বলেছেন- *ওজোঃ সমাসভূযস্ত্বমেতত্ গদ্যস্য জীবিতম্*।[১৭১] তাঁর মতে এই ওজোগুণ হল গদ্যকাব্যের প্রাণ। দণ্ডীপ্রদত্ত ওজোগুণের লক্ষণের সঙ্গে ভোজরাজ প্রদত্ত ওজো শব্দগুণের লক্ষণের শব্দার্থগত কোনো বৈষম্য নেই।

জগন্নাথোক্ত শব্দরূপ ওজোগুণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে- *সংযোগপরহ্রস্বৈশ্চ নৈকট্যেন প্রযুক্তৈরালিঙ্গিতো দীর্ঘবৃত্ত্যাত্মা গুম্ফ ওজোস*।[১৭২] অর্থাৎ সংযুক্তবর্ণ যার পরে থাকে সেরূপ হ্রস্ববর্ণের বাহুল্যকে বলা হয় ওজোগুণ। তাঁর শব্দগুণরূপ ওজের লক্ষণে বামনের লক্ষণের শব্দার্থগত সামঞ্জস্য দেখা যায়। যথা- *একস্য পদার্থস্য ৰহুভিঃ পদৈরভিধানং ৰহূনাং চৈকেন তথৈকস্য বাক্যার্থস্য ৰহুভির্বাক্যৈর্ৰহুব্যাখ্যার্থস্যৈকবাক্যার্থেনভিধানং বিশেষণানাং সাভিপ্রাযত্বং চেতি পঞ্চবিধমোজঃ*।[১৭৩] মম্মট ওজোগুণকে কেবল অর্থগুণরূপেই স্বীকার করেছেন। তিনি এর লক্ষণ করেছেন- *চিত্তস্য বিস্তাররূপদীপ্তত্বজনকমোজঃ*।[১৭৪] অর্থাৎ চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তত্বকে ওজো বলে। বিশ্বনাথ মম্মটের অনুরূপ ওজোগুণের লক্ষণ-

ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে।

বীরবীভতসরৌদ্রেষু ক্রমেণাধিক্যমস্যতু॥[১৭৫]

ক্রমান্বয়ে বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসে ওজঃ গুণের আধিক্য থাকে। এই গুণের বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেছেন-

বর্গস্যাদ্যতৃতীযাভ্যাং যুক্তৌ বর্ণৌ তদন্তিমৌ॥

উপর্যধো দ্বযোর্বা সরেফৌ টঠডঢৈঃ সহ।

শকারশ্চ ষকারশ্চ তস্য ব্যঞ্জকতাং গতা॥

তথা সমাসো বহুলো ঘটনৌদ্ধত্যশালিনী।[১৭৬]

ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ তথা প-বর্গের যেকোন বর্ণ বর্গের প্রথম (ক, চ, ট, ত, প) বর্ণ ও তৃতীয় (গ, জ, ড, দ, ব) বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বর্গের অন্তিম বর্ণ ওজোগুণের ব্যঞ্জক হয়। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যে বর্গের হবে, সেই বর্গের অন্তিম বর্ণই যে হতে হবে- এইরকম কোনো নিয়ম নেই। অর্থাৎ অন্য বর্গের অন্তিম বর্ণও হতে পারে। এছাড়া উপরে, নিচে, দুইদিক থেকে অথবা রেফের সঙ্গে যুক্ত ট, ঠ, ড এবং ঢ শ-কার এবং ষ-কারের সঙ্গে যুক্ত হলেও ওজোগুণ হয়।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র নব্যভারতশতকে বর্তমান সমাজে ধর্ম, অর্থ ও কাম ও মোক্ষের সাধনে মানুষ কীভাবে সততা ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত থেকে কক্ষচ্যুত হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে বলতে ওজোগুণের প্রয়োগ করেছেন-

নৈব ধর্মোঽস্তি নিষ্কামঃ কামো ন ধর্মসম্মতঃ।

ধর্মার্জিতো ন চাপ্যর্থঃ সন্যাসস্তু নভস্সুমম্॥[১৭৭]

অর্থাৎ (এইযুগে) কোনো ধর্ম নিষ্কাম নয়, কামও ধর্মসম্মত নয়। অর্থ অপার্জনের পথও ধর্মানুসারী নয়, আর সন্ন্যাস বা মোক্ষানুসন্ধান তো আকাশকুসুম (অলীক বা অভাবনীয়)। আলোচ্য শ্লোকে রেফের প্রয়োগ, ষ-কার এবং ম-কার ও স-কারের দ্বিত্ব রয়েছে। এই শ্লোকে অবশ্য দীর্ঘ সমাস নেই। তবে বর্ণবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ওজোগুণ হয়েছে।

প্রভাতমঙ্গলশতকে শ্রীনারায়ণের অসামান্য লীলার বর্ণনাবসরে ওজোগুণের একটি সার্থক প্রয়োগ রয়েছে-

মাযাবগুণ্ঠনবিমোহিতসর্বলোকঃ স্বেচ্ছাবিখণ্ডিততদীযদুরন্তবন্ধঃ।

লীলাবিলাসনিপুণশিশুকেলিলীনো নারাযণো দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[১৭৮]

যিনি মায়াশক্তির দ্বারা ত্রিলোককে মোহিত করে রেখেছেন, লীলার অনুরূপ স্বশরীরকে বিখণ্ডিত করেছেন, শিশুরূপে যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই শ্রীনারায়ণ নবপ্রভাত দান করুন। আলোচ্য শ্লোকে শ-কার, ঠ-কার, ড-কার, রেফ এবং দীর্ঘসমাস রয়েছে। অতএব শ্লোকটি ওজোগুণ প্রধান।

এছাড়া ওজোগুণান্বিত আরও কয়েকটি শ্লোক-

বন্দে বিশালহৃদযং সদযং জনন্যা যস্মিন্ সমুচ্ছলতি গূঢকৃপোর্মিসিন্ধু।

পারুষ্যমীনছলনক্রনিকাযহীনং পীনং ত্রিলোকশরণং প্রলযে সমেষাম্॥[১৭৯]

এই শ্লোকে শ-কার, ষ-কার, ঢ-কার, চ্ছ, এবং সমাসের ব্যবহার রয়েছে। তাই শ্লোকটি ওজোগুণ-ব্যঞ্জক।

চিত্তভ্রমং নিশশমং টংকতে ভাতি কান্তার-শৈলপ্রপাতাপগাবাটিকা-গ্রামদেবালযপ্রাঙ্গণাট্টালিকা-তোরণদ্বার-হর্ম্যাবলীপর্ণশালা-লতাগুল্মকুঞ্জাদিভির্ভূষিতং...।[১৮০] আলোচ্য অংশে সুদীর্ঘ সমাস, শ-কার, রেফ, ট-কারের বহুল প্রয়োগ রয়েছে।

শশো ন চৈনো ন নভোঽবভাসনং ন চাপি গোবিন্দশরীরধর্মিতা।

অযে হিমাংশো! স্ফুটিতন্নু ভাণ্ডকং কলংকলেখা তব পার্বতী শিলা॥[১৮১]

এই শ্লোকে শ-কার, ট-কার ও ড-কার রয়েছে। ন-কারের দ্বিত্ব হয়েছে এবং সমাসবদ্ধ পদ রয়েছে। তাই এই শ্লোকে ওজোগুণ রয়েছে।

৪.৩.৩ প্রসাদগুণ: *অভিরাজসপ্তশতীর* শতকগুলিতে প্রসাদগুণই সর্বাধিক প্রযুক্ত হয়েছে। প্রসাদগুণে একাধারে থাকে শব্দের শিথিলতা। অন্যদিকে থাকে অর্থের সারল্য। প্রসিদ্ধ অর্থের প্রয়োগ থাকে বলেই প্রসাদগুণে অর্থের প্রতীতি দ্রুত হয়। আচার্য দণ্ডী প্রসাদ সম্বন্ধে বলেছেন- *প্রসাদবত্ প্রসিদ্ধার্থম্।*[১৮২] অর্থাৎ যে বাক্যের বিষয় হয় প্রসিদ্ধ এবং অর্থবোধ দ্রুত হয়, তাকে বলে প্রসাদগুণ। ভোজরাজ দণ্ডীর অনুরূপ লক্ষণ করেছেন- *প্রসিদ্ধার্থপদত্বং যত্ স প্রসাদো নিগদ্যতে।*[১৮৩] বামন শব্দগুণরূপ প্রসাদের লক্ষণ করেছেন- *শৈথিল্যং প্রসাদঃ।*[১৮৪] অর্থাৎ বন্ধের শৈথিল্যই হল প্রসাদ। আর অর্থগুণরূপ প্রসাদের লক্ষণ করেছেন- *অর্থবৈমল্যং প্রসাদঃ।*[১৮৫] অর্থাৎ অর্থের বিমলতাই হল প্রসাদগুণ। লক্ষণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে- *অর্থস্য বৈমল্যং প্রযোজকমাত্রপরিগ্রহঃ প্রসাদঃ*। অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের অনুরূপ পদপ্রয়োগের দ্বারা অর্থগত যে বৈমল্য, তাকে প্রসাদ বলে। প্রসাদগুণে পদ বা বাক্যে অর্থের প্রতীতির জন্য অন্বয়, অধ্যাহারাদির প্রয়োজন হয় না। তাই আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন আগুন যেমন শুকনো কাঠকে দ্রুত গ্রাস করে, ঠিক তেমনই প্রসাদগুণ অতিদ্রুত চিত্তকে অধিকার করে। তাঁর মতে এই গুণ যেকোনো রসেই প্রযুক্ত হতে পারে।[১৮৬] আচার্য ভরত প্রসাদগুণের লক্ষণ করেছেন-

অপ্যনুক্তো বুধৈর্যত্র শব্দোঽর্থো বা প্রতীয়তে।

সুখশব্দার্থসংযোগাত্ প্রসাদঃ পরিকীর্ত্যতো॥[১৮৭]

যেখানে সহজবোধ্য শব্দ ও অর্থের দ্বারা অনুক্ত শব্দার্থ (পণ্ডিতগণের দ্বারা) বোধগম্য হয় তাকে প্রসাদগুণ বলে।

আচার্য বামনের মতে ওজোগুণের সঙ্গে সংমিশ্রণ হলে তবেই প্রসাদগুণ হয়।[১৮৮] বস্তুত ওজোগুণের যদি বিপর্যয় ঘটে, তবে সেক্ষেত্রে দোষ স্বীকার করতে হয়। আবার প্রসাদের বিপর্যয় হলেও দোষ স্বীকার্য। তাই ওজো ও প্রসাদের মিশ্রণকে প্রসাদগুণ বলা হয়েছে। এখানে তাদের বিপর্যয় ধরা হয় না। বামনের মতে এটি একটি অনুভবসিদ্ধ বিষয়। এইপ্রসঙ্গে তিনি একটি উদাহরণের অবতারণা করেছেন-

করুণপ্রেক্ষণীযেষু সম্প্লবঃ সুখদুঃখযোঃ।

যথাঽনুভবতঃ সিদ্ধস্তথৈবৌজঃ প্রসাদযোঃ॥[১৮৯]

অর্থাৎ করুণরসাশ্রিত নাটক দর্শনে যেমন প্রেক্ষকের মনে একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখের অনুভূতি সম্ভব, তেমন পরস্পরবিরুদ্ধ ওজো ও প্রসাদগুণের মিশ্রণ অনুভবসাপেক্ষ বিষয়।

অভিরাজসপ্তশতীতে প্রসাদগুণের প্রয়োগ-

জীবনং ভৌতিকং জাতং নব্যভারতমন্দিরে।

কদাচিত্কমহো সত্যং সর্বতোভাবিচানৃতম্॥[১৯০]

বুদ্ধিরূপা শুভা যাসৌ প্রতিজীবং নু দীপ্যতি।

সা সৃষ্টিরচনারূপা মাতৃশক্তিশ্চিরঞ্জযেত্॥[১৯১]

উপরোক্ত শ্লোকদুটিতে কোমল পদাবলী রয়েছে। শ্রবণমাত্রই অর্থাববোধ হয়। শ্লোকদুটিতে প্রসাদগুণ রয়েছে। *অভিরাজসপ্তশতীর* কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত গুণগুলির মধ্যে প্রসাদগুণই অধিক রয়েছে। তাই অর্থপ্রতীতির ক্ষেত্রে তেমন কাঠিন্য নেই। শ্রবণমাত্রই অর্থোপলব্ধি হয়।

অভিরাজসপ্তশতীর অনেক শ্লোকে মাধুর্য, ওজো এবং প্রসাদগুণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এইরকম কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন মাধুর্য ও ওজোগুণের সমন্বয়-

আসন্দিকৈকরক্ষার্থং রাজনীতিবিশারদাঃ।

মৌঢ্যশাঠ্যগ্রহগ্রস্তাঃ বিক্রীণন্তি ধরামিমাম্॥[১৯২]

এই শ্লোকে 'আসন্দিক' এবং *বিক্রীণন্তি* পদ দুটিতে ন-কার ও ত-কারের সমন্বয়ে মাধুর্যগুণ হয়েছে। অন্যদিকে *মৌঢ্যশাঠ্য* পদটি ওজোগুণ-ব্যঞ্জক।

মাধুর্য প্রসাদ এবং ওজোগুণের সমন্বয়-

রূপং কণ্ঠং কলৌ দৃষ্ট্বা জনানামুষ্ট্রগর্দভাঃ।

পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপমহো ধ্বনিঃ॥[১৯৩]

আলোচ্য শ্লোকে *কণ্ঠ, দৃষ্ট্বা, উষ্ট্র* প্রভৃতি শ্লোকে ওজোগুণ-ব্যঞ্জক বর্ণসংস্থান রয়েছে। আবার *প্রশংসন্তি* পদে ন-কার এবং ত-কারের সমন্বয়ে মাধুর্যগুণ হয়েছে। শ্লোকের অর্থ অতীব সহজবোধ্য। শ্রবণমাত্রই অর্থের প্রতীতি হয়। তাই প্রসাদগুণও স্বীকার্য।

অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত শতকগুলিতে ওজোগুণের আধিক্য তেমন নেই। *প্রভাতমঙ্গলশতক* ও *ভারতদণ্ডকের* রচনায় ওজোগুণের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য শতকগুলিতে ওজোগুণ স্বল্পই ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণবিন্যাসের নিরিখে মাধুর্যগুণ অনেক শতকে দেখা যায়। কিন্তু কাব্যিক ব্যঞ্জনার দিকটি তেমন চোখে পড়ে না। এই শতকসংগ্রহে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় প্রসাদগুণ। রাজেন্দ্র মিশ্র সমগ্র কাব্যে দুরূহ শব্দপ্রয়োগে বিরত থেকেছেন। এই শতককাব্যগুলির শ্লোকগুলির অর্থপ্রতীতির জন্য অন্বয়াদির প্রয়োজন হয় না। শ্রবণমাত্রই অর্থোপলব্ধি হয়ে যায়।

৪.৩.৪ বৈদর্ভী রীতি: রাজেন্দ্র মিশ্র কর্মকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে ফলের অত্যধিক প্রত্যাশা না করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বকর্মে সর্বদা ব্যাপৃত থাকা উচিত। এইপ্রসঙ্গে তিনি চাতককে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

নিরন্তরং পীহু পীহু প্রকামং উচ্চৈ রটন্ চাতক! যদ্ বিভাসি।

স্যাত্তেন সিদ্ধিস্তব কাপ্যভীষ্টা ন বাঽথবা কিন্তু পরং ব্রতন্তে॥[১৯৪]

অর্থাৎ সর্বদা পীহু পীহু রবে উচ্চস্বরে ডাকলেই তোমার কোনো অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। কিন্তু এই তো তোমার পরম ব্রত।

বৈদর্ভী রীতি সম্বন্ধে আচার্য বামন বলেছেন- *সমগ্রগুণোপেতা বৈদর্ভী*।[১৯৫] এর বৃত্তিতে বলা হয়েছে- *সমগ্রৈঃ ওজঃপ্রসাদপ্রভৃতিভিঃ গুণৈঃ উপেতা বৈদর্ভী নাম রীতিঃ।* অর্থাৎ সকল গুণে বিভূষিত রীতি হল বৈদর্ভী। বর্ণনীয় বিষয়ের চমৎকারিত্ব এবং সৌন্দর্যের জন্য বৈদর্ভী রীতি কবি তথা সহৃদয়ের কাছে আদরণীয়। আচার্য বামন তাঁর অলংকারশাস্ত্রে বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে জনৈক প্রাচীন আলংকারিক প্রদত্ত বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন-

অস্পৃষ্টা দোষমাত্রাভিঃ সমগ্রগুণগুম্ফিতা।

বিপঞ্চীস্বরসৌভাগ্যা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥[১৯৬]

অর্থাৎ অসাধু, অসংবদ্ধ, গ্রাম্য প্রভৃতি কাব্যগত দোষহীন তথা মাধুর্য, ওজো, শ্লেষ, প্রসাদ প্রভৃতি সমস্ত গুণযুক্ত এবং বীণার স্বরের মতো শ্রুতিমধুর রীতিই হল বৈদর্ভী। ভোজরাজ এই লক্ষণটির অনুরূপ লক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে সমাসবিহীন, শ্লেষপ্রভৃতি গুণের দ্বারা বিন্যস্ত, বীণার নিক্কণের মতো মনোরঞ্জনকারী রীতি হল বৈদর্ভী।[১৯৭] আবার আচার্য বিশ্বনাথের মতে মাধুর্যগুণ-ব্যঞ্জক বর্ণসমন্বিত, সমাসহীন বা অল্পসমাসযুক্ত ললিতাত্মক রচনাই হল বৈদর্ভী রীতি-

মাধুর্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈঃ রচনা ললিতাত্মিকা।

আবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥[১৯৮]

উপর্যুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, *নিরন্তরং পীহু পীহু* প্রভৃতি শ্লোকে নিরন্তর, কিন্তু, ব্রতন্তে ইত্যাদি মাধুর্যগুণ-ব্যঞ্জক শব্দ রয়েছে। এই শ্লোকটি সমাসহীন। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থের মনোগ্রাহিতার দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এই শ্লোকটি বৈদর্ভী রীতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

অভিরাজসপ্তশতীতে আরও কিছু বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন মানুষের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে কবি বলেছেন-

জীবনং ভৌতিকং জাতং নব্যভারতমন্দিরে।

কাদাচিত্কমহো সত্যং সর্বতোভাবি চানৃতম্॥[১৯৯]

এছাড়া কবি তাঁর মাতার উদ্দেশ্যে বলেছেন-

নহি বিরঞ্চিপদং ন শিবাস্পদং ন চ মুকুন্দপদং তপসা বৃণে।

ননু বৃণে পরমাস্পদমঞ্জসা যদি তু মাতুরদোঽদ্রিভুবোঽথবা॥[২০০]

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘ সমাসের বাহুল্য নেই। মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দ, কোমল পদাবলী রয়েছে। তাই এখানে বৈদর্ভী রীতি হয়েছে।

৪.৩.৫ গৌড়ী বা গৌড়ীয়া রীতি: দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ, উৎকট পদের বাহুল্য এবং ওজঃ ও কান্তিগুণসমন্বিত রীতি হল গৌড়ী রীতি। এই রীতিতে মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণ থাকবে না। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিতে* গৌড়ী রীতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে- *ওজঃকান্তিমতী গৌডীযা*।[২০১] এর বৃত্তিতে বামন বলেছেন- *ওজঃ কান্তিশ্চ বিদ্যেতে যস্যাং সা ওজঃকান্তিমতী, গৌডীযা নাম রীতিঃ। মাধুর্যসৌকুমার্যযোরভাবাত্ সমাসৰহুলা অত্যল্বণপদা চ*। বামন তাঁর পূর্ববর্তী আলংকারিকের উক্তি বৃত্তিতে উল্লেখ করেছেন-

সমস্তত্র্যুদ্ভটপদামোজঃ কান্তিগুণান্বিতাম্।

গৌডীযামিতি গাযন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণা॥

অর্থাৎ সমাসবহুল, অতি উগ্রপদযুক্ত এবং ওজো ও কান্তিগুণান্বিত রীতিকে রীতি-বিচক্ষণরা গৌড়ি রীতি বলে থাকেন। ভোজরাজ তাঁর অলংকারশাস্ত্রে উপর্যুক্ত এই লক্ষণটির অনুরূপ শব্দার্থময় লক্ষণ প্রদান করেছেন।[২০২] আচার্য বিশ্বনাথ গৌড়ী রীতির লক্ষণ করেছেন-

ওজঃ প্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধ আডম্বর পুনঃ॥ সমাসৰহুলা গৌডী।[২০৩]

অর্থাৎ ওজোগুণের প্রকাশক (মহাপ্রাণ) বর্ণসমন্বিত, আড়ম্বরপূর্ণ এবং দীর্ঘসমাসযুক্ত রীতি হল গৌড়ি রীতি।

অভিরাজসপ্তশতীতে রাজেন্দ্র মিশ্র দেবী কাত্যায়নীর মহিমা-বর্ণনায় গৌড়ী রীতির প্রয়োগ করেছেন-

লংকেশ্বরাভিহননায যদীযসাহ্যং রামোঽপ্যকুণ্ঠভুজদণ্ডৰলো যযাচে।

সা চণ্ডমুণ্ডমহিষাদিকুলৈকহন্ত্রো কাত্যাযনী দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[২০৪]

অসীম বাহুবলশালী রামচন্দ্রও রাবণ বধের উদ্দেশ্যে যাঁর সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন, চণ্ড, মুণ্ড প্রভৃতি অসুরের হন্তা সেই কাত্যায়নী নবপ্রভাত দান করুন।

এছাড়া মহাবীর হনুমানের বীরত্বব্যঞ্জক একটি শ্লোকেও গৌড়ী রীতির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়-

লাঙ্গুলৰদ্ধগিরিখণ্ডচলৎপ্রহারৈর্লংকাকলংকবিকলাং বিধুরাং প্রকুর্বন্।
স্কন্ধাধিরোপিতসলক্ষ্মণরাঘবেন্দ্রঃ প্রাভঞ্জর্দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[২০৫]

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে সমাসবাহুল্য, ওজোগুণপ্রধান আড়ম্বনপূর্ণ বর্ণ রয়েছে। অতএব উপর্যুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে এখানে গৌড়ী রীতি হয়েছে। প্রথম দুটি শ্লোকে যথাক্রমে দেবী চামুণ্ডা ও হনুমানের প্রশস্তিতে বীররসের প্রয়োগ করা হয়েছে। আলংকারিকদের মতে বীররসাত্মক রচনায় গৌড়ী রীতির প্রয়োগ অধিক প্রশস্ত। তাই বলা যায়, কবি এখানে গৌড়ী রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

৪.৩.৬ পাঞ্চালী রীতি: বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণসমূহ ব্যতীত অপর বর্ণাবলীর দ্বারা গঠিত পাঁচটি বা ছয়টি শব্দের সমাসযুক্ত রচনাকে পাঞ্চালী রীতি বলা হয়। এই রীতির লক্ষণে বামন বলেছেন- *মাধুর্যসৌকুমার্যোপপন্না পাঞ্চালী*।[২০৬] এর বৃত্তিতে বামন বলেছেন- *মাধুর্যেণ সৌকুমার্যেণ চ গুণেনোপপন্না পাঞ্চালী নাম রীতিঃ। ওজঃকান্ত্যভাবাদনুল্বণপদা বিচ্ছায়া চ।* অর্থাৎ মাধুর্য ও সুকুমার গুণে বিভূষিত রীতিকে বলা হয় পাঞ্চালী। ওজো ও কান্তিগুণের অভাবহেতু গাঢ়পদহীন, স্বল্পসমাসবিশিষ্ট এবং সুকুমার পদে বিভূষিত রীতিকে কবিগণ পাঞ্চালী রীতি বলেন। আচার্য ভোজের মতে পাঁচ বা ছয়টি শব্দের সমাসযুক্ত, ওজঃ ও কান্তিগুণান্বিত, মধুর ও সুকুমার রচনাকে কবিগণ পাঞ্চালী রীতি বলেন-

সমস্তপঞ্চষপদামোজঃ কান্তিসমন্বিতাম্।
মধুরাং সুকুমারাং চ পাঞ্চালীং কবযো বিদুঃ॥[২০৭]

আচার্য বিশ্বনাথ ভোজরাজের অনুরূপ লক্ষণ করেছেন- সমস্তপঞ্চষপদো ৰন্ধোঃ পাঞ্চালিকা মতা।[২০৮]

অভিরাজসপ্তশতীতে অভিরাজী দেবীর দুর্দশা বর্ণনাবসরে পাঞ্চালী রীতির প্রয়োগ করেছেন-

জ্বলিতাশালতা নূন্তাঃ স্বপ্নশ্চাপি খলীকৃতাঃ।

মরীচিকেব রঙ্কুণাং সজলাভূরদৃশ্যত॥[২০৯]

(হে অভিরাজী মাতা তোমার) আশালতা ভস্মীভূত হয়েছে, স্বপ্ন চুরি গেছে। স্বর্ণমৃগরূপ অদৃষ্ট তোমার মরীচিকার ন্যায় অদৃশ্য হয়েছে।

ভাগীরথী গঙ্গার প্রশস্তিতে কবি বলেছেন-

নারাযণপদপংকজজনিতা ব্রহ্মকমণ্ডলুজাতা।

বিধুশেখরকলকুন্তলমুষিতা নৃপতিভগীরথমাতা॥[২১০]

হে গঙ্গা! তুমি শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মকমণ্ডুল ধারিণী, চন্দ্রশেখরের কুন্তলস্থিত এবং নৃপতি ভগীরথের মাতা।

ভারতবর্ষের বনরাজির প্রশস্তি করে বলেছেন-

সা দেবদারুবনিকা নগরাজপৃষ্ঠে তচ্চাপি চন্দনবনং মলযাচলস্থম্।

প্রাচ্যাঞ্চ সুন্দরবনং ননু পশ্চিমাযাং কুর্বন্তু মে মরুবনং নবসুপ্রভাতম্॥[২১১]

উপর্যুক্ত শ্লোকগুলিতে ছোট ছোট সমাস, মাধুর্য ও সৌকুমার্য-ব্যঞ্জক শব্দ রয়েছে। অর্থপ্রতীতির সারল্য রয়েছে। পাঞ্চালী রীতি নির্ণায়ক মানদণ্ডের বিচারে এখানে পাঞ্চালী রীতি হয়েছে।

৪.৩.৭ লাটী রীতি: বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যবর্তী রচনা হল লাটী।[২১২] অর্থাৎ স্বল্প লালিত্যপূর্ণ ও স্বল্প আড়ম্বরপূর্ণ রচনাই হল লাটী। বিশ্বনাথ লাটী রীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে দুইজন আলংকারিক প্রদত্ত লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন-

মৃদুপদসমাসভগা যুক্তৈর্বর্ণৈর্ন চাতিভূষিষ্ঠা।

উচিতবিশেষণপুরিতবস্তুন্যাসা ভবেল্লাটী॥

গৌডী ডম্বরবদ্ধা স্যাদ্ বৈদর্ভী ললিতক্রমা।

পাঞ্চালীমিশ্রভাবেন লাটী তু মৃদুভিঃ পদৈঃ॥[২১৩]

অর্থাৎ মৃদু পদযুক্ত সমাসের দ্বারা মনোরম, অধিক যুক্তবর্ণের দ্বারা ভূষিত এবং উপযুক্ত বিশেষণের দ্বারা বিষয় বর্ণিত হয় যে রচনায়, সেই রীতিকে লাটী বলা হয়। গৌড়ী হল

আড়ম্বরময় রচনা, বৈদর্ভী ললিত রচনা, পাঞ্চালী হল গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতির মিশ্রিত রচনা আর লাটী হল কোমল পদযুক্ত রচনা।

কবির পিতৃ-বিয়োগ কালে সাংসারিক অবস্থা ও বিকলাঙ্গ অনুজ সুরেন্দ্রের প্রতিপালনে অভিরাজী দেবীর কৃচ্ছ্রসাধন সম্বন্ধে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত *নব্যভারতশতকের* ৪২ নং শ্লোকে লাটী রীতির প্রয়োগ করেছেন:

সদ্যঃ সন্দৃষ্টসংসারং সর্বথা বিকলেন্দ্রীযম্।

সুরেন্দ্রং মেঽনুজং দেবি! মাসমাত্রবযোমিতম্॥

আলোচ্য শ্লোকে 'সন্দৃষ্ট' পদটিতে 'ষ' ও ট-কার ওজোগুণ ব্যঞ্জক। 'সন্দৃষ্ট', 'বিকলেন্দ্রীয়', 'সুরেন্দ্র' এই পদগুলিতে দ-কার বর্গের অন্তিম বর্ণ ন-কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতএব বর্ণগুলি মাধুর্যব্যঞ্জক। এছাড়া 'বিকলেন্দ্রীয়' পদে সমাস রয়েছে এবং শ্লোকের অধিকাংশে কোমল পদাবলী রয়েছে। অতএব এখানে বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির সমন্বয়ে লাটী রীতি হয়েছে। এছাড়া কোমল পদসমন্বিত, সমাসবহুল লাটী রীতির উদাহরণ-

অলমাত্মপ্রশস্ত্যেত্থং প্রকৃতিমনুযাম্যহম্।

প্রভবতাত্পূর্ববৃত্তং জননীচরিতাশ্রিতম্॥[২১৪]

নানাবিচারমতবাদমতান্তরাণাং নানাশনব্যসনভাষণভূষণানাম্।

সুস্রোতসামিব সমুদ্রনিভাঽন্বিতিস্সাঽস্মৎসংস্কৃতির্দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[২১৫]

কুসুমসৌরভদীপ্তলসত্তটে পৃথুপলাশবিভাসিতসৈকতে।

বিততবিন্ধ্যমহীধরজীবিতে ত্বমিহ দীপ্যসি মেকলকন্যকে॥[২১৬]

আচার্য বামন রীতিকে সামান্যরূপে কাব্যের আত্মা বলেছেন। তিনি বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতি স্বীকার করলেও বৈদর্ভীকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। ফলে তাঁর উক্তির সামঞ্জস্য ব্যাহত হয়েছে। ভামহ এই বক্তব্যের সম্পর্ণ বিপরীত মতপ্রদান করেছেন। তাঁর মতে গ্রাম্যতা বর্জিত, শ্রুতিমধুর, অলংকারমণ্ডিত, ন্যায়সঙ্গত বাক্য গৌড়ীয়া হলেও তা উপাদেয় হয়। তা ব্যতীত বৈদর্ভী রীতির রচনাও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় না।[২১৭] কবির বিবক্ষার বিশেষত্বে স্থূলদৃষ্টিতে প্রতীয়মান দোষও যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যের অঙ্গ হতে পারে, সেইরকম গতানুগতিক

উৎকৃষ্ট গুণের অভাবেও কাব্যত্ব হতে পারে। তাই সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বামনের রীতিবাদের বিরোধিতা করেছেন তাঁর মতে- *যাঁহারা রীতি প্রণালীতে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, শব্দ ও অর্থের বিশেষ কতকগুলি গুণের ফলেই, কোন বাক্য বা বাক্যসমষ্টি কাব্য হতে পারে। এজন্য তাঁহারা শব্দ ও অর্থের সমালোচনা করিয়া কি জাতীয় গুণের যোগে প্রসিদ্ধ কাব্যগুলির কাব্যত্ব হইয়াছে, তাহা অনুশীলন করিয়া তাহার বিশ্লেষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ গুণের একত্র সঙ্গতি থাকলে কাব্যের কাব্যত্ব হয়। ফলে এই গুণগুলির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচারের প্রকাশ পাইতেছে। মানুষের চিত্তের প্রেরণার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাহা আপন চিত্তের চমৎকারিতার অনুকূল শব্দ ও অর্থ সঞ্চয় করে, ও উহাকে অনুকূল ভঙ্গীতে প্রকাশ করে। কাব্যোৎপত্তির এই নিগূঢ় তত্ত্বকথাটির দিকে তাহারা দৃষ্টি করেন নাই। বামনের পরবর্তী সমালোচকদিগের নিকট এই কথাটি ধরা পড়িয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা এই রীতির পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তীব্র সমালোচনার সঙ্গে দেখাইয়াছিলেন যে, গুণ না থাকার উপর কাব্যত্ব নির্ভর করে না।*[২১৮]

৪.৪ রস বিচার:

সংস্কৃত আলংকারিকগণের দৃষ্টিতে কাব্যে রসতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত শতককাব্যগুলি কতখানি রসানুবর্তী হয়ে উঠেছে, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা অবশ্য প্রয়োজন।

আচার্য ভরত রসসূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রসকে সরাসরি কাব্যের আত্মা না বললেও কাব্যের মুখ্যবস্তু যে রস, তা দৃঢ়ভাবে বলেছেন- *ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।*[২১৯] তাঁর অনেককাল পরে আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনির আলোচনাবসরে রসের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই রসতত্ত্বের আলোচনা মহর্ষি ভরত থেকে শুরু করে আনন্দবর্ধন, মম্মট, অভিনবগুপ্ত, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ তথা জগন্নাথের অলংকারশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দণ্ডী, ভামহ ও বামনের কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনায় রস সম্বন্ধে তেমন কিছু বলা হয়নি। তবে কালক্রমে কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় এই রসবাদ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

রস্ ধাতুর সঙ্গে অচ্ প্রত্যয় যোগে রস শব্দের নিষ্পত্তি। *রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ* এই অর্থে যা আস্বাদনযোগ্য, তাকে বলে রস। সহৃদয় সামাজিকগণ কাব্যপাঠের মাধ্যমে কাব্যরস আস্বাদন করে থাকেন। তাই একে রস নামে আখ্যায়িত করা হয়। রস শব্দের প্রথম

প্রয়োগ দেখা যায় বেদে। বৈদিক মন্ত্রসমূহে রস শব্দটি পানীয়, মিষ্ট তরল পদার্থ, আস্বাদ, আনন্দ, প্রাণ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্।

তস্মৈ সরস্বতী দূহে ক্ষীরং সর্পিমধূদকম্॥[২২০]

যে ব্রাহ্মণ মধুচ্ছন্দাদি ঋষিগণের দ্বারা পুষ্ট বেদের সার পবমান সোমের ঋচসমূহ পাঠ করেন, সরস্বতী স্বয়ং ক্ষীর, উদক, ঘৃত, মধু প্রভৃতিরূপে দোহিত হন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে পরব্রহ্মকে রস বলা হয়েছে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে যেমন প্রাণী পরমানন্দ লাভ করে, সেইরকম কাব্যরস আস্বাদন করে মানুষ অলৌকিক আনন্দ লাভ করে। তাই কাব্যের রসাস্বাদন জনিত আনন্দকে বলা হয় ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

সংস্কৃত আলংকারিকগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রসের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আচার্য ভরত স্পষ্টতই বলেছেন- *ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে*। অর্থাৎ রস ব্যতীত কোনো অর্থই প্রতিভাত হয় না। *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে- ত্যাগ ব্যতীত লক্ষ্মী যেমন শোভা প্রদান করে না, তেমনই রস ব্যতীত বাণী শোভিত হয় না।[২২১] এই রসতত্ত্ব সংস্কৃত কাব্যসমালোচনার শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক তত্ত্ব। আচার্য রুদ্রটের মতে কাব্যকে যত্নসহকারে রসসমৃদ্ধ করা উচিত। কারণ সরস কাব্যের দ্বারা অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে জীবনের পরম পুরুষার্থ ধর্মার্থপ্রভৃতি চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি সম্ভব-

ননু কাব্যেন ক্রিযতে সরসানামবগমশ্চতুর্বর্গে।

লঘু মৃদু চ নীরসেভ্যস্তে হি ত্রস্যন্তি শাস্ত্রেভ্যঃ॥

তস্মাত্তত্ কর্তব্যং যত্নেন মহীযসা রসৈর্যুক্তম্।[২২২]

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের আলোচনায় বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[২২৩] আর গুণ, অলংকার প্রভৃতি কেবল রসের সহায়করূপে থাকে।[২২৪] *দশরূপক*-কার আচার্য ধনঞ্জয় রস-সিদ্ধান্তকে সরাসরি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে-

রম্যং জুগুপ্সিতমুদারমথাপি নীচমুগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।

যদ্বাপ্যবস্তু কবিভাবকথাব্যমানং তন্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লোকে॥[২২৫]

অর্থাৎ রমণীয় অথবা ঘৃণ্য, উত্তম বা অধম, উগ্র বা আহ্লাদকারক, গভীর বা বিকৃত যা কিছুই হোক না কেন, এমন কোনো কবিকল্পিত বিষয় নেই, যা কবি ও সহৃদয়ের দ্বারা ভাবিত হয়ে রসত্বপ্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ কবিকল্পনার স্পর্শে যেকোনো বর্ণনা সহৃদয়ের হৃদয়ে রসোপলব্ধি ঘটাতে পারে।

আচার্য কুন্তক যদিও বক্রোক্তিবাদী আলংকারিক, তবু প্রসঙ্গ-বিশেষে তিনি রসের গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে কবির বাণী শুধুমাত্র কথা বা বর্ণনীয় বিষয়কে আশ্রয় করে থাকে না। নিরন্তর রসাস্বাদনক্ষম প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনন্তকালব্যাপী জীবিত থাকে।[২২৬] তিনিই প্রথম কাব্যরূপ অমৃতের রসাস্বাদনকে চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির চেয়েও উৎকৃষ্ট বলে স্বীকার করেছেন।[২২৭] ভোজরাজের মতে নির্দোষ, গুণ ও অলংকারমণ্ডিত কাব্য রসান্বিত হলে তা কীর্তি ও প্রীতিভাজন হয়।[২২৮] তিনি সমগ্র বাঙ্ময়কে বক্রোক্রি, রসোক্তি ও স্বভাবোক্তিভেদে ভাগ করেছেন এবং এই তিনটির মধ্যে রসোক্তিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[২২৯]

বিভিন্ন প্রস্থানের আলংকারিকগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করে অনুমান করা যায় যে, তাঁরা সরাসরি রসবাদকে সর্বোৎকৃষ্টরূপে স্বীকার করেন নি। আবার রসের গুরুত্বকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন নি। তাঁরা নিজ নিজ যুক্তিতে রসের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। মহর্ষি ভরতোক্ত রসতত্ত্বের প্রভাবেই হোক অথবা স্বকীয় প্রতিভার বলেই হোক, কাব্যে রসের প্রাধান্য তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে।

৪.৪.১ রসের স্বরূপ: মহর্ষি ভরত রসের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- *রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাত্*। যেহেতু রস আস্বাদিত হয়, তাই একে রস বলে। এই রস কীভাবে আস্বাদিত হয়? এর উত্তরে ভরত বলেছেন- *যথাহি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদযন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনযব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থাযিভাবানাস্বাদযন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি*।[২৩০] অর্থাৎ ভোজনরসিক ব্যক্তিগণ যেমন বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জনে সিক্ত অন্ন ভক্ষণ করতে করতে রসসমূহ আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করে, তেমনই সহৃদয় সামাজিকগণ নানা ভাব ও বাচিক, আঙ্গিক প্রভৃতি অভিনয়ের দ্বারা ব্যক্ত

স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করে আনন্দ উপভোগ করেন। এইপ্রসঙ্গে মহর্ষি ভরত দুটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন-

যথাৰহুদ্রব্যযুতৈর্ব্যঞ্জনৈর্বহুভির্যুতম্।

আস্বাদযন্তি ভুঞ্জানা ভক্তং ভক্তবিদো জনাঃ॥

ভাবাভিনযসংবদ্ধান্ স্থাযিভাবাংস্তথা বুধাঃ।

আস্বাদযন্তি মনসা তস্মান্নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥[২৩১]

ভোজ্য পদার্থের আস্বাদনের মতো কাব্যরসের আস্বাদনও অনুভবসাপেক্ষ বিষয়। বাক্যাদির দ্বারা অপর ব্যক্তিকে তার কিছুটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। তবে খাদ্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দ লোকোত্তর আনন্দ নয় এবং ভোজ্য পদার্থের কোনো মুখ্যরস থাকে না। অম্ল, মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, কটু- প্রত্যেকটি রস খাদ্যভেদে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আবার একাধিক রস একই ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়ে একটি মিশ্ররসের সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে কোনো রসই আর মুখ্য থাকে না। কিন্তু কাব্যে একাধিক রস থাকলেও মুখ্যরস কেবল শৃঙ্গার, বীর প্রভৃতিকে ধরা হয়। কাব্যে বিভিন্ন ভাব, অভিনয় থেকে একেকটি রসের প্রতীতি হয়। সেগুলির মধ্যে থেকে একটি মুখ্যরস বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণে* রসের স্বরূপ প্রদান করেছেন-

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

লোকোত্তরচমত্কারপ্রাণঃ কৈশ্চিত্ প্রমাতৃভিঃ।

স্বাকারবদভিন্নত্বেনাযমাস্বাদ্যতে রসঃ॥[২৩২]

অর্থাৎ এই রস সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভিন্ন তাই অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, জ্ঞেয়বস্তুর স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর ও লোকোত্তর চমৎকারজনক। কোনো কোনো প্রমাতাগণের দ্বারা এই রস নিজশরীরের মতো অভিন্নরূপে আস্বাদিত হয়ে থাকে।

জাগতিক বিষয় থেকে ভিন্ন আন্তরধর্ম হল সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হলে রজো ও তমোগুণ অভিভূত হয়। রসানুভূতির অবান্তর ভেদ থাকলেও রস মূলত এক ও অভিন্ন।

বিভাবপ্রভৃতি ও রতিপ্রভৃতির অনুভূতিই আনন্দ ও বিস্ময়রূপে অখণ্ড রসে পর্যবসিত হয়। এই রস তাই অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। এই রস কেবল আনন্দস্বরূপ। তাই বলা হয়েছে-

করুণাদাবপি রসে জাযতে যত্ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥[২৩৩]

সহৃদয়গণের চিত্তে করুণপ্রভৃতি রসও আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটায়। যদি কাব্যে করুণরসের দ্বারা সহৃদয়ের মনে দুঃখের উদ্রেক ঘটত, তাহলে তারা করুণরসাশ্রিত কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করতেন না। কাব্যের করুণপ্রভৃতি রস বস্তুত লোকোত্তর আনন্দ দান করে। কাব্যরসাস্বাদনে চিত্তবিস্তাররূপ বিস্ময় ঘটে, তাই রস চিন্ময়রূপ। আচার্য মম্মট বলেছেন- গুড়, মরিচাদি মিশ্রিত পাণীয় (সরবত) আস্বাদনের মতো রস সর্বতোভাবে হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হলে বাহ্যিক ব্যাপারগুলি তিরোহিত হয়ে যায়। তখন অলৌকিক চমৎকারজনক শৃঙ্গারাদি রস ব্রহ্মাস্বাদের ন্যায় অনুভূত হয়।[২৩৪]

৪.৪.২ রসনিষ্পত্তি: মহর্ষি ভরত রসনিষ্পত্তি বিষয়ে বলেছেন- *বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ*।[২৩৫] অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সমন্বয়ে রসের নিষ্পত্তি ঘটে। রসনিষ্পত্তির আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব তথা স্থায়িভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

৪.৪.২.১ ভাব: অলংকারশাস্ত্রে মানবহৃদয়ের প্রধান-অপ্রধান বৃত্তিগুলিই ভাবরূপে অভিহিত হয়েছে। মহর্ষি ভরত রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে ভাব ও রসের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর মতে-

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।

পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তযোরভিনযে ভবেত্॥[২৩৬]

অর্থাৎ ভাবহীন রস যেমন হয় না, তেমনই রসহীন ভাবও হতে পারে না। অভিনয়ে এই উভয়ের পারস্পরিক সিদ্ধি ঘটে।

ভাব বাচিক, আঙ্গিকপ্রভৃতি অভিনয় এবং বিভাবের দ্বারা আহৃত ও অনুভাবের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে থাকে।[২৩৭] নানা দ্রব্যের সমন্বয়ে প্রস্তুত অন্ন যেমন স্বাদুতা প্রতিপাদন করে, সেইরকম নানা ভাবের সমন্বয়ে রসের প্রতীতি হয়। ভাব রসকে অভিব্যক্ত করে। মহর্ষি ভরত

বলেছেন- *দৃশ্যতে হি ভাবেভ্যো রসানামভিনির্বৃত্তিরিতি ন তু রসেভ্যো ভাবানামভিনির্বৃত্তিরিতি।*[২৩৮] অর্থাৎ ভাব থেকেই রসের অভিনির্বৃত্তি ঘটে, রস থেকে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে না। ভরত উদাহরণ-সহযোগে রস ও ভাবের সম্পর্কটি এইভাবে বুঝিয়েছেন-

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাত্পুষ্পং ফলং যথা।

তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥[২৩৯]

অর্থাৎ বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল হয়, তেমন রসসমূহ ভাবগুলির মূল। আবার ভাবগুলিও রসের মূল। ভরত ভাব ও রসকে যথাক্রমে বীজ ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বীজ যেমন উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে কালক্রমে ফল উৎপাদন করে, সেইরকম যথাযথ ভাবের অভিব্যক্তিতে রসের উদ্গম ঘটে।

৪.৪.২.২ স্থায়িভাব: স্থায়িভাব, ব্যভিচারিভাব ও সাত্ত্বিকভাব ভেদে ভাব তিন প্রকার। স্থায়িভাব ও সাত্ত্বিকভাবের সংখ্যা আটটি। ব্যভিচারী ভাব ৩৩ টি। সর্বসমেত ৪৯ টি ভাবের দ্বারা কাব্যে রসের অভিব্যক্তি ঘটে। কাব্যে প্রকাশিত বিভাব ও অনুভাবের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত ভাবসমূহের দ্বারা রসনিষ্পত্তি হয়। যদিও ভাব বলতে ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাবও গৃহীত হয়, তবুও স্থায়িভাবই রসত্বপ্রাপ্ত হয় এই স্থায়িভাব পর্যায়ক্রমে রসে পরিণত হয়। তাই স্থায়িভাবের প্রাধান্য প্রসঙ্গে মহর্ষি ভরত বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ সমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যুক্ত হলেও তাদের মধ্যে দুই-একজন বিদ্যা, কূল ও শীলের প্রাধান্যতা বশত যেমন রাজত্ব লাভ করে। অন্যান্যরা তার অনুবর্তন করে মাত্র। একইভাবে স্থায়িভাব বহু বিভাব থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রাধান্য লাভ করে। বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবগুলি স্থায়িভাবের অনুচর মাত্র। বহু মানুষের মধ্যে যেমন রাজা প্রধান, শিষ্যদের মধ্যে যেমন গুরু প্রধান, একইভাবে সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়িভাবই প্রধান-

যথা হি সমানলক্ষণাঃ তুল্যপানিপাদোদরশরীরাঃ সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্পবিচক্ষণত্বাদ্ রাজত্বম্ আপ্নুবন্তি তত্রৈব চ অন্যেঽল্পবুদ্ধযস্তেষাম্ এব অনুচরা ভবন্তি।..... পুরুষস্তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়িভাবো রসনাম লভতে। এইপ্রসঙ্গে তিনি পূর্বাচার্যগণ প্রণীত দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন-

যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যানাং চ যথা গুরুঃ।

এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ি মহানিহ॥[২৪০]

স্থায়িভাব মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে। অনুরূপভাবে সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাবগুলি মানুষের আভ্যন্তর বস্তু। জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে স্নেহের অনুভূতি হয়। একইভাবে প্রেমের আকর্ষণ, কাঙ্ক্ষিত বস্তুর নাশে শোক, অন্যায়কারীর প্রতি ক্রোধ, মনের অনুরূপ কার্যে উৎসাহ, ভয়ংকর বস্তুর দর্শনে বা বাক্য শ্রবণে ভীতির উদ্রেক, ঘৃণিত বস্তুর প্রতি ঘৃণা, অদ্ভুত বস্তুর দর্শনে বিস্ময়, অসংলগ্ন বাক্য বা বস্তুতে হাস্যের উদ্রেক, পরিদৃশ্যমান জগতের অনিত্যতা উপলব্ধিতে বীতরাগভাব- এই সমস্ত কিছু ব্যক্তিমনের সহজাত প্রবৃত্তি বা চেতনা। কেবল ব্যক্তিভেদে বা স্থান ও কালভেদে এক একটির আধিক্য প্রকটিত হয়। আচার্য জগন্নাথ তাই বলেছেন-

বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ।

আত্মভাবং নযত্যাশু স স্থাযী লবণাকরঃ॥

চিরং চিত্তেঽবতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তেঽনুবন্ধিভিঃ।

রসত্বং যে প্রপদ্যন্তে প্রসিদ্ধাঃ স্থাযিনোঽত্র তে॥

সজাতীযবিজাতীযৈরতিরস্কৃতমূর্তিমান্।

যাবদ্রসং বর্তমানঃ স্থায়িভাব উদাহৃতঃ॥[২৪১]

অর্থাৎ যে সমস্ত হৃদয়ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির দ্বারা বিনষ্ট হয় না, যারা বিভাবাদিকে নিজরূপতা প্রাপ্ত করায়, চিরকালব্যাপী যারা চিত্তে অবস্থান করে ও রসত্বপ্রাপ্ত হয়; তারাই হল স্থায়িভাব। মহর্ষি ভরতোক্ত স্থায়িভাবগুলি হল-

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোত্সাহৌ ভযং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থাযিভাবাঃ প্রকীর্তিতা॥[২৪২]

আপাত দৃষ্টিতে স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের মধ্যে পার্থক্য খুব গভীররূপে প্রতীত হয় না। রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবগুলি যেমন ব্যক্তির আভ্যন্তর অনুভূতি, একইভাবে শংকা, আলস্য, প্রভৃতিও সংস্কাররূপে মানব-মনে নিহিত থাকে। মানুষের অনেকগুলি অনুভূতির মধ্যে এক একটি

প্রবলভাবে অনুভূত হয়। অন্যগুলি তিরস্কৃত হয়। বস্তুত উপযুক্ত পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ভাব প্রকটিত হয় এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে। অন্য ভাবগুলি সংস্কারের মধ্যে থাকলেও প্রকাশের উপযুক্ত অবসর না থাকায় প্রকটিত হয় না। স্থায়িভাবগুলি দীর্ঘব্যাপীত্ব লাভ করে, কিন্তু সঞ্চারিভাব দীর্ঘত্ব লাভ করে না।

৪.৪.২.৩ বিভাব: কারণ, নিমিত্ত, হেতু প্রভৃতি হল বিভাবের পর্যায়বাচি শব্দ।[২৪৩] এর দ্বারা আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় বিভাবিত হয়। তাই একে বিভাব বলে। ভরত এই বিষয়ে একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন-

বহবোঽর্থা বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনযাশ্রযাঃ।

অনেন যস্মাত্তেনাযং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥[২৪৪]

বস্তুত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে রসরূপে আস্বাদযোগ্য করার মুখ্য কারণ হল বিভাব। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন সাধারণভাবে যা রতিপ্রভৃতির উদ্রেক ঘটায়, তাকেই কাব্যে বা নাট্যে বিভাব বলা হয়।[২৪৫]

বিশ্বনাথ, ধনঞ্জয়, জগন্নাথ প্রমুখ আচার্যগণ বিভাবকে দুইভাগে ভাগ করেছেন- আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। নায়কপ্রভৃতি হল আলম্বন বিভাব। কারণ এদেরকে অবলম্বন করেই রসের উদ্গম হয়।[২৪৬] আর আলম্বন বিভাবে অঙ্কুরিত রসকে যা উদ্দীপিত করে, তাকে বলা হয় উদ্দীপন বিভাব।[২৪৭] নায়ক, নায়িকাপ্রভৃতির বিবিধ (আঙ্গিক) চেষ্টা, উপযুক্ত দেশ-কাল, পরিবেশ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

৪.৪.২.৪ অনুভাব: এর দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় অনুভাবিত হয়, তাই একে বলা হয় অনুভাব।[২৪৮] যে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের বাহ্যিক অভিব্যক্তি ঘটে, তাকে বলা হয় অনুভাব। আচার্য বিশ্বনাথ এই সম্বন্ধে বলেছেন-

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশযন্।

লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যযোঃ॥[২৪৯]

নায়কপ্রভৃতির নিজ নিজ কারণে হৃদয়ে যে রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুভব হয়, তার বাহ্যিক প্রকটকেই বলা হয় অনুভাব। আন্তরিক অনুভূতি হল কারণ এবং তার বাহ্যিক অভিব্যক্তি হল কার্য। আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে- *অনুভাবো বিকারস্তু ভাবসংসূচনাত্মকঃ*।[২৫০] এখানে 'বিকার' হল

বাহ্যিক অভিব্যক্তি। অর্থাৎ যে বিভাবের দ্বারা স্থায়ী ও সঞ্চারিভাবের সূচনা হয়, তাকে বলে অনুভাব।

৪.৪.২.৫ ব্যভিচারিভাব: ব্যভিচারিভাবও অনুভাবের মতো রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিকে প্রকাশিত করে। আচার্য ধনঞ্জয় ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে বলেছেন-

বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।

স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাঃ কল্লোলা ইব বারিধৌ॥[২৫১]

অর্থাৎ সমুদ্রে যেমন ঢেউ উৎপন্ন হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার বিলীন হয়ে যায়, সেইরকম ব্যভিচারিভাব রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে বিলীন হয়ে যায়। ব্যভিচারিভাব স্থায়িভাবের বিষয়কে সুদৃঢ় করে তোলে। *নাট্যশাস্ত্রে* সর্বসমেত তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের উল্লেখ করা হয়েছে-

নির্বেদগ্লানিশংকাখ্যাস্তথাসূযামদঃ শ্রমঃ।

আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ॥

ব্রীডা চপলতা হর্ষ আবেগো জডতা তথা।

গর্বো বিষাদ ঔত্সুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ॥

সুপ্তং বিবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।

মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ॥

ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেযা ব্যভিচারিণঃ।

ত্রযস্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ॥[২৫২]

এছাড়া আটটি সাত্ত্বিকভাব হল-

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥[২৫৩]

৪.৪.৩ শ্রব্যকাব্যে রসোপলব্ধি: আচার্য ভারত ও তাঁর পূর্ববর্তী সময়ে প্রসিদ্ধ রসতত্ত্বের আলোচনা মূলত দৃশ্যকাব্যের বিচারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রব্যকাব্যের তুলনায় দৃশ্যকাব্যে

রসপ্রতীতি অধিকাংশেই সহজ- এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দৃশ্যকাব্যে আঙ্গিক, বাচিকাদি অভিনয়, নৃত্য-গীত, বাদ্য তথা মঞ্চসজ্জার দ্বারা সহৃদয় দর্শক-প্রেক্ষকের তো বটেই, সাধারণের পক্ষেও রসানুভূতি অনেকাংশেই সহজ হয়ে থাকে।

ভরত-পরবর্তী আলংকারিকগণ যথা দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভট, বামন প্রমুখের কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনায় শ্রব্যকাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখা যায়। কিন্তু তাঁরা শ্রব্যকাব্যে রসের প্রাধান্যের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। উপরন্তু গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতির গুরুত্ব বিষয়ে মতদান করেছেন। আচার্য আনন্দবর্ধন কাব্যমাত্রই রসের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন-

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।

ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিযোগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥[২৫৪]

পরবর্তীকালে আচার্য বিশ্বনাথ রসের সর্বাতিশায়ী গুরুত্বের কথা ভেবেই কাব্যের লক্ষণ প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন- *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্*। অর্থাৎ রসান্বিত বাক্যই হল কাব্য। সেই বাক্য দৃশ্যকাব্যের বাচিক অভিনয় হোক অথবা শ্রব্যকাব্যের গদ্য-পদ্যরূপ হোক। তবে দৃশ্যকাব্যে অভিনয় দর্শন এবং পাঠ্যাংশ বা সংগীতাংশ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের চিত্তে অলৌকিক আনন্দময় রসের উপলব্ধি ঘটে। কিন্তু শ্রব্যকাব্যে কবি যখন বিবিধ শব্দের সাহায্যে বর্ণনীয় বিভাবাদি অর্থের উপস্থাপনা করেন, তখন তার দৃষ্টি থাকে পাঠকের অভিমুখে। সেক্ষেত্রে নাট্যপ্রেক্ষকের মতো শ্রব্যকাব্যে শব্দ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে রসের প্রতীতি নাও হতে পারে। তবে তাৎক্ষণিক রসপ্রতীতি না হলেও বারবার আবৃত্তি ও অর্থ অনুধাবনের মাধ্যমে শ্রব্যকাব্যে রসোপলব্ধি ঘটে থাকে। কাব্যে শব্দচয়ন, অলংকার প্রয়োগ, শ্লেষ, প্রসাদাদি বিবিধ গুণের সমন্বয়, শব্দার্থের সংঘটনা সঞ্জাত রীতি প্রভৃতি উপকরণের প্রয়োগে কবির অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে শ্রব্যকাব্য প্রথম পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রসের উপলব্ধি না হলেও চমৎকারিত্ব উপেক্ষিত হয় না। মহর্ষি ভরত *জনপদসু মুখবোধ্য* (পাঠান্তর জনপদসুখবোধ্য) শব্দার্থ প্রয়োগের পরামর্শ দিলেও অনেক শ্রব্যকাব্যেই দুরূহ শব্দার্থের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মহাকবি অশ্বঘোষ, কালিদাস প্রমুখ প্রাচীন কবিগনের শব্দার্থের যে স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা দেখা যায়, তা পরবর্তীকালের কবিগনের কাব্যে উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁরা সর্বজনবোধ্য শব্দপ্রয়োগে তেমন গুরুত্ব দেন নি। মাঘ, ভর্তৃহরি, তথা শ্রীহর্ষের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, তাঁরা সচেতনভাবেই এই

দূরূহতা অবলম্বন করেছেন। ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পক্ষেও যে কাব্যের অর্থবোধ দুরূহ, সেক্ষেত্রে রসপ্রতীতির সম্ভাবনা খুবই কঠিন। তাই শ্রব্যকাব্যে রসের প্রাধান্য অস্বীকার না করলেও দণ্ডী, ভামহ প্রমুখ কাব্যতত্ত্ববিদগণ শ্রব্যকাব্যে দৃশ্যকাব্যের মতো সুস্পষ্টভাবে রসকে পরম তত্ত্বরূপে সরাসরি নির্দেশ করেননি। তাঁরা গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতির মধ্যে রসের আন্তর্ভাব দেখিয়েছেন।

আচার্য আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ প্রমুখের ব্যাখ্যায় দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যে রসের আত্মরূপতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আচার্য বিশ্বনাথ নাট্য ও শ্রব্য- এই উভয় প্রকার কাব্যের নিরিখে বিভাবাদির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে লৌকিকরূপে যা রতিপ্রভৃতির উদ্বোধক, তাই (শ্রব্য) কাব্যে ও নাট্যে বিভাব।

দৃশ্যকাব্যে বিভাবাদি অভিনয়ের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়। শ্রব্যকাব্যে সেগুলি শব্দের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলি হল ব্যঞ্জক। আর রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব, যেগুলি বাসনারূপে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে অবস্থান করে, তা হল ব্যঙ্গ্য। অতএব বিভাব ও স্থায়িভাবের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ থাকে। আর বিভাবাদির দ্বারা যে রতিপ্রভৃতির অভিব্যক্তি ঘটে, তা হল ব্যঞ্জনা।

লৌকিক ব্যবহারে যখন চিত্তে শোক, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, তখন সেগুলির কারণ, কার্য, সহকারী থাকে। কাব্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। কাব্যে রসোপলব্ধির উপযোগী যে সমস্ত কারণ, কার্য, সহকারী প্রভৃতি উপাদানের সমাবেশ ঘটে, সেগুলি যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব। কিন্তু শ্রব্যকাব্যে যেহেতু শব্দ ও অর্থ ব্যতীত তৃতীয় উপাদান থাকে না, তাই সেক্ষেত্রে শব্দের অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তির সহযোগে অর্থের প্রতীতি হয়। সেগুলিই রসোপলব্ধির সহায়ক কারণ, কার্য এবং সহকারী বা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাধন হয়ে থাকে।

শ্রব্যকাব্যে বিভাবাদির বর্ণনা থাকলেও সহৃদয় পাঠককে স্বীয় প্রতিভার দ্বারা বিবিধ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অনুক্ত বিষয়ের অনুমানের সাহায্যে রসের প্রতীতি ঘটে। তাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের মাধ্যমে চিত্তে নির্মলতা ও তন্ময়ীভবনযোগ্যতার দ্বারা কাব্যরস আস্বাদনযোগ্য হয়। তাই আনন্দবর্ধন কাব্যের লক্ষণ করেছেন- *সহৃদযহৃযাহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্*।[২৫৫]

৪.৪.৪ রসের সংখ্যা: কাব্যের আনন্দ যদিও অখণ্ড, তবু উপাধিভেদে এই আনন্দের প্রকাভেদ রয়েছে। তাই রসেরও প্রকারভেদ রয়েছে। শৃঙ্গাররসের আস্বাদনে সহৃদয়ের চিত্তের বিকাশ ঘটে। বীররসে ঘটে বিস্তার। বীভৎস ও রৌদ্ররসে যথাক্রমে ক্ষোভ ও বিক্ষেপ ঘটে। একটি রস থেকে অন্য রসের রূপান্তর কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা ঘটে না। এটি একটি মানসিক অবস্থা বা আস্বাদের প্রভেদ। মহর্ষি ভরত আটটি রস স্বীকার করেছেন। যথা- শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।[২৫৬] এই আটটির মধ্যে তিনি শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎসরসকে প্রধান রসরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে শৃঙ্গার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত এবং বীভৎস থেকে ভয়ানকরস উদ্ভুত হয়।[২৫৭] অভিনবগুপ্ত আবার এই আটটি রসের অতিরিক্ত হিসেবে শান্তরসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আচার্য মম্মট এবং জগন্নাথও শান্তরসকে স্বীকার করেছেন।[২৫৮] আচার্য বিশ্বনাথ বাৎসল্যসহ সর্বসমের দশটি রস স্বীকার করেছেন।[২৫৯]

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণ রসে প্রেক্ষকগণের মন অধিক অভিভূত হয়। তাই আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে অন্যান্য রসগুলির চেয়ে এই দুটি রসের মাধুর্য বেশি।[২৬০] তিনি এইদুটির মধ্যে আবার করুণের রসময়তাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৬১] কবি ভবভূতিও প্রধান রস হিসেবে একমাত্র করুণরসকেই স্বীকার করেছেন-

একো রসঃ করুণো এব নিমিত্তভেদাদ্।
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রযতে বিবর্তান্॥
আবর্তবুস্বদতরঙ্গময়ান্ বিকারান্।
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তত্সমগ্রম্॥[২৬২]

জল যেমন আবর্ত, বুদ্বুদ, তরঙ্গ প্রভৃতি বিকারপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সামান্য অর্থে তা জলই। তেমন একই করুণরস কারণাদি (বিভাবাদি) ভেদের দ্বারা ভিন্ন হয়ে শৃঙ্গারাদি পৃথক পৃথক পরিণামপ্রাপ্ত হয়।

রস যদি ভাবের দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হয়ে থাকে, তবে যতগুলি ভাব, ততগুলি রসও থাকবে। অনেক আলংকারিক এই মতটি সমর্থন করে থাকেন। প্রাচীন আচার্যগণ আবার মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত রসগুলিকে প্রধান ও অন্যান্য

রসগুলিকে অপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। *নাট্যশাস্ত্রে* এইরকম আলোচনা পাওয়া যায়। যেসমস্ত চিত্তবৃত্তির বর্ণনায় পুরুষার্থের সাধন হয় না, সেইসমস্ত ক্ষেত্রের রসত্বপ্রাপ্তি আচার্য ভরত ও তাঁর পূর্বাচার্যগণ স্বীকার করেননি। অভিনবগুপ্ত শৃঙ্গারাদি রসের সঙ্গে পুরুষার্থের সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন- *তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতযাঽত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ নিরপেক্ষভাবত্বাত্। তদ্বিপরীতস্তু করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ। স চামর্ষপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থযোর্ধর্মমূলত্বাদ্ বীরঃ। স হি ধর্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভযপ্রদানসারত্বাত্। তদনন্তরং ভযানকঃ। তদ্বিভাবসাধারণ্যসম্ভাবনাত্। ততো বীভত্স ইতি যদ্বীরেণাক্ষিপ্তম্। বীরস্য পর্যন্তেঽদ্ভুতঃ ফলমিত্যনন্তরং তদুপাদানম্।*[২৬৩]

রসের সংখ্যা চার, আট, নয়- এই ক্রমে বাড়তে বাড়তে যেমন দশ বা তার অধিক হয়েছে, অন্যদিকে সমস্ত রসকে একটিমাত্র রসের পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়াসও ঘটেছে। মহর্ষি ভরতের বক্তব্যেও এইধরণের দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়। ভরত *নাট্যশাস্ত্রের* ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছেন- "তত্র রসানেব তাবদাদাবভিব্যাখ্যাস্যামঃ।" এখানে রস শব্দের (রসান্) বহুবচন ব্যাবহৃত হয়েছে। আবার তার পরের বাক্যেই রসের সর্বাতিশায়ী গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বলেছেন- "ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।" এখানে আবার একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে *অভিনবভারতী* টীকায় বলা হয়েছে- *পূর্বত্র বহুবচনমত্র চৈকবচনং প্রযুঞ্জানস্যাযমাশযঃ- এক এব তাবত্ পরমার্থতো রসঃ সূত্রস্থানীযত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ।*[২৬৪] বস্তুত রস একটিই। পূর্বাচার্যগণের দ্বারা সূত্রাকারে উক্ত হওয়ায় ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপকের ব্যবহার করা হয়েছে।

এইভাবে রসের বহুবিধত্ব থেকে ধীরে ধীরে একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। রস আন্তরবস্তু। আত্মস্বরূপ এই রস সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দরূপে অনুভূত হয়। তাই প্রাচীন আচার্যগণ রসকে শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন।

৪.৪.৫ হাস্যরস: *অভিরাজসপ্তশতীতে* দুইরকমের হাস্যরসান্বিত শ্লোক রয়েছে। কিছু কিছু শ্লোকে হাস্যের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার কিছু শ্লোকে নির্মল হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। *চতুর্থীশতক* ও *সুভাষিতোদ্ধারশতকের* বেশ কিছু শ্লোকে হাসির অন্তরালে গম্ভীর চিন্তার সংকেত সূচিত হয়েছে। *সুভাষিতোদ্ধারশতকে* যেমন-

কো গুরুঃ প্রশ্নপত্রং যস্তনুতে প্রাক্ পরীক্ষণাত্।

কশ্চ শিষ্যো বিনামূল্যং যো বস্তূনি যচ্ছতি॥[২৬৫]

অর্থাৎ গুরু কে? যিনি পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র দান (প্রচার) করেন। শিষ্য কে? যে বিনামূল্যে বিবিধ দ্রব্য গুরুকে দান করে। আলোচ্য শ্লোকে আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরস প্রতীত হলেও বস্তুত বর্তমান সময়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরার নৈতিক অধঃপতনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সুভাষিতোদ্ধারশতকের কিছু শ্লোকে হাস্যরস পাওয়া যায়। যেমন-

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।

এবং বাদিভির্মন্যেহং বাষ্পযানং ন লোকিতম্॥[২৬৬]

অর্থাৎ যারা বলেন যে, যার বুদ্ধি, তারই বল রয়েছ অর্থাৎ বুদ্ধিই বল, (আমার মনে হয়) তারা রেলগাড়ি দেখেনি। এখানে নীতিবাক্যটিকে কবি বিকৃত বাগভঙ্গির দ্বারা পরিবেশিত করেছেন। তাই এখানে হাস্যরস।

আচার্য বিশ্বনাথ হাস্যরসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

বিকৃতাকারবাগ্বেষচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেত্।

হাস্যো হাসস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥

বিকৃতাকারবাক্ চেষ্টং যমালোক্য হসেজ্জনঃ।

তমত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্॥

অনুভাবোঽক্ষিসংকোচনবদনস্মেরতাদযঃ।

নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥[২৬৭]

অর্থাৎ বিকৃত আকার, কথাবার্তা, বেশভূষা প্রভৃতির দ্বারা জাত কুহক থেকে হাস স্থায়িভাবযুক্ত হয়। হাস্যরসের দেবতা প্রমথ। বর্ণ শ্বেত। যার বিকৃত অঙ্গভঙ্গি, বাক্য ও বেশ দেখে লোকে হাসে সেই ব্যক্তি এই রসের আলম্বন বিভাব। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিবিধ চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। চোখ সংকোচন, মুখের হাস্যভাব প্রভৃতি হল অনুভাব। নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি হল ব্যভিচারিভাব।

মহর্ষি ভরত এই রস সম্বন্ধে বলেছেন-

বিপরীতালঙ্কারৈর্বিকৃতাচারাভিধানবেষৈশ্চ।

বিকৃতৈরর্থবিশেষৈর্হসতীতি রসঃ স্মৃতো হাস্যঃ॥

বিকৃতাচারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈশ্চ বিকৃতবেষৈশ্চ।

হাসযতি জনং যস্মাত্ তস্মাদ্ জ্ঞেযো রসো হাস্যঃ॥[২৬৮]

অর্থাৎ বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথাবার্তা, বেশ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গির কারণে কেউ হাসলে যে রসের নিষ্পত্তি হয়; তা হাস্যরস নামে কথিত। বিকৃত রূপ, বাক্য, অঙ্গভঙ্গি ও বেশের মাধ্যমে দর্শক-প্রেক্ষকগণকে হাসানো হয় বলে এই রসকে হাস্যরস বলে।

শ্রব্যকাব্যে বিকৃত আকার, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে শুধু বিপরীত বা বিকৃত বাগভঙ্গির দ্বারা হাস্যরস পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য.....প্রভৃতি শ্লোকে প্রযুক্ত শব্দার্থের দ্বারাই হাস্যরসের অভিব্যক্তি হয়। এইরকম আরও কিছু শ্লোক রয়েছে, যেগুলিতে হাস্যরস প্রযুক্ত হয়েছে। *মনুসংহিতায়* একটি শ্লোক রয়েছে-

যদ্ যত্ পরবশং কর্ম তত্ তদ্ যত্নেন বর্জযেত্।

যদ্ যদ্ আত্মবশং তু স্যাত্ তত্ সেবেত যত্নতঃ॥[২৬৯]

শ্লোকটিকে কবি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে-

যদ্যত্ পরবশং কর্ম তত্তত্ যত্নেন বর্জযেত্।

কামিনীবিমুখা জাতা ইতি মত্বৈব যোগিনঃ॥[২৭০]

অর্থাৎ যা কিছু কর্ম সাধনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়, সেই সকল কর্ম যত্নসহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। এই ভাবনা থেকেই যোগীগণ স্ত্রীসঙ্গ করেন না। আলোচ্য শ্লোকে ‘পরবশং’ বলতে বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য বা পরাধীনতার কথা বলা হয়েছে। তাই স্ত্রীর অধীনে থাকার ভয়ে যোগীরা দার-পরিগ্রহ করেন না। এখানে যোগীগনের দার-পরিগ্রহ না করার বিষয়টিকে হাস্যরসের দ্বারা পরিবেশন করা হয়েছে। বস্তুত যোগীরা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একান্তে ব্রহ্মোপাসনা করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্ত্রীর অধীনে

থাকতে চান না বলেই স্ত্রী-গ্রহণ করেন না। কারণ সমাজে একটি চটুল বক্তব্য রয়েছে- যে বিবাহিত পুরুষ অর্থেই স্ত্রী'র অধীন।

চার্বাক মতাদর্শে বহুল আলোচিত একটি বাক্য হল- "যাবজ্জীবেত্ সুখং জীবেত্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত্।" এই বাক্যটিকে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এইভাবে বলেছেন-

যাবজ্জীবেত্ সুখং জীবেত্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত্।

নাত্র চিন্তা মনাক্ কার্যা ঋণং দাস্যন্তি পুত্রকাঃ॥[২৭১]

অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাঁচবে। ঋণ করে হলেও ঘি (উৎকৃষ্ট) খাও। বিন্দুমাত্র চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ সন্তানরা তো ঋণ পরিশোধ করার জন্য রয়েছে। হাস্যাত্মক বক্তব্যের দ্বারা এই শ্লোকেও হাস্যরস নিষ্পন্ন হয়েছে।

সুভাষিতোদ্ধারশতকের ৯৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

পুরুষাঃ যত্র পূজ্যন্তে তত্র কিং দৈত্যদানবাঃ॥

অর্থাৎ যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে দেবতা বিরাজ করেন। আর যেখানে পুরুষ পূজিত হয়, সেখানে কি দৈত্য দানব বাস করে? আলোচ্য শ্লোকে *যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ* এই সুভাষিতের বক্তব্যকে খণ্ডন করা কবির মূল উদ্দেশ্য নয়। এখানে কেবল বক্র (হাস্যমূলক) বাগভঙ্গির দ্বারা পাঠকবর্গকে আনন্দ প্রদান করা হয়েছে।

ভাষিতোদ্ধারশতকের ১০০নং শ্লোকে কবি বলেছেন-

নির্ভূষাং বিদুষীং কন্যামর্পয়ন্নাহ তত্পিতা।

স্থিরং বাগ্ভূষণং মন্যে ক্ষীয়তেঽখিলভূষণম্॥

অর্থাৎ অলংকার বিহীনা বিদূষী কন্যাকে পাত্রের হাতে অর্পণ করে পিতা বলল- বাগভূষণ অবশ্যই সমস্ত পার্থিব ভূষণকে পরাজিত করে। এখানে নীতিবাক্যের অর্থাববোধের অভাবে অনুচিত বা (লোক-ব্যবহারের) বিপরীত কর্ম সাধিত হওয়ায় হাস্যরস নিষ্পন্ন হয়েছে।

৪.৪.৬ করুণরস: *অভিরাজসপ্তসতীর* অন্তর্গত *নব্যভারতশতক* ও *মাতৃশতকের* বেশ কিছু শ্লোকে করুণরস অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। *নব্যভারতশতকের* অনেক শ্লোকে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বর্তমান

ভারতের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে ব্যথিত হয়েছেন। কবির স্মৃতিপথে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধি, জ্ঞানবৈভব সর্বমান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রকটিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গের আত্ম-বলিদানের কাহিনী স্মরণ করে কবি গর্বিত হয়েছেন। আবার স্বাধীন ভারতের বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য তিনি ব্যথিতও হয়েছেন। তাঁর মতে ভারতের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করছে। বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা তাদের কাছে গুরুত্বহীন। তাদের স্বার্থপরতা রাজনৈতিক কদর্যতা তাই কবির মনকে বেদনাভিভূত করেছে-

কিন্তু যেষাং কৃতে প্রাণাস্ত্যক্তাস্তৈস্তু হুতাত্মভিঃ।

তে এব নিষ্ঠুরোভূয জানন্তি ন কৃতং ক্বচিত্॥

তদেব ভারতং রাষ্ট্রং প্রাপ্তভূরিসমস্যকম্।

পীড্যতে নিতরাং হন্ত! লোকতন্ত্রসমাশ্রিতম্॥[২৭২]

কিন্তু যাদের জন্য (স্বদেশপ্রেমী বিপ্লবীগণ) আত্মাহুতি দিয়েছেন, তারাই আজ বুঝতে পারছে না যে, এই পুণ্যভূমিতে নিষ্ঠুরভাবে কী কী করছে! সেই লোকতান্ত্রিক ভারতবর্ষের আজ বিবিধ সমস্যাকীর্ণ অবস্থা (আমার মনকে) পীড়া দেয়।

নব্যভারতশতকের ১০নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

অদ্য স্মরামি যদ্বৃত্তং ভারতাঙ্গনকোনকে।

দূযতে হৃদযং দীনং সজলং ভাতি নেত্রকম্॥

আজ যখনই (সেই পুরোনো) বৃত্তান্ত স্মরণ করি, তখনই হৃদয় ব্যথিত হয়, নয়ন অশ্রুতে ভরে ওঠে।

আচার্য বিশ্বনাথ করুণরস সম্বন্ধে বলেছেন-

ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেত্।

ধীরৈঃ কপোতবর্ণোঽযং কথিতো যমদৈবতঃ॥

শোকোঽত্র স্থাযিভাবঃ স্যাচ্ছোচ্যমালম্বনং মতম্।

তস্য দাহাদিকাবস্থা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ॥

অনুভাবা দৈবনিন্দাভূপাতক্রন্দিতাদয়ঃ।

বৈবর্ণ্যোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসস্তম্ভপ্রলপনানি চ॥

নির্বেদমোহাপস্মারব্যাধিগ্লানিস্মৃতিশ্রমাঃ।

বিষাদজডতোন্মাদচিন্তাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥[২৭৩]

ইষ্ট বস্তুর নাশে এবং অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি হলে করুণ রস হয়। এর স্থায়িভাব শোক। মৃত বন্ধু প্রভৃতি শোচ্য বিষয় হল আলম্বন বিভাব। দাহিকাদি অবস্থা হল উদ্দীপন বিভাব। দৈবনিন্দা, ভূমিতে পতন, ক্রন্দন প্রভৃতি হল এর অনুভাব। করুণরসের ব্যভিচারিভাবগুলি হল বিবর্ণতা, উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, স্তম্ভ, প্রলাপ, নির্বেদ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি।

করুণরস-ব্যঞ্জক এই লক্ষণগুলির ভিত্তিতে *অভিরাজসপ্তশতীর* করুণরস বিচার করা হচ্ছে। *কিন্তু যেষাং কৃতে* প্রভৃতি উপর্যুক্ত শ্লোকগুলিতে দেশের বর্তমান দুরবস্থা হল আলম্বন বিভাব, আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবী তথা স্বদেশের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি অবস্থা উদ্দীপন বিভাব, অন্তরে পীড়া, অশ্রুপাত অনুভাব এবং স্মৃতি, বিষাদ এবং চিন্তা এখানে ব্যভিচারিভাব। অতএব এখানে করুণ রসের অভিব্যক্তি হয়েছে।

আবার-

অনাগতং স্বরাষ্ট্রস্য কীদৃশন্নু ভবিষ্যতি।

বিদুষাং বিপলৈশ্বর্যং সংকটাপতিতে সতি॥

কোঽপি নিন্দন্তি বাল্মীকিং রামচারিত্র্যগাযকম্।

দলিতান্বযসঞ্জাতং মত্বা কোঽপি প্রশংসতি॥

আধ্যাত্মিকী ন সন্দৃষ্টিঃ ন শ্রেযসি বিভাবনা।

ইন্দ্রিযব্রাতসম্মোদৈর্ভগ্না মানবশূকরাঃ॥[২৭৪]

মহান ব্যক্তিদের ও বিপুল ঐশ্বর্যের সংকটময় অবস্থায় আগামী দিনে এই রাষ্ট্রের পরিণতি কী হবে! কেউ রামকথার জনক বাল্মীকির নিন্দা করছে। কেউ আবার দস্যু-বংশজাত বলে তাঁর প্রশংসা করছে। মানুষের আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টি নেই, শ্রেয়স (মোক্ষ) প্রাপ্তির প্রবণতা নেই।

এই মানবরূপী শূকররা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করায় ব্যস্ত। আলোচ্য শ্লোকগুলিতে প্রাচীন ভারতের উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির অবলুপ্তি, নীতিহীন আত্মসর্বস্ব সংস্কৃতির বিকাশের দ্বারা ইষ্টনাশ এবং অনিষ্টের প্রাপ্তি ঘটেছে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মরণ, কবির দুশ্চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা করুণরসের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণোৎসর্গকারী বিপ্লবীদের কাহিনী স্মরণ করে কবির হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। বিপ্লবীদের হত্যা, তাদের স্মরণ, বিলাপ প্রভৃতির দ্বারা করুণরস প্রকটিত হয়েছে। বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি যথা কুতুবুদ্দিন, খিলজি, লোদি, মুঘল, ইংরেজ, ফ্রান্স প্রভৃতির শোষণে, লুণ্ঠনে ভারতবর্ষ শ্মশানে পরিণত হয়েছে-

তদনন্তরং তুরূষ্কা কুতুবুদ্দীনবংশজাঃ।
রাজানো হি গুলামাখ্যাঃ খিলজীতুঘলকাভিধাঃ॥
লোদিনো মুগলাঃ সূরা অফ্গানাশ্চ বর্বরাঃ।
আঙ্গলাশ্চ ফ্রান্সদেশীযাঃ পোর্তুগীজাশ্চ ধীযুতাঃ॥
ক্রমেণ ভারতং রাষ্ট্রং গঙ্গাযমুনযোর্গৃহম্।
তুহিনাদ্রিমহোষ্ণোষং সিন্ধুপূতপদাব্জকম্॥
ভূরিসৈন্যবলৈর্দাসীকৃত্য বিশ্বগুরুং চিরম্।
অপজহ্নর্ কিং হন্ত! কলাসংস্কৃতিবৈভবম্॥
রাষ্ট্রং যদভবত্ক্বাপি কার্তস্বরবিহঙ্গমঃ।
লুণ্ঠিতং মুষিতং ছিন্ন তদ্গতং ননু দীনতাম্॥[২৭৫]

শ্লোকগুলিতে ভারতবর্ষের দুর্দশা আলম্বন বিভাব, বৈদেশিক আক্রমণ, লুণ্ঠন প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব, ক্রন্দন, দুঃখ প্রভৃতির প্রতীতি অনুভাব এবং বিষাদ, স্মৃতি, জড়তা প্রভৃতির প্রতীতি এখানে ব্যভিচারিভাব। অতএব এখানেও করুণরসের প্রতীতি হয়েছে।

অভিরাজসপ্তসতী শতকসংগ্রহের একাধিক শতকে কবি তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় কথনবসরে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কবির বাল্যবস্থায় পিতৃবিয়োগ। মাতা অভিরাজী দেবীর কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সংসারের বিবিধ সংস্থান, বিকলাঙ্গ

ভাই সুরেন্দ্রের পোষণ-পালন, কাকা আদ্যাপ্রসাদ মিশ্র কর্তৃক কবির শিক্ষালাভে প্রভূত সহায়তা ইত্যাদির বর্ণনাবসরে কবি করুণরসের প্রয়োগ করেছেন। *নব্যভারতশতকের* ৯৪ নং শ্লোকে কবি এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

শৈশবে হৃতবাৎসল্যঃ পিতৃসৌখ্যপ্রবঞ্চিতঃ।

অভিরাজ্যা জনন্যৈব প্রযত্নৈঃ স্বৈর্বিপোষিতঃ॥

শৈশবকালে বাৎসল্য হারিয়ে গেছে, পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। (সেই সংকটময় অবস্থায়) মাতা অভিরাজীর প্রযত্নে পরিপোষিত হয়েছি।

মাতৃশতকের ৪২ থেকে ৫১নং শ্লোকে কবির মাতা অভিরাজী দেবীর কঠিন সময়ে সাংসারিক দায়ভার গ্রহণ ও তিন পুত্রের পালন-পোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে-

সদ্যঃ সন্দৃষ্টসংসারং সর্বথা বিকলেন্দ্রিয়ম্।

সুরেন্দ্রং মেঽনুজং দেবি! মাসমাত্রবয়োমিতম্॥

এবং ত্রিতনযান্ ক্রোড়ে কৃত্বা শোকং নিগৃহ্য চ।

পারং গতবতী মাতর্ভীষ্মবিপদুদন্বতঃ॥

জ্বলিতাশালতা নূন্তাঃ স্বপ্নাশ্চাপি খলীকৃতাঃ।

মরীচিকেব রংকূণাং সজলাভূরদৃশ্যত॥

নেত্রযোরনিশম্মাতঃ শ্রাবণাম্বুদমেদুরা।

বর্ষিণী ধ্রুবমশ্রুণাং ঘটা কাঽপি সমুত্থিতা॥

শূণ্যা দশ দিশোঽভূবন্ বান্ধবাশ্চাপি তন্দ্রিতাঃ।

স্রোতাংসি চ মমত্বানাং শুষ্কানি সর্বতোঽভবন্॥

দগ্ধং সীমন্তসিন্দূরং পতিতং কর্ণভূষণম্।

বলযানি রণৎকারং দধন্তি মূকতাং যযুঃ॥

বিশেষকং শুভাবেদি দ্রাংনিঃশেষতাং যযৌ।

বিসস্মারাধরযুগং তাম্বুলবোটিচর্বণম্॥

কাঞ্চী সমুদ্গকে ক্ষিপ্তা কেযূরযুগলং তথা।

ললন্তিকাঽপি কারাযাং পিটকস্যাশু কারিতা॥

স্মিতং স্মৃতিপথং যাতং হসিতঞ্চাপি ভৎির্সতম্।

ক্ষৌমবস্ত্রাণি জীর্ণানি বিধুরঞ্চ প্রসাধনম্॥

উত্থিতৈবংবিধা বাত্যা যযা সর্বং ত্বদীযকম্।

ধ্বংসিতং সহসৈবাম্বাপ্রত্যাশিতমতর্কিতম্॥

উপর্যুক্ত শ্লোকগুলিতে কবির পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর জননী অভিরাজী দেবীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। স্মৃতিপথে মাতার দুরবস্থার কথা স্মরণ করে কবি ব্যথিত হয়েছেন। এখানে পিতৃবিয়োগ ও অভিরাজী দেবী আলম্বন বিভাব, অভিরাজী দেবীর যাবতীয় ক্লেশ উদ্দীপন বিভাব, ক্রন্দনাদির প্রতীতি হল অনুভাব এবং শ্রম, স্মৃতি, বিষাদ প্রভৃতি হল ব্যভিচারিভাব। তাই এখানে করুণরস অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

৪.৪.৭ বীররস: *অভিরাজসপ্তসতী* শতক-সংগ্রহের শতকগুলিতে বীররসের প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* বিবিধ দেবতার স্তুতি রচিত হয়েছে। সেখানে কবি হনুমানের প্রশস্তিতে বীররসের প্রয়োগ করেছেন। হনুমানের পরাক্রম, সমুদ্র লঙ্ঘন, লংকা-দহন প্রভৃতির বর্ণনায় বীররসের প্রয়োগ দেখা যায়-

লাঙ্গুলবদ্ধগিরিখণ্ডচলৎপ্রহারৈর্লংকাকলংকবিকলাং বিধুরাং প্রকুর্বন্।

স্কন্ধাধিরোপিতসলক্ষ্মণরাঘবেন্দ্রঃ প্রাভঞ্জনির্দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥

নৈরাশ্যসিন্ধুবিনিমজ্জিতজীবিতাযা দেব্যা বিদেহদুহিতুঃ পরিরক্ষণায।

রামাভিধানকলিতাক্ষরমঙ্গুলীযং সম্পাতযন্ননিলজোঽবতু সুপ্রভাতম্॥

উল্লঙ্ঘ্য নক্রমকরোল্লসিতং পযোধিং সঞ্চূর্ণ্য গোপুরগবাক্ষবিটংকমালাম্।

রামায দীযত ইতি প্রদহন্ বচোভির্লংকাং তনোতু কপিরাট্ সুখসুপ্রভাতম্॥[২৭৬]

যিনি লাঙ্গুলের দ্বারা গিরিখণ্ডের প্রহারে লংকাকে কলংক-বিকল করেছেন, রাম-লক্ষ্মণকে স্বস্কন্ধে ধারণকারী সেই প্রাভঞ্জ হনুমান নবপ্রভাত দান করুন। নৈরাশ্যসিন্ধুতে নিমজ্জিতা বিদেহকন্যা

সীতাকে রক্ষার জন্য যিনি রামনামাংকিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেছিলেন, সেই পবনপুত্র নবপ্রভাতের রক্ষা করুন। যিনি কুমির, মকরাদি ভয়ংকর প্রাণীসংকুল সমুদ্র লঙ্ঘন করে, লংকানগরী দহন করে শ্রীরামকে প্রদত্ত বচনের পালন করেছিলেন, সেই কপিরাজ সুখময় সুপ্রভাত দান করুন।

এই শ্লোকগুলিতে প্রস্তরখণ্ডের প্রহারে লংকানগরী ভঙ্গ, রাম-লক্ষ্মণকে স্বস্কন্ধে ধারণ, বিপদসংকুল সমুদ্র লঙ্ঘন, জানকীর হস্তে রামনামাংকিত অঙ্গুরীয় প্রদানের দ্বারা রামচন্দ্রের বার্তাপ্রেরণ প্রভৃতির দ্বারা বীররস অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

আচার্য বিশ্বনাথ প্রদত্ত বীররসের লক্ষণ হল-

উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহস্থায়িভাবকঃ।

মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽযং সমুদাহৃতঃ॥

আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদযো মতাঃ।

বিজেতব্যাদিচেষ্টাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরুপিণঃ॥

অনুভাবাস্তু তত্র স্যুঃ সহাযান্বেষণাদযঃ।

সঞ্চারিণস্তু ধৃতির্মতিগর্বস্মৃতিতর্করোমাঞ্চাঃ॥[২৭৭]

বীররস হল উত্তম প্রকৃতির। এর স্থায়িভাব উৎসাহ, দেবতা মহেন্দ্র, বর্ণ স্বর্ণবর্ণ। বীররসের আলম্বন বিভাব হল বিজেতব্য প্রভৃতি। বিজেতব্য প্রভৃতির চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। সহায়, অন্বেষণ প্রভৃতি এর অনুভাব। স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ এগুলি হল সঞ্চারিভাব।

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে হনুমানের বিবিধ চেষ্টা, সীতান্বেষণে রামচন্দ্রকে সহায়তা এবং তাঁর পরাক্রমের দ্বারা বীররসের অভিব্যক্তি হয়েছে। বীররস দান, ধর্ম, যুদ্ধ ও দয়াভেদে চার প্রকার।[২৭৮] এখানে যুদ্ধবীররূপে হনুমানের বর্ণনা করা হয়েছে।

৪.৪.৮ অদ্ভুতরস: দৃশ্যকাব্যে আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা অদ্ভুতরসের অভিব্যক্তি অত্যন্ত সহজেই হয়ে থাকে। দৃশ্যকাব্যে বর্ণনবৈদগ্ধ্যের দ্বারা এর নিষ্পত্তি হয়। তাই কোনো বস্তু বা বিষয়ের মনোগ্রাহী বর্ণনার দ্বারাও অদ্ভুতরসের অভিব্যক্তি হতে পারে।

আচার্য বিশ্বনাথ অদ্ভুতরস প্রসঙ্গে বলেছেন-

অদ্ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ।

পীতোবর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতম্।

গুণানাং তস্য মহিমা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ।

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চগদগদস্বরসংভ্রমঃ॥

তথা নেত্রবিকাসাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

বিতর্কাবেগসম্ভ্রান্তিহর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥[২৭৯]

অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব হল বিস্ময়। দেবতা গন্ধর্ব ও বর্ণ পীত। অলৌকিক বস্তু এই রসের আলম্বন বিভাব এবং গুণের মহিমা উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদগদ স্বর, বেগ, নেত্র বিকাশ প্রভৃতি এর অনুভাব। বিতর্ক, আবেগ, জড়তা, হর্ষ প্রভৃতি হল অদ্ভুত রসের ব্যভিচারী ভাব।

সুভাষিতোদ্ধারশতকের একটি শ্লোকে কবি বলেছেন-

নিসর্গজিহ্মতা ভব্যং নোত্পাদযতি জাতু চিত্।

দৃষ্টিরাকেকরা ক্বাপি নো কটাক্ষসমা মতা॥[২৮০]

অর্থাৎ প্রকৃতিবক্রতা ভব্যতা উৎপাদন করে না। জন্মগত বক্রদৃষ্টি কটাক্ষের মতো শোভনীয় হয় না। যুবতী নারীর কটাক্ষ তার যৌবনের ভূষণরূপে পরিগণিত হয়। বিবিধ কবির কাব্যে এই কটাক্ষের ভূয়সী বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু যাদের দৃষ্টি প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত বক্র, তা কখনও মনোজ্ঞ হতে পারে না। এখানে অদ্ভুতরসের অনুকূল বিভাব, অনুভাবাদির প্রয়োগ না থাকলেও বর্ণন-বৈদগ্ধ্যের দ্বারা অদ্ভুতরসের অভিব্যক্তি হয়েছে। এইপ্রসঙ্গে মহর্ষি ভরত বলেছেন-

যত্ত্বতিশযার্থযুক্তং বাক্যং শিল্পং চ কর্মরূপং বা।

তত্ সর্বমদ্ভুতরসে বিভাবরূপং হি বিজ্ঞেযম্॥[২৮১]

অর্থাৎ অতিশয়ার্থযুক্ত বাক্য, চরিত্র, কর্ম ও রূপের আতিশয্য প্রভৃতি ব্যাপারগুলির দ্বারা অদ্ভুতরসের বিভাবরূপে প্রতীত হয়। এখানে অতিশয় অর্থ বলতে শ্লেষধর্মী বা একাধিক

অর্থধর্মী এবং চমৎকারজনককে বোঝানো হয়েছে। মনোজ্ঞ চরিত্র চিত্রণ, বিস্ময়োৎপাদক কর্ম বা রূপের দ্বারা অদ্ভুতরসের অভিব্যক্তি হতে পারে। আলোচ্য শ্লোকেও বক্তব্যের চমৎকারিত্বের দ্বারা বিস্ময় উৎপন্ন হওয়ায় এখানে অদ্ভুতরস স্বীকার্য।

বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে রাজেন্দ্র মিশ্র *প্রভাতমঙ্গলশতকে* বলেছেন-

জগদ্ বিভক্ত রাষ্ট্রেষু রাষ্ট্রং প্রান্তেষু খণ্ডিতম্।
প্রান্তো জনপদেষ্বর্ধস্তদপি গ্রামবিস্তৃতম্॥
বর্গভিন্না ইমে গ্রামা মুণ্ডভিন্নাশ্চ মানবাঃ।
সর্বত্রৈব বিভাগোঽস্তি ক্বাঽপি নৈবাস্তি সংহতি॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিযশ্চাপি বৈশ্যকম্।
দ্বেষ্টি বৈশ্যোঽপি শূদ্রাখ্যং শূদ্রো দ্বেষ্টি নিজাবরান্॥[২৮২]

অর্থাৎ এই পৃথিবী রাষ্ট্রের দ্বারা বিভক্ত, রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রান্তের দ্বারা বিভক্ত, প্রান্ত জনপদের দ্বারা বিভক্ত এবং জনপদ গ্রামের দ্বারা বিভক্ত। বর্গের দ্বারা গ্রাম বিভক্ত, মানুষ মুণ্ডের দ্বারা বিভক্ত। সর্বত্র শুধু বিচ্ছিন্নতা, কোথাও সংহতি নেই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঘৃণা করে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে ঘৃণা করে, বৈশ্য শূদ্রকে ঘৃণা করে এবং শূদ্ররা তাদের থেকে নিম্নবর্ণকে ঘৃণা করে। এখানে বিচ্ছিন্নতাকে কবি অসামান্য দক্ষতায় ব্যক্ত করেছেন। এখানেও বর্ণন-বৈদগ্ধ্যের দ্বারা অদ্ভুতরসের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

শ্রব্যকাব্যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের অসাধারণ বর্ণনা পাঠকের চিত্তে বিস্ময়ের জন্ম দেয়। অনন্যপরতন্ত্র কবির দৃষ্টি যখন সীমা থেকে অসীমে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তার উক্তিতে অতিশয়োক্তি ফুটে ওঠে। এই বিস্ময় যেকোনো রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। শৃঙ্গাররসে সম্ভোগের অপরূপ বর্ণনা। বিপ্রলম্ভে বিরহ-ব্যকুল অবস্থা। করুণরসে মর্মস্পর্শী বেদনার ব্যাপ্তি- এই সমস্ত ক্ষেত্রে অদ্ভুতরসের সহাবস্থান থাকতে পারে। তাই পরবর্তীকালে জনৈক কাব্য-সমালোচক এই রসকেই একমাত্র রস বলে স্বীকার করেছেন।

প্রভাতমঙ্গলশতকে কবি সরস্বতীর স্তুতি প্রসঙ্গে একটি শ্লোকে বলেছেন-

যৎপাদপঙ্কজসমাহিতমঞ্জুমাধ্বীমাস্বাদ্য জাতপুলকো মধুপাযমানঃ।

কাব্যানি গাযতি কবী রসবন্তি সা মে ব্রাহ্মী তনোতু নবমঙ্গলসুপ্রভাতম্॥[২৮৩]

অর্থাৎ যার চরণকমলের সমাহিত মনোজ্ঞ মধু পান করে পুলকিত কবিগণ রসময় কাব্য রচনা করেন; সেই ব্রাহ্মী নবপ্রভাত দান করুন। এখানে সরস্বতীর মহিমা কীর্তনে বর্ণনার অতিশয়োক্তি হয়েছে। তাই এই শ্লোকে অদ্ভুতরসাভিব্যক্তি হয়েছ।

বিদ্বান ও মূর্খের পার্থক্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

তাবন্ন শোভতে বিদ্বান্ যাবৎকিঞ্চিন্ন ভাষতে।

তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎকিঞ্চিন্ন ভাষতে॥[২৮৪]

অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি যতক্ষণ কিছু বলেন না, ততক্ষণ শোভিত হন না। (কারণ বাক্যের দ্বারা তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়) অন্যদিকে মূর্খ ব্যক্তি ততক্ষণই শোভিত হয়, যতক্ষণ কিছু না বলে। এখানে বক্তব্যের চাতুর্যের দ্বারা অদ্ভুতরস হয়েছে।

চিকিৎসকদের দুর্নীতি প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

বৈদ্যরাজ! নমস্তুভ্যং যমরাজসহোদর!

হরিষ্যতি যমঃ প্রাণাংস্তবাপীতি বিচিত্রকম্॥[২৮৫]

যমের সহোদর হে বৈদরাজ! তোমাকে নমস্কার। একদিন তিনি একইভাবে তোমারও প্রাণ হরণ করবেন কী বিচিত্র!

এখানে প্রশংসার ছলে নিন্দা করা হয়েছে। উক্তিবক্রতার দ্বারা এখানে অদ্ভুতরস হয়েছে।

চতুর্থীশতকে উক্তিবক্রতার দ্বারা অদ্ভুতরসের আর একটি উদাহরণ-

অক্ষমো নিতরাং দ্বেষী পরোত্কর্ষাবলোকনে।

সুযোধনায পাপায কলঙ্কায নমো নমঃ॥[২৮৬]

অর্থাৎ অক্ষম (কর্মোদ্যমহীন) ব্যক্তিরা সর্বদা অপরের উৎকর্ষে হিংসা করে। সেই সুযোধন, পাপরূপ কলংককে নমস্কার। এখানেও প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা প্রতিপাদিত হয়েছে। অতএব অতিশয়ার্থবোধক বাক্য বা উক্তিবক্রতার দ্বারা এখানে অদ্ভুতরস স্বীকার্য।

সম্বোধনশতকের ১৩ নং শ্লোকে কবি চশমার প্রশংসা করেছেন এইভাবে-

গুরোরপি ত্বং সুমহান্ হিতৈষী কুদৃষ্টিসংশোধনরীতিদক্ষঃ!
যদন্ধতাং চারুদৃশোরপোহ্য সদোপনেত্র! প্রতনোষি দৃষ্টিম্॥

অর্থাৎ গুরুর চেয়েও তুমি মহান, হিতৈষী। কুদৃষ্টি (ক্ষীণ দৃষ্টি) সংশোধনে দক্ষ হে উপনেত্র! তুমি অন্ধকার হরণ করে দৃষ্টির কল্যাণ কর। এই সকল শ্লোকে বর্ণনবৈদগ্ধ্যের দ্বারা অদ্ভুতরসের নিষ্পত্তি হয়েছে।

৪.৪.৯ শান্তরস: রাজেন্দ্র মিশ্র বিরচিত *অভিরাজসপ্তসতী* শতকসমুচ্চয়ে তীর্থক্ষেত্র, সবুজ বনরাজি, ভারতবর্ষের ঋতুবৈচিত্র্য, স্বীয় গুরুবর্গের প্রশস্তি প্রভৃতির বর্ণনায় শান্তরসের নিষ্পত্তি ঘটেছে।

আচার্য বিশ্বনাথোক্ত শান্তরসের লক্ষণ-

শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারাযণদৈবতঃ॥
অনিত্যত্বাদিনাশেষবস্তুনিঃ সারতা তু যা।
পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥
পুণ্যাশ্রমহরিক্ষেত্রতীর্থরম্যবনাদযঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ॥
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্বেদহর্ষস্মরণমতিভূতদযাদযঃ॥[২৮৬]

শান্তরসের স্থায়িভাব শম। এর বর্ণ কুন্দপুষ্পের মতো শুভ্র। দেবতা শ্রীনারায়ণ। অনিত্যতা বশত জাগতিক বস্তুর অসারত্ব অথবা পরমাত্মস্বরূপ হল শান্তরসের আলম্বন বিভাব। পুণ্যক্ষেত্র, সবুজ

বনানী, তীর্থস্থান, মহাপুরুষসঙ্গ প্রভৃতি এর উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব হল রোমাঞ্চ প্রভৃতি। নির্বেদ, হর্ষ, সর্বভূতে দয়া, স্মরণ, মতি প্রবৃত্তি হল শান্তরসের ব্যভিচারিভাব।

নব্যভারতশতকে কবি নিজ গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন-

প্রণমামি স্ফুটস্বান্ত গুরুং বাত্সল্যমেদুরম্।
প্রথমং শ্রীলক্ষ্মীকান্তং দীক্ষিতং প্রিযগৌরবম্॥
বন্দে চ তদনু প্রীত্যা শুক্লবিদ্যান্বযোভযম্।
শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদাখ্যং গুরুং স্নেহহিমাচলম্॥
আদ্যাপ্রসাদমিশ্রাখ্যং পূজ্যং জনকসোদরম্।
গুরুবর্যং বৃণে চান্তে যোগক্ষেমসুচিন্তকম্॥[২৮৭]

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত, শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ শুক্ল এবং কবির পিতৃব্য তথা শিক্ষাগুরু আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের প্রতি ভক্তিভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে আলম্বন বিভাব লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত প্রভৃতি গুরুগণ, উদ্দীপন বিভাব হল তাঁদের প্রশস্তি, তাঁদের প্রতি ভক্তিভাব অনুভাব এবং হর্ষ, স্মরণ প্রভৃতি হল ব্যভিচারিভাব। মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য, তাঁদের স্মরণ প্রভৃতির দ্বারা এখানে শান্তরস নিষ্পন্ন হয়েছে।

মাতৃশতকে কবি নিজ মাতার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন। কবি বলেছেন-

নহি বিরঞ্চিপদং ন শিবাস্পদং ন চ মুকুন্দপদং তপসা বৃণে।
ননু বৃণে পদমাস্পদমঞ্জসা যদি তু মাতুরদোঽদ্রিভুবোঽথবা॥[২৮৮]

আমি তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মধাম, শিবধাম বা বিষ্ণুধাম কামনা করি না। আমি পরম ধামের কামনা করি না, যদি স্বর্গরূপা বা স্নেহপর্বতরূপী মাতার আশ্রয় লাভ করি।

এখানে স্বীয় মাতার প্রতি ভক্তিভাবনার দ্বারা অন্যান্য সমস্ত মোক্ষধামের প্রতি কবির উদাসীন্য ব্যক্ত হওয়ায় শমভাব উৎপন্ন হয়েছে। অতএব এখানে শান্তরসের প্রতীতি হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় সভ্যতায় প্রাতঃস্মরণীয়া সরস্বতী, দেবহূতি, অহল্যা, যশোধরা ও অন্যান্য নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত শান্তরসের নিষ্পত্তি হয়েছে।

ভারতদণ্ডকের আটটি অংশে ভারতীয় সংস্কৃতি, বিশ্ববন্দিত দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত ভাষার ঔদার্য, কালিদাসপ্রমুখ কবিগনের কাব্য-নৈপুণ্য, পুণ্যতোয়া নদীসমূহ, ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, বিবিধ পর্বতমালা, সমুদ্র, শস্যশ্যামলা ভূমিভাগ, বিবিধ ঋতুর সমারোহে প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রভৃতির বর্ণনায় শান্তরসের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন-

জযতু জযতু ভারতং পূততীর্থস্তপঃক্ষেত্রপুঞ্জৈর্যুতং যত্র কৈলাশবাসী শিবৌ ধূর্জটিঃ যত্র মোক্ষপ্রদা গঙ্গিকাযাস্তটী যত্র গৌরীগুরোঃ পাবনে মস্তকে রাজতে গোমুখং মোক্ষলাভামুখং যত্র মন্দাকিনী কল্মষধ্বংসিনী মঞ্জুভাগিরথী মূলনিস্যন্দিনী ক্ষীরশুভ্রা২নঘা সা২লকানন্দিনী.....॥[২৮৯]

অর্থাৎ সেই ভারতবর্ষের জয় হোক, যেখানে পুন্যতীর্থক্ষেত্র ও তপঃক্ষেত্র সমন্বিত, যেখানে কৈলাশ নিবাসী জটাধর শিব, যেখানে মোক্ষদা গঙ্গার তটভূমি, যেখানে মোক্ষের মূল স্থল গোমুখ (গুহা), যেখানে পাপনাশিনী মন্দাকিনী, মনোরমা ভাগিরথী, মূলভূত ক্ষীরশুভ্র নির্মল অলকানন্দা। আলোচ্য অংশে তীর্থক্ষেত্র, মহাদেব, পবিত্র নদীসমূহ প্রভৃতি শমপ্রধান স্থানের উল্লেখ রয়েছে। অতএব এখানে শান্তরস অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

সম্বোধনশতকে অনুরূপ শ্লোক রয়েছে-

ক্বচিদ্ বসন্তেন পিকোদ্গমেন ক্বচিন্নিদাঘেন শরত্ক্রমেণ।
ক্বচিচ্চ বর্ষাভিরিযং ধরিত্রী ব্যনক্তি কালক্রমণং জনানাম্॥
ফলেন মূলেন সুমেন ছাযযা বিশুষ্কদেহেন চ সর্বতোমুখম্।
মহোপকারং জগতাং সমাদধত্ ত্বমেব শাখিন্! তনুষে কৃতার্থতাম্॥[২৯০]

বসন্তে কোকিলের কুহুস্বরে, গ্রীষ্মের দাবদাহে, শরতের সৌন্দর্যে কখনও বা বর্ষার ধারায় এই প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরে। হে বৃক্ষ! তুমি ফলমূল, মধু, ছায়া এবং শুষ্ক কাষ্ঠদ্বারা সর্বতোভাবে উপকার করে জগৎকে কৃতার্থ করেছ।

উপর্যুক্ত দুটি শ্লোকে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-মহিমা বর্ণনায় শান্তরসের অভিব্যক্তি হয়।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত শতককাব্যগুলিতে বিবিধ রসের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু কিছু শতককাব্যে একক রসের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে মিশ্ররসে রচিত শতককাব্য খুব বেশী দেখা যায় না। কাব্যপিপাসু সহৃদয়গণ শৃঙ্গার রসাশ্রিত শতককাব্যগুলিকে

অনেক বেশি গ্রহণ করেছেন। তাই সময়ের প্রবাহে *গাহাসত্তসঈ, অমরুশতক, শৃঙ্গারশতক* প্রভৃতি শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যগুলি প্রাচীন কালে স্থান পেলেও মানুষের কাছে অদ্যাবধি জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে।

তবে শতককাব্য শুধু শৃঙ্গার রসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তীকালে শান্ত, বীর, অদ্ভুত, করুণ প্রভৃতি রসাশ্রয়ী শতককাব্য বিরচিত হয়েছে।

৪.৫ ধ্বনি বিচার:

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের *অভিরাজসপ্তশতীতে* মূল্যবোধ, সমকালীন সমস্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, উৎকোচ, অপসংস্কৃতি, আত্ম-অবমাননা প্রভৃতির আলোচনাবসরে ধ্বনির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। *অভিরাজসপ্তশতীর* অনেক শ্লোকে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। কাব্য বাক্ ও অর্থের এমন এক সমন্বয়, যেখানে বাচক শব্দ ও বাচ্যার্থ উভয়ই অপ্রধান হয়ে সহৃদয়-চিত্তে এক ভিন্ন অর্থ প্রধানরূপে প্রতিভাত হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতায় বাগর্থের এই রহস্যময়তাকে ক্রান্তদর্শী ঋষি উপমার দ্বারা বর্ণনা করেছেন-

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি-এনাম্।
উত তু অস্মৈ তন্বং বিসস্রে জাযা ইব পত্যে উশতী সুবাসাঃ॥[২৯১]

অর্থাৎ এই বাককে কেউ দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। প্রণয়কামী সুবিন্যস্ত পত্নী যেমন পতির সম্মুখে নিজের দেহকে উন্মোচিত করে, এই বাক্ বিদ্বানের কাছে তেমন করে তার তনুকে উদ্ঘাটিত করে। অর্থাৎ সহৃদয় কাব্যরসিকগণই এই বাগর্থের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারেন।

উৎকৃষ্ট কাব্য সর্বদাই এক বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে। সহৃদয়-সামাজিকগণ এই অর্থের আস্বাদ লাভ করে থাকেন। এই অন্তর্নিহিত অর্থই হল ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ অথবা ধ্বনি। ব্যুৎপত্তি অনুসারে ধ্বনি শব্দের অর্থ হল *ধ্বন্যতে ইতি ধ্বনিঃ, ধ্বননং ধ্বনিঃ, ধ্বনতি ইতি ধ্বনিঃ*। এই অর্থে, যা প্রকাশ করে বা প্রকাশিত হয়, তাকে বলে ধ্বনি। কাব্যে বাচক শব্দ এবং বাচ্যার্থ উভয়ই গৌণ হয়ে প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে অথবা প্রকাশিত হয়। এই মতকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টিয় নবম শতকের আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও *ধ্বন্যালোকের* শুরুতেই তিনি জানিয়েছেন যে, এই ধ্বনিবাদ নতুন

কোনো তত্ত্ব নয়। পূর্বাচার্যগণ এইব্যাপারে আগেই বলেছেন।[২৯২] আনন্দবর্ধন পূর্বপক্ষরূপে ধ্বনিরিরোধী মতবাদগুলি খণ্ডন করে ধ্বনিসিদ্ধান্তকে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আচার্য আনন্দবর্ধনকেই ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবক্তা বলে স্বীকার করা হয়েছে। আচার্য আনন্দবর্ধন বলেছেন-

প্রতীযমানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।

যত্তত্ প্রসিদ্ধাবযবাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥[২৯৩]

মহাকবিদের বাণীতে (কাব্যে) একটি ভিন্ন বস্তু থাকে, যাকে বলা হয় প্রতীয়মানার্থ। এই প্রতীয়মানার্থ রমণীর প্রসিদ্ধ অবয়ব-সৌন্দর্যের থেকে স্বতন্ত্র লাবণ্যের মতো প্রতীত হয়। তবে আনন্দবর্ধন বাচ্যার্থের গুরুত্বকেও স্বীকার করেছেন। এইপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট- আলোকার্থী যেমন আলোকের উপায় স্বরূপ প্রদীপ-শিখার প্রতি যত্নপরায়ণ হন, তেমনই কবি ও সহৃদয়কে ব্যঙ্গ্যার্থের উপায়রূপ বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।[২৯৪]

আনন্দবর্ধন ধ্বনির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃস্বার্থৌ।

ব্যঙক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥[২৯৫]

অর্থাৎ যেখানে অর্থ (বাচ্যার্থ) অথবা শব্দ (বাচক শব্দ) নিজেকে গৌণ করে প্রতীয়মান স্বাদু অর্থকে প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষকে পণ্ডিতগণ ধ্বনি নামে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত এই ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের মুখ্য বস্তু। এই অর্থ কাব্যরসিকের চিত্তকে আমোদিত করে এক লোকোত্তর আনন্দময় রসের আস্বাদ প্রদান করে। এখানেই বস্তুনিষ্ঠ রচনা ও কাব্যের পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছে। আনন্দবর্ধন তাই বাচ্য ও প্রতীয়মানার্থের আলোচনাবসরে ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মারূপে স্বীকার করেছে-

যোঽর্থঃ সহৃদযশ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতাঃ।

বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥[২৯৬]

আনন্দনর্ধন কাব্যে গুণ ও অলংকারের গুরুত্ব স্বীকার করলেও সেগুলিকে মুখ্যবস্তুরূপে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি যেমন মানুষের আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে, তেমনই

ওজো, প্রসাদ প্রভৃতি গুণ কাব্যের আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। অন্যদিকে কটক, কুণ্ডলাদি যেমন মানুষের দেহকে আশ্রয় করে থাকে, সেইরকম উপমা, অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার ও অর্থালংকারগুলি কাব্যের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করে থাকে। অর্থাৎ গুণ কাব্যের আভ্যন্তর সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে এবং অলংকারগুলি কাব্যের বাহ্যিক সৌন্দর্য বিধান করে-

তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।

অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবত্॥[২৯৭]

আচার্য কুন্তকও বাচক শব্দ ও বাচ্যার্থের অতিরিক্ত এক বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি সমন্বিত কবি-ভাবনাময় সহৃদয়ের আহ্লাদ বিধায়ক শব্দ ও অর্থের বিন্যাসকে কাব্য বলেছেন-

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনী।

বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥[২৯৮]

তিনি আনন্দবর্ধনের মতের স্বপক্ষে কাব্যে শব্দ ও অর্থের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং এই উভয়ের সৌন্দর্য বা অলংকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু শব্দ ও অর্থের মূল অলংকৃতিকে তিনি বলেছেন বক্রোক্তি। যাকে আনন্দবর্ধন বলেছেন ধ্বনি। কুন্তকের মতে এই বক্রোক্তি হল কবিনৈপুণ্যের এক বিশেষ ভঙ্গির বাংময় প্রকাশ।[২৯৯]

রাজেন্দ্র মিশ্র বর্তমান সময়ের অরাজকতাকে বার বার তিরস্কার করেছেন। তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। তাই আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেছেন-

কথং যুধ্যতি ধর্মেন্দ্র কথং হসতি মালিনী।

দিলীপস্তু কথং বক্তি কথং নৃত্যতি হেলনা॥[৩০০]

আলোচ্য শ্লোকের বাচ্যার্থ হল ধর্ম কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, কী করে মালিনী (পুষ্প বিশেষ) হাসবে (আন্দোলিত হবে)। দিলীপের সুখ্যাতি কে কীর্তন করবে, কী করেই বা জ্যোৎস্না আলো ছড়াবে।

এখানে কবির মূল বিবক্ষা হল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দুর্নীতির নিন্দা করা। ধর্মের প্রতিষ্ঠা, পুষ্পের নৃত্য, দিলীপের গুণকীর্তন এবং জ্যোৎস্নার বিস্তার এইসব ক্ষেত্রে বাচ্যার্থকে অতিক্রম

করে প্রতীয়মানার্থ বর্তমান রাজনৈতিক অন্যায়-অবিচার প্রতিভাত হয়েছে। এখানে বিবক্ষিত বাচ্যকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রধানরূপে অন্য এক অর্থ দ্যোতিত হয়েছে।

আচার্য আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক* অনুসারে ধ্বনির প্রধান দুটি ভেদ দেখানো হয়েছে, যথা- অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য।[৩০১] যেখানে বাচ্যার্থের বিবক্ষা থাকে না। অন্য অর্থ প্রধানরূপে প্রতিভাত হয়, সেখানে হয় অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি। আর যেখানে মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে অন্য একটি অর্থের দ্যোতনা ঘটে, সেখানে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি স্বীকৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হল লক্ষণামূলা ধ্বনি। এখানে বাচ্যার্থ থেকে প্রতীয়মানার্থের বোধ লক্ষণার দ্বারা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি হল অভিধামূলা ধ্বনি। এক্ষেত্রে অভিধেয় অর্থের স্পষ্টতা থাকলেও তা অতিক্রম করে প্রতীয়মানার্থের বোধ হয়।

আলোচ্য শ্লোকেও মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে ব্যঞ্জনার দ্বারা অন্য একটি অর্থের দ্যোতনা ঘটেছে। তাই এখানে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি হয়েছে।

আবার বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যকে অসংলক্ষ্যক্রম ও সংলক্ষ্যক্রম এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। বাচ্যার্থ জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই যদি ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়, অর্থাৎ বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির মধ্যে কোনো ক্রম না থাকে, তবে তাকে বলে অসংলক্ষ্যক্রম। অসংলক্ষ্যক্রমে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকায় প্রায়শ উভয়ের স্বাতন্ত্র্যের বা পৌর্বাপর্যের প্রতীতি হয় না। তাই একে বলা হয় অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি। আচার্য মম্মট বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- *অলক্ষ্যেতি। ন খলু বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসঃ। অপি তু রসস্তৈঃ, ইত্যস্তি ক্রমঃ। স তু লাঘবান্ন লক্ষ্যতে*।[৩০২] অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি থাকলেও রসানুভূতির শীঘ্রতা বশত যেমন এগুলির পৌর্বাপর্য লক্ষ্যিত হয় না, তেমনই অসংলক্ষ্যক্রমে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য থাকলেও উভয়ের পৌর্বাপর্য প্রায়শ বোধগম্য হয় না। তাই ধ্বনিকার রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবশবলতা এই আটটি ভেদ দেখিয়েছেন।[৩০৩] কারণ এই আটটিতে বাচ্য ও প্রতীয়মানার্থের ক্রম লক্ষ্যিত হয় না। আর সেই ব্যঙ্গ্যার্থ যদি ক্রমশ প্রকাশিত হয়, তাকে বলে সংলক্ষ্যক্রম। এই শ্লোকে বাচ্যার্থের অর্থোপলব্ধির পরেই ক্রমান্বয়ে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়েছে। তাই এখানে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। অতএব আলোচ্য শ্লোকে সংলক্ষ্যক্রম বিবক্ষিতান্যপরব্যঙ্গধ্বনি হয়েছে।

কবির মতে বর্তমান সময়ে রাজনীতি একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। তাই মুর্খ, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে রাজনীতিকে কলুষিত করছে। তাই তিনি বলেছেন-

যদি বিমানসুখেঽস্তি কুতূহলং যদি চ শাসিতুমিচ্ছতি ভূতলম্।
ঋজুপথং প্রবিহায সমাচর ত্বমপি রাজনযং প্রিযবৎসক॥[৩০৪]

প্রিয় বৎস! যদি বিমানযাত্রা প্রভৃতি সুখের কৌতূহল থাকে, যদি এই ধরিত্রী শাসন করতে চাও, তবে সহজ পথ পরিহার করে তুমিও রাজনীতির পথ গ্রহণ করো।

আলোচ্য শ্লোকে কবি আলোচনা করেছেন যে, কীভাবে কপর্দকহীন, বিদ্যা-বুদ্ধিহীন মানুষ দুর্নীতি করে আর্থিকভাবে স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে। এখানে বাচ্যার্থের দ্বারা রাজনীতির প্রশংসা বিহিত হলেও প্রতীয়মানার্থের দ্বারা তার নিন্দা করা হয়েছে।

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গের আটটি ভেদের উপর ভিত্তি করে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ধ্বনির তিনটি ভেদ স্বীকার করেছেন, যথা- বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি এবং রসধ্বনি। এই তিনটির মধ্যে তিনি আবার রসধ্বনিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। *ধ্বন্যালোক* অনুসারে যেখানে বাচ্যার্থ থেকে অনেক দূরে ব্যঙ্গার্থের প্রতীতি হয় অর্থাৎ যখন বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গার্থ সম্পূর্ণ পৃথক অর্থের দ্যোতনা করে, তখন বস্তুধ্বনি স্বীকৃত হয়- *আদ্যস্তাবত্ প্রভেদো বাচ্যাদ্ দূরং বিভেদবান্*।[৩০৫] উপর্যুক্ত *যদি বিমানসুখেঽস্তি কুতূহলং* প্রভৃতি শ্লোকে বাচ্যার্থের দ্বারা স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির পথ গ্রহণের কথা বলা হলেও ব্যঙ্গার্থের দ্বারা তার নিষেধ দ্যোতিত হয়েছে। তাই এখানে বস্তুধ্বনি।

কবি বস্তুধ্বনির আশ্রয়ে রাজনীতি বিষয়ে আরও বলেছেন-

রূপযৌবনসম্পন্না করালকুলসম্ভবাঃ
বিদ্যাহীনাঃ সুশোভন্তে যদি সন্তি বিধাযকাঃ॥[৩০৬]

অর্থাৎ যদি রূপযৌবন থাকে নিঃকৃষ্টকুলে জন্ম হলেও, বিদ্যাহীন ব্যক্তিও বিধায়কপদ লাভ করলে সুশোভিত হয়। আলোচ্য শ্লোকেও বাচ্যার্থের দ্বারা রাজনীতির গুণকীর্তন বোঝালেও ব্যঙ্গার্থের দ্বারা তার নিষেধ দ্যোতিত হয়েছে। তাই এখানেও বস্তুধ্বনি।

অভিরাজসপ্তশতীর কিছু কিছু শ্লোকে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র অর্থালংকারের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। কবি-প্রতিভার স্পর্শে অলংকাধ্বনির প্রতীত হয়েছে। যেমন-

যদ্বক্ত্রপঙ্কজবিনিসৃতগূঢ়বাচ পার্থোঽপি নো গণয়িতুং সহজং ক্ষমোঽভূত্।

রাধাপদাব্জরতিজাতমনোবিনোদো যোগেশ্বরস্স কুরুতাং নবসুপ্রভাতম্॥[৩০৭]

অর্থাৎ যাঁর মুখপদ্ম-নিঃসৃত নিগূঢ় বচন অর্জুনও সহজে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি, রাধার পাদপদ্মাভিলাষী মনোবিনোদের যোগেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) নবপ্রভাত দান করুন।

এখানে *বক্ত্রপঙ্কজ* অংশে শ্রীকৃষ্ণের মুখে পদ্মের আরোপ হয়েছে। আবার *রাধাপদাব্জ* অংশে শ্রীরাধার চরণে পদ্মের আরোপ হয়েছে। অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্যবশত উভয়ের মধ্যে অভেদ আরোপিত হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকে লক্ষণা বা অভিধার দ্বারা প্রতীয়মানার্থের চমৎকারিত্বের চেয়ে অলংকারের দ্বারাই বিবক্ষিত বিষয়ের চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এখানে (অশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধন পরম্পরিত) রূপক অলংকারের প্রয়োগে অলংকাধ্বনি বা রূপকধ্বনি স্বীকার্য।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র একাধারে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির কলংকস্বরূপ কুসংস্কারের নিন্দা করেছেন, তেমনই বিজ্ঞানের নাম করে মানুষকে মিথ্যা জ্ঞানে প্ররোচিত করার নিন্দা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন-

উপচ্ছন্দযত্যেণবৃন্দং বধার্থং যথা লুব্ধকো বেণুনাদৈর্নিতান্তম্।

তথা মানবান্ মূঢ়বুদ্ধীন্ মুমূর্ষূন্ অলম্মোহযস্যদ্য বিজ্ঞান! নিত্যম্॥[৩০৮]

অর্থাৎ ব্যাধ যেমন বধের জন্য হরিণকে বেণুনাদের দ্বারা মোহিত করে, তেমন বিজ্ঞানও স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। আলোচ্য শ্লোকেও বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গার্থের চমৎকারজনক প্রতীতি না থাকলেও উপমা অলংকারের সার্থক প্রয়েগ দেখা যায়। এখানে উপমান 'লুব্ধক', উপমেয় 'বিজ্ঞান', সাধারণ ধর্ম 'মোহগ্রস্ততা' এবং ঔপম্যবাচি শব্দ 'যথা'। বিজ্ঞানের স্বল্পবুদ্ধির দ্বারা মানুষকে মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত করা এবং ব্যাধের দ্বারা হরিণকে মোহাচ্ছন্ন করা- দুটির মধ্যে অবৈধর্ম সাধিত হয়েছে। তাই এখানে উপমা অলংকার। উপমা অলংকারের চমৎকারিত্বের দ্বারা উপমাধ্বনি হয়েছে।

অভিরাজসপ্তশতীর কিছু কিছু শ্লোকে বাচ্যসামর্থের দ্বারা রসধ্বনির নিষ্পত্তি হয়েছে। *প্রভাতমঙ্গলশতকের* একটি শ্লোকে কবি হনুমানের বীরত্বব্যঞ্জক বীররসের প্রয়োগ দেখিয়েছে-

লাঙ্গুলবদ্ধগিরিখণ্ডচলৎপ্রহারৈর্লংকাকলংকবিকলাং বিধুরাং প্রকুর্বন্।

স্কন্ধাধিরোপিতসলক্ষ্মণরাঘবেন্দ্রঃ প্রাভঞ্জনির্দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥[৩০৯]

যিনি লাঙ্গুলের দ্বারা গিরিখণ্ডের প্রহারে লংকাকে কলংক-বিকল করেছেন, রাম-লক্ষ্মণকে স্বস্কন্ধে ধারণকারী সেই প্রাভঞ্জ হনুমান নবপ্রভাত দান করুন। এখানে বীররসের স্থায়িভাব 'উৎসাহ' বাচক শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে না থাকলেও তার ব্যঞ্জনা রয়েছে। আলম্বন বিভাব হল হনুমান। লংকার (লংকানিবাসী রাক্ষসদের) সাহস, পরাক্রম প্রভৃতি হল উদ্দীপন বিভাব। লংকার কলংকবিকল বিধুর অবস্থা হল অনুভাব। এইপ্রসঙ্গে আচার্য আনন্দবর্ধনের রসধ্বনি বিষয়ে উক্ত একটি বক্তব্যের উপস্থাপন করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন- *তৃতীয়স্তু রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ত প্রকাশতে ন তু সাক্ষাত্ শব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্ বিভিন্ন এব*।[৩১০] অর্থাৎ এই রসধ্বনিও বাচ্যার্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎরূপে শব্দব্যাপারের বিষয় নয়। তাই রসধ্বনিও বাচ্য থেকে পৃথক। অর্থাৎ বাচ্যার্থ থেকে প্রতীয়মানার্থ জ্ঞানের যে চমৎকারিত্ব লক্ষণামূলা বাচ্যধ্বনি ও অভিধামূলা ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে প্রধানরূপে প্রতিভাত হয়, রসধ্বনিতে তা কেবলমাত্র রসোপলব্ধির দ্বারাই হয়ে থাকে। তাঁর মতে শৃঙ্গার, বীর প্রভৃতি শব্দ না থাকলেও কেবলমাত্র উক্ত রসের বিভাবাদি শব্দ বা বিভাবাদির দ্যোতনা থাকলেও এই রসধ্বনি হয়ে থাকে- *যতশ্চ স্বাভিধামন্তরেণ কেবলেভ্যোঽপি বিভাবাদিভ্যো বিশিষ্টেভ্যো রসাদীনাং প্রতীতিঃ*।[৩১১]

আলোচ্য শ্লোকেও বিভাবাদি ব্যঞ্জক শব্দের দ্বারা রীররসের প্রতীতি হওয়ায় রসধ্বনি স্বীকার্য। আবার আলোচ্য শ্লোকে হনুমান শারীরিক সকল শক্তির প্রয়োগ না করেই কেবলমাত্র লাঙ্গুরের দ্বারাই লংকানগরীকে বিকল করেছেন- এইরকম প্রতীত হয়েছে। তাই এখানে বস্তুধ্বনি।

যখন অধ্যবসায়, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোনো মূল্য থাকে না, তখন যোগ্যের পরিবর্তে অযোগ্য ব্যক্তি সাফল্য-সরণির অগ্রে থাকে। আর অযোগ্যদের প্রধান যোগ্যতা হল উৎকোচ। তাই কবি উৎকোচের নিন্দা প্রসঙ্গে বলেছেন-

নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিত্ ক্রিযা ফলবতী ভবেত্ ।

তস্মাদ্ দ্রব্যং পুরস্কৃত্য বিজ্ঞঃ কার্যাণি সাধযেত্॥[৩১২]

আলোচ্য শ্লোকের বাচ্য অর্থ হল অদ্রব্যে নিহিত কোনো ক্রিয়া কখনও সাফল্য লাভ করে না। তাই বিজ্ঞজন দ্রব্যাদি পুরস্কার পূর্বক কার্য সাধন করবে। এক্ষেত্রে 'নাদ্রব্যে' শব্দের বাচক অর্থ হল অদ্রব্যে বা অপাত্রে। কিন্তু এখানে লক্ষণার দ্বারা দ্রব্য ব্যতীত বা উৎকোচ ব্যতীত অর্থের প্রতীতি হয়। দ্বিতীয় পাদে 'বিজ্ঞ' শব্দের প্রতীয়মানার্থ হল স্বার্থানুসন্ধানী ব্যক্তি। লক্ষণার দ্বারা লব্ধ অর্থটি হল উৎকোচ ব্যতীত কোনো কার্যের সিদ্ধি হয় না। তাই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা উৎকোচ দানের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। এখানে বাচ্যার্থটি উপেক্ষিত হয়ে লক্ষণার দ্বারা প্রতীয়মানার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি। অবিবক্ষিতবাচ্যের আবার দুটি ভেদ, যথা- অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য।[৩১৩] যেখানে বাচ্যার্থ সংক্রমিত হয়ে অন্য একটি অর্থ পরিস্ফুট হয়, তাকে বলে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনি। আর যেখানে বাচ্যার্থ অন্য অর্থকে প্রকাশিত করার জন্য স্বীয় অর্থকে তিরস্কার করে বা লঘু করে, তাকে বলে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি। অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনিতে যে বাচ্যার্থ থাকে, তা তুলনামূলক কম বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিতে বাচ্যার্থ অনেক বেশী বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এই শ্লোকে লক্ষণার দ্বারা বাচ্যার্থ থেকে প্রতীয়মানার্থের প্রতীতি ঘটেছে। কিন্তু কেবলমাত্র লক্ষণার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থদুটি থেকে সম্পূর্ণ প্রতীয়মানার্থের নিষ্পত্তি ঘটছে না। অর্থাৎ এখানে বাচ্যার্থটি অতিশয় তিরস্কৃত হয়েছে। অতএব এই শ্লোকে অত্যন্ততিরস্কৃত অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হয়েছে।

বর্তমান সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা যথাযথ সম্মান পান না। পক্ষান্তরে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরাই আজ সর্বত্র সম্মানিত হচ্ছে। কবি এইপ্রঙ্গেও অত্যন্ততিরস্কৃত অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির প্রয়োগ করেছেন-

কদাপি ন শ্রুতং দৃষ্টং যস্য পাণ্ডিত্যবৈভবম্।
উদুম্বরপ্রসূনায নবীনায নমো নমঃ॥[৩১৪]

অর্থাৎ যার পাণ্ডিত্যবৈভব কখনও কেউ শোনেনি বা দেখেনি, সেই নবীন ডুমুর পুষ্পকে নমস্কার। ডুমুর বৃক্ষ অপুষ্পক উদ্ভিদ। তাই 'ডুমুরের ফুল' শব্দটি অলীক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য শ্লোকে 'উদুম্বরপ্রসূন' শব্দের লাক্ষণিক অর্থ হল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি। এছাড়া এখানে নমস্কারের দ্বারা নিন্দা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। শ্লোকের প্রতীয়মানার্থটি হল যার পাণ্ডিত্যেবৈভব কেউ কোনোদিন শোনেনি বা দেখেনি, সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিকে ধিক।

এখানে বাচ্যার্থের বা মুখ্যার্থের বিবক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে লক্ষণার দ্বারা প্রতীয়মানার্থ প্রধানরূপে গণ্য হয়েছে। তাই এখানে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হয়েছে। এখানে বাচ্যার্থটি অতিশয় তিরস্কৃত হয়েছে। তাই এখানে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি। অতএব এখানে অত্যন্ততিরস্কৃত অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হয়েছে।

একটি শ্লোকে কবি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির সাম্প্রিতককালে সম্মাননা এবং যথার্থ বিদ্বানের অবহেলা প্রত্যক্ষ করে সোচ্চার হয়েছেন। ব্যঙ্গ্যভঙ্গিতে কবি বলেছেন-

ভেকপুঞ্জে দধদ্রাবে কোকিলাঃ মুকবৃত্তযঃ।

কুর্বন্তু কিমহো দীনাঃ প্রশ্নোঽযমতিদুষ্করঃ॥[৩১৫]

শ্লোকের বাচ্যার্থ হল ভেকপুঞ্জের কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে, কোকিলরা মৌনবৃত্তি অবলম্বন করেছে। হায়! মানুষ এমন অবস্থায় কী করবে। এখানে ভেক, কোকিল এবং দীন শব্দগুলির লাক্ষণিক অর্থ যথাক্রমে পণ্ডিতম্মন্য মুর্খ ব্যক্তি, বিদ্বান্ বা পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষ।

লক্ষণালব্ধ প্রতীয়মানার্থটি হল পণ্ডিতম্মন্য মুর্খরাই সর্বত্র উপদেশ প্রদান করছে অথচ পণ্ডিতগণ মৌনতা ধারণ করে রয়েছে। কারণ তাদের বাণী কেউ শুনছে না। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের কী গতি হবে!

আলোচ্য শ্লোকের বাচ্যার্থ কবির বিবক্ষিত নয়। এখানে লক্ষণার দ্বারা বাচ্যার্থের চেয়ে প্রতীয়মানার্থটি প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার বাচ্যার্থটি সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রপ্তও হয়নি। তাই এখানে অর্থান্তরসংক্রমিত অবিবক্ষিবাচ্যধ্বনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আচার্য আনন্দনর্ধন ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বললেও রসের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। তাই কাব্যে রসের গুরুত্ব প্রতিপাদ অবসরে তিনি বলেছেন-

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাত্।

সর্বে নবা ইবা ভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥[৩১৬]

অর্থাৎ পুষ্প ও ফলবিহীন বৃক্ষ যেমন বসন্তাগমে পুনরায় নবপল্লব লাভ করে নয়ন-প্রীতিকর হয়, তেমন একই বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্যও রসোত্তীর্ণ হলে তা রমনীয়তা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই *রামায়ণ, মহাভারতাদি* মহাকাব্যে বহুবর্ণিত বৃত্তান্তও ভাস কালিদাসাদি মহাকবিগণের

প্রতিভার স্পর্শে রসময়তা লাভ করেছে। একই বিষয় কাব্যরসিকগণের চিত্তে নবীভূত হয়ে আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছে।

৪.৬ অভিরাজসপ্তশতীতে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার:

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়ে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শতককাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিটি শ্লোক মুক্তক হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুক্তককাব্যে যুগ্মক, সন্দানিতকাদি প্রবন্ধশ্লোক থাকে না। কিন্তু *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত একাধিক শতককাব্যে যুগ্মক প্রভৃতি শ্লোক রয়েছে। যেমন- *নব্যভারতশতকের* শ্লোক নং ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত-

শিশুনাগকুলোত্পন্নাঃ মৌর্যশুঙ্গশকান্বযাঃ।
সাতবাহনকাণ্বাশ্চ গুপ্তমোখরিবংশজাঃ॥
তদনন্দরং তুরুষ্কাঃ কুতুবুদ্দীনবংশজাঃ।
রাজানো হি গুলামাখ্যাঃ খিলজীতুগলকাভিধাঃ॥
লোদিনো মুগলাঃ সূরা অফগানাশ্চ বর্বরাঃ।
আঙ্গলাশ্চ ফ্রান্সদেশীযাঃ পোর্তুগীজাশ্চ ধীযুতাঃ॥
ক্রমেণ ভারতং রাষ্ট্রং গঙ্গাযমুনযোর্গৃহম্।
তুহিনাদ্রিমহোষ্ণোষং নিন্ধুপূতপদাব্জকম্॥
ভূরিসৈন্যবলৈর্দাসীকৃত্য বিশ্বগুরুং চিরম্।
অপজহ্রুর্ণ কিং হন্ত! কলাসংস্কৃতিবৈভবম্॥

এই শ্লোকগুলির মধ্যে সপ্তম শ্লোকে 'অপজহ্রুঃ' (অপ-হৃ লিট্ প্রথমপুরুষের বহুবচন) ক্রিয়াপদটি রয়েছে। অর্থাৎ এই শ্লোকগুলি পরস্পর সাপেক্ষ। তাই পাঁচটি প্রবন্ধশ্লোকের সমন্বয়ে কুলক হয়েছে। এছাড়া এই শতককাব্যেরই ১৩নং ও ১৪ নং শ্লোকের সমন্বয়ে যুগ্মক হয়েছে।

মাতৃশতকের ২০নং থেকে ২৩নং শ্লোকে এবং ৪০নং থেকে ৪৩নং শ্লোকে উভয় ক্ষেত্রেই চারটি প্রবন্ধশ্লোকের সমন্বয়ে কলাপক হয়েছে।

বিভিন্ন প্রয়োজনে যুগ্মকাদি প্রবন্ধ শ্লোকের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন কোনো বিষয় বর্ণনার পরিসর হিসেবে যখন একটিমাত্র শ্লোক পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না, তখন একাধিক শ্লোকের সমন্বয়ে বিষয়টির বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মহাকাব্যাদিতে এইরকম প্রবন্ধশ্লোক প্রায়শই দেখা যায়। এছাড়া ভাবনার গভীরে প্রবেশ না করে তথ্যনির্দেশের মতো করে বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রেও এইরকম শ্লোকের প্রয়োগ হতে পারে। পুরাণাদিতে বিবিধ বংশাবলীর বর্ণনায় এইরকম যুগ্মক প্রভৃতি শ্লোকের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু শতককাব্যে বা মুক্তককাব্যে এইরকম শ্লোকের প্রয়োগ থাকে না। রাজেন্দ্র মিশ্র পুরাণের অনুকরণে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ তথা বৈদেশিক রাজাদের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বলার জন্য, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে মাতৃত্ব আরোপ করে তাঁদের উল্লেখ করার জন্য যুগ্মক, সংলাপকাদির প্রয়োগ করেছেন। *অভিরাজসপ্তশতীর* এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য-বিরুদ্ধ।

শতককাব্য সাধারণত সর্গ, বর্গ, ক্রম প্রভৃতির দ্বারা বিন্যস্ত হয় না। তবে ভর্তৃহরির *শতকত্রয়* বিবিধ বর্গের দ্বারা বিন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া একবিংশ শতকীয় কবি বিষ্ণুকান্ত ঝা বিরচিত *সপার্ষদবৈদ্যনাথশতক* বর্ণনীয় বিষয়ের শিরোনামের দ্বারা বিন্যস্ত। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিকে কোনো বর্গাদি বিভাগের দ্বারা বিন্যস্ত করা হয়নি। যেহেতু মুক্তককাব্যের সর্গাদি বিভাগ কবির স্বেচ্ছাধীন, তাই এক্ষেত্রে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যের অপলাপ হয়নি।

একেকটি শতককাব্য সাধারণত একক রসের দ্বারা নিবদ্ধ হয়ে থাকে। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কোনো কোনো শতকে একাধিক রসের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- *নব্যভারতশতকে* অদ্ভুত, শান্ত ও করুণরসের প্রয়োগ দেখা যায়। *মাতৃশতকে* শান্ত ও করুণরসের প্রয়োগ দেখা যায়। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* শান্ত, বীর ও অদ্ভুতরসের প্রয়োগ রয়েছে। *ভারতদণ্ডক* কেবল শান্তরসের দ্বারাই বিন্যস্ত হয়েছে।

অদ্ভুতরস সমস্ত রসের সঙ্গে যুগপত প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ চমৎকারজনক বর্ণনা, বাগবিন্যাস প্রভৃতির দ্বারাও অদ্ভুতরসের অন্তর্ভাব হতে পারে। তাই শৃঙ্গারাদি রসের উৎকর্ষসাধনে অদ্ভুতরসের প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য রসের সংমিশ্রণ মুক্তকাব্যের দেখা যায় না। এইজন্যই হয়ত টীকাকারগণ *গাহাসত্তসঈ* এর অনেক শ্লোকে

করুণরসের প্রতীতি হলেও সেক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার স্বীকার করেছেন। *অভিরাজসপ্তশতীর* শতককাব্যগুলিতে একাধিক রসের সংমিশ্রণ একটি ব্যতিক্রম।

শতককাব্যের উপজীব্য বিষয়ের ক্ষেত্র বহুব্যাপক। বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে আলংকারিকগণ কোনো পরামর্শ দেন নি। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলির বিষয় হল ভারতীর প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির গুরুত্ব, বর্তমানে সেগুলির দুরবস্থা, ভারতীয় দেব-দেবী, ঋষি, স্বনামধন্য রাজাগণ, প্রাতঃস্মরণীয়া নারী, ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য প্রভৃতি। প্রাচীন শতককাব্যগুলির বিষয় থেকে *অভিরাজসপ্তশতীর* বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এক্ষেত্রে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়নি।

৪.৭ 'অভিরাজসপ্তশতী' নামকরণের তাৎপর্য বিচার:

সাতটি শতের সমন্বয় হল সপ্তশতী। অর্থাৎ সপ্তশতী বলতে বোঝায় সাতটি শতককাব্যের সমন্বয়। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধের মূলগ্রন্থ *অভিরাজসপ্তশতীতে* ছয়টি শতককাব্য রয়েছে, যথা- *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* ও *সম্বোধনশতক*। এছাড়া একটি দণ্ডক রয়েছে, যথা- *ভারতদণ্ডক*। সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডকে নিবদ্ধ শতককাব্য পাওয়া যায় না। এবং এই দণ্ডকে একশত পরিমাণ শ্লোক বা পদ্যও নেই। তাই একে শতকের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরাও যায় না। অতএব কাব্যসংকলনটির *অভিরাজসপ্তশতী* নামকরণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

তবে বিগত ০৪.০২.২০২৪ তারিখে দূরভাষ-মাধ্যমে কবির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার হয়। এইপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, *ভারতদণ্ডক* কাব্যটি যেহেতু অনিয়তাক্ষর ছন্দে (দণ্ডক) লিখিত হয়েছে, তাই এর একেকটি পদ্যের অক্ষরসংখ্যা অনেক বেশি (প্রায় ২৫০টি)। এইরকম পদ্যের দ্বারা শতককাব্য রচিত হলে তার আয়তন অনেক বিস্তৃত হবে। তাই অক্ষরসংখ্যার ভিত্তিতে একে শতককাব্যের অন্তর্গত করা যেতে পারে। তবে কবির এই যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য, তা কাব্যসমালোচকগণের বিচার সাপেক্ষ বিষয়।

অন্ত্যটীকা

---

১. দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে
ছন্দোভিরচ্ছাদযন্যদেভিরাচ্ছাদযংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দোস্তম্। ছান্দোগ্যোপনিষদ ১. ৪. ২

২. নিরুক্ত ৭. ৩. ১২

৩. ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য.....। পাণিনীয় শিক্ষা ৪১

৪. ঋগ্বেদ-সংহিতা ১. ১৬৪ .২৩, ১০. ১৪. ১৬, ১০. ১৩০. ৪-৫
অথর্ববেদ ৮. ৯-১০
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১. ১ .৬
শতপথ ব্রাহ্মণ ২. ১. ৪. ১১
ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩. ১৬. ৩
বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৫. ১৪. ১
মুণ্ডকোপনিষদ ১. ১৫

৫. ঋগ্বেদ সর্বানুক্রমণী ২. ৬

৬. ছন্দোসূত্র ২. ১

৭. ছন্দোসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।
তমহং সংপ্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্॥ শ্রুতবোধ ১

৮. পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেত্॥
সমমর্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তত্ত্রিধা। ছন্দোমঞ্জরী ১. ৪-৫

৯. তদেব, ১. ৫-৬

১০. ম্যরস্তজভণগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ॥
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ। তদেব, ১. ৭-৯

১১. তদেব, ১. ১৯

১২. তদেব, ২. ৪৫

১৩. কাব্যে রসানুসারেণ বর্ণনানুগুণেন চ।
কুর্বীত সর্ববৃত্তানাং বিনিযোগং বিভাগবিত্॥ সুবৃত্ততিলক ৩. ৭

১৪. নানাবৃত্তবিশেষাস্তু কবেঃ শস্তস্য শাসনাত্।
যান্তি প্রভোরিবাত্যন্তমযোগ্যা অপি যোগ্যতাম্॥ তদেব, ৩. ১০

১৫. বৃত্তরত্নাবলী কামাদস্থানে বিনিবেশিতা।
কথযত্যজ্ঞতামেব মেখলেব গলে কৃতা॥ তদেব, ৩. ১৩

১৬. নব্যভারতশতক ১

১৭. ছন্দোমঞ্জরী ৫. ৪

১৮. পুরাণপ্রতিবিম্বেষু প্রসন্নোপাযবর্ত্মসু।
উপদেশপ্রধানেষু কুর্যাত্ সর্বেষ্বনুষ্টুভম্॥ সুবৃত্ততিলক ৩. ৯

১৯. মাতৃশতক ৩

২০. ছন্দোমঞ্জরী ২. ১১২

২১. বসন্ততিলকস্যাগ্রে সাকারো প্রথমাক্ষরে।
ওজসা জাযতে কান্তিঃ সবিকাসবিলাসিনী॥ সুবৃত্ততিলক ২. ২০

২২. বসন্ততিলকং ভাতি সংকরে বীররৌদ্রযোঃ। তদেব, ৩. ১৯

২৩. প্রভাতমঙ্গলশতক ৪৮

২৪. মাতৃশতক ৬

২৫. ছন্দোমঞ্জরী ২. ৭৪

২৬. প্রারম্ভে দ্রুতবিন্যাসং পর্যন্তেষু বিলম্বিতম্।
বিচ্ছিত্ত্যা সর্বপাদানাং ভাতি দ্রুতবিলম্বিতম্॥ সুবৃত্ততিলক ২. ১৮

২৭. প্রভাতমঙ্গলশতক ১০১

২৮. ছন্দোমঞ্জরী ২. ১৯৮

২৯. সাকারাদ্যক্ষরৈঃ পাদপর্যন্তৈঃ সবিসর্গকৈঃ।
শার্দূলক্রীড়িতং ধত্তে তেজোজীবিতমূর্জিতম্॥
বিসর্জনীযস্যোত্বেন পদৈর্নিস্নোন্নতৈরিব।
শার্দূলক্রীডিতং যাতি পাঠে সাযাসতামিব॥
বিচ্ছিন্নপাদং পূর্বার্ধে দ্বিতীযার্ধে সমাসবত্।
শার্দূলক্রীড়িতং ভাতি বিপরীতমতোঽধমম্॥ সুবৃত্ততিলক ২. ৩৫-৩৭

৩০. শৌর্যস্তবে নৃপাদীনাং শার্দূলক্রীড়িতং মতম্। তদেব, ৩. ২২

৩১. ছন্দোমঞ্জরী ২. ৪২

৩২. সম্বোধনশতক ১

৩৩. ছন্দোমঞ্জরী ২. ৪৩

৩৪. শ্রুতবোধ ২৩

৩৫. উপজাতিবিকল্পানাং সিদ্ধো যদ্যপি সংকরঃ।

তথাপি কুর্যাৎপূর্বপাদাক্ষরং লঘু॥ সুবৃত্ততিলক ২. ৬

৩৬. শৃঙ্গারালম্বনোদারনায়িকারূপবর্ণনম্।
বসন্তাদি তদঙ্গঞ্চ সচ্ছায়মুপজাতিভিঃ॥ তদেব, ৩. ১৭

৩৭. ছন্দোমঞ্জরী ২. ৬৬

৩৮. অসমস্তপদৈঃ পাদসন্ধিবিচ্ছেদসুন্দরম্।
সর্বপাদৈর্বিসর্গান্তৈর্বংশস্থং যাত্যনর্ঘতাম্॥ সুবৃত্ততিলক ২. ১৭

৩৯. সম্বোধনশতক ৩০

৪০. ছন্দোমঞ্জরী ২. ৬৯

৪১. সম্বোধনশতক ৪১

৪২. ছন্দোমঞ্জরী ২. ৭০

৪৩. দোধকতোটকনর্কুটযুক্তং মুক্তকমেব বিরাজতি সূক্তম্।
নির্বিষয়স্তু রসাদিষু তেষাং নির্নিয়মশ্চ সদা বিনিয়োগঃ॥ সুবৃত্ততিলক ৩. ২৩

৪৪. দ্রুততালললযৈরেব ব্যক্তং রুক্ষাক্ষরৈঃ পদৈঃ।
প্রনর্তযতি যচ্চিত্তং তত্তোটকমভীপ্সিতম্॥ তদেব, ২. ১৩

৪৫. সম্বোধনশতক ৮১

৪৬. ছন্দোমঞ্জরী ২. ১৩৪

৪৭. বিসর্গহীনপর্যন্তা মালিনী ন বিরাজতে।
চমরী ছিন্নপুচ্ছেব বল্লীবালূনপল্লবা॥
দ্বিতীযার্ধে সমস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং মালিনী বরা।
প্রথমার্ধে সমস্তাভ্যাং পাদাভ্যামবরা মতা॥
অজ্ঞোঽপ্যলক্ষ্যং মালিন্যাং বীণাযামিব বিশ্বরম্।
শ্রুত্বৈবোদ্বেগমাযাতি বাচা বক্তুং ন বেত্তি তম্॥ সুবৃত্ততিলক ২. ২২-২৪

৪৮. কুর্যাত্ সর্গস্য পর্যন্তে মালিনীং দ্রুততালবত্॥ তদেব, ৩. ১৯

৪৯. সম্বোধনশতক ৯৭

৫০. ছন্দোমঞ্জরী ২. ১৬৩

৫১. শ্রুতবোধ ৪০

৫২. শিখরিণ্যাঃ সমারোহাত্ সহজৈবোজসঃ স্থিতিঃ।
সৈব লুপ্তবিসর্গান্তৈঃ প্রযাত্যত্যন্তমুন্নতিম্॥
শিখরিণ্যাঃ পদৈশ্ছিন্নৈঃ স্বরূপং পরিহীযতে।
মুক্তালতাযা নিঃসূত্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈরিব॥ সুবৃত্ততিলক ২. ৩১-৩২

৫৩. যকারৈঃ কবীচ্ছানুরোধান্নিবদ্ধৈঃ প্রসিদ্ধো বিশুদ্ধোঽপরদণ্ডকঃ সিংহবিক্রীডনামা।
স্বেচ্ছযা রজৌ ক্রমেণ সন্নিবেশযত্যুদারধীঃ কবিঃ স দণ্ডকঃ স্মৃতো জযত্যশোকমঞ্জরী।
যত্র রেকান্ কবিঃ স্বেচ্ছযা পাঠসৌকর্য্যসাপেক্ষযা
রোপযত্যেষ ধীরৈঃ স্মৃতো দণ্ডকোমত্তমাতঙ্গলীলাকর।
নযুগলগুরুযুগেবং যকারাঃ কবীচ্ছানুরোধাত্ তদা যত্র
বক্ষ্যন্তে এষোঽপরোঃ দণ্ডকঃ পণ্ডিতৈরীরিতঃ সিংহবিক্রান্ত নামা। ছন্দোমঞ্জরী ২. ২৩৫-২৩৮

৫৪. যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্তরেফাস্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদ্দণ্ডকঃ॥
প্রতিচরণবিবৃদ্ধরেফাঃ স্যুরর্ণার্ণবব্যালজীমূতলীলাকরোদ্দামশঙ্খাদযঃ॥ বৃত্তরত্নাকর ৩. ১১২-১১৩

৫৫. আচার্য বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত বৃত্তরত্নাকর, পৃষ্ঠা ১৩২

৫৬. কাহিনী কাব্যগ্রন্থ, ভাষা ও ছন্দো, পৃষ্ঠা ২১

৫৭. কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি ১. ১. ২

৫৮. কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে। কাব্যাদর্শ ২. ১

৫৯. করণব্যুত্পত্ত্যা পুনরলংকারশব্দোঽযম্ উপমাদিষু বর্ততে। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ১. ২।

৬০. ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্। ভামহ-কাব্যালংকার ১. ১৩

৬১. অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারঃ মন্তব্যা কটকাদিবত্। ধ্বন্যালোক ২. ৬

৬২. তদেব, ২. ১৬

৬৩. তদেব, ২. ১৬ বৃত্তি, পৃষ্ঠা ২২২

৬৪. উপকুর্বন্তি তং সন্তং যেঽঙ্গদ্বারেণ জাতুচিত্।
হারাদিবদলংকারাস্তেঽনুপ্রাসোপমাদযঃ॥ কাব্যপ্রকাশ ৮. ৬৭
শব্দার্থযোরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশাযিনঃ।
রসাদীনুপকর্বন্তোঽলংকারাস্তেঽঙ্গাদিবত্॥ সাহিত্যদর্পণ ১০. ১

৬৫. অর্থালংকাররহিতা বিধবেব সরস্বতী। অগ্নিপুরাণ ৩৪৩. ১২

৬৬. তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি। কাব্যপ্রকাশ ১. ৪

৬৭. চন্দ্রালোক ৪১. ৮

৬৮. অলংকৃতিরলংকার্যমপোদ্ধব্য বিবেচ্যতে।
তদুপায়মযাতত্ত্বং সালংকারস্য কাব্যতা॥ বক্রোক্তিজীবিত ১. ৬

৬৯. ভামহ-কাব্যালংকার ১. ১৫

৭০. উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।
কাব্যস্যৈতে হ্যলংকারাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতা॥ নাট্যশাস্ত্র ১৬. ৪১

৭১. অনুপ্রাসঃ সযমকো রূপকং দীপকোপমে।
ইতি বাচামলংকারাঃ পঞ্চৈবান্যেরুদাহৃতাঃ।। ভামহ-কাব্যালংকার ২. ৪

৭২. মাতৃশতক ৯৬

৭৩. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৩

৭৪. রুদ্রট-কাব্যালংকার ২. ১৮

৭৫. স্বরমাত্রসাদৃশ্যং তু বৈচিত্র্যাভাবান্ন গণিতম্। সাহিত্যদর্পণ ১০. ৩

৭৬. ছেকো ব্যঞ্জনসংঘস্য সকৃত্ সাম্যমনেকধা। তত্রৈব

৭৭. অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥ সাহিত্যদর্পণ ১০. ৪

৭৮. উচ্চার্যত্বাদ্ যদেকত্র স্থানে তালুরদাদিকে।
সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনস্যৈব শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥ তদেব, ১০. ৫

৭৯. ব্যঞ্জনং চেদ্ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বেরণ তু।
আবর্ততেঽন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যনুপ্রাস এব তত্॥ তদেব, ১০. ৬

৮০. শব্দার্থযোঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ। লাটানুপ্রাস ইত্যক্তৌ॥ তদেব, ১০. ৭

৮১. প্রভাতমঙ্গলশতক ৬

৮২. তদেব, ১৩

৮৩. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৭০

৮৪. মাতৃশতক ৩৮

৮৫. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৩৭

৮৬. সম্বোধনশতক ৯০

৮৭. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৭৩

৮৮. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৮১-৮২

৮৯. সম্বোধনশতক ৯

৯০. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৯৪

৯১. প্রভাতমঙ্গলশতক ১৭

৯২. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৪২

৯৩. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৬৩

৯৪. প্রভাতমঙ্গলশতক ৪৫

৯৫. সাহিত্যদর্পণ ১০. ২৮

৯৬. তত্পরম্পরিতং সাঙ্গনিরঙ্গমিতি চ ত্রিধা। তত্রৈব

৯৭. যত্র কস্যচিদারোপঃ পরারোপস্য কারণম্।
তৎপরম্পরিতম্। সাহিত্যদর্পণ ১০. ২৯

৯৮. শ্লিষ্টাশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধনম্।
প্রত্যেকং কেবলং মালারূপং চেতি চতুর্বিধম্। তদেব, ১০. ৩০

৯৯. অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তত্। তত্রৈব

১০০. সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্তি চ। সাহিত্যদর্পণ ১০. ৩১

১০১. আরোপ্যাণামশেষাণাং শাব্দত্বে প্রথমং মতম্।
যত্র কস্যচিদার্থত্বমেকদেশবিবর্তি তত্। তদেব, ১০. ৩১-৩২

১০২. প্রভাতমঙ্গলশতক ২৫

১০৩. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৪৬

১০৪. যদ্যেত এবালংকারাঃ পরস্পরবিমিশ্রিতাঃ।
তদা পৃথগলংকারৌ সংসৃষ্টিঃ সংকরস্তথা॥ তদেব, ১০. ৯৭

১০৫. তদেব, ১০. ৯৮

১০৬. প্রভাতমঙ্গলশতক ৪০

১০৭. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৯২

১০৮. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৪৬

১০৯. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৫৯-৬০

১১০. অলংকারকৌস্তভ ৮.২৭৭

১১১. সম্বোধনশতক ২৯

১১২. সাহিত্যদর্পণ ১০. ১৭

১১৩. সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম ঔপম্যবাচি চ।
উপমেযঞ্চোপমানং ভবেদ্ বাচ্যম্।।
লুপ্তা সামান্যধর্মাদেরেকস্য যদি বা দ্বযোঃ
ত্রযাণাং বানুপাদানে।। তদেব, ১০. ১৮-২২

১১৪. শ্রৌতী যথেববাশব্দা ইবার্থো বা বতির্যদি।
আর্থী তুল্যসমানাদ্যাস্তুল্যার্থো যত্র বা বতিঃ॥ তদেব, ১০. ১৯

১১৫. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩২

১১৬. সাহিত্যদর্পণ ১০. ১০৮

১১৭. মাতৃশতক ২৮

১১৮. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৫৮

১১৯. নব্যভারতশতক ৭৪

১২০. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৬৩

১২১. তদেব, ১০. ৬৬

১২২. নব্যভারতশতক ৭৩

১২৩. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৮৯

১২৪. কাব্যাদর্শ ২. ৩৩৩

১২৫. নব্যভারতশতক ৬৯

১২৬. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৮১

১২৭. নব্যভারতশতক ৩০

১২৮. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৬৮

১২৯. সম্বোধনশতক ৭১

১৩০. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৬৬

১৩১. চতুর্থীশতক ৩২

১৩২. সাহিত্যদর্পণ ১০. ৮০

১৩৩. প্রভাতমঙ্গলশতক ২৩

১৩৪. সাহিত্যদর্পণ- ১০. ৪০

১৩৫. তদেব, ১০. ৯৭

১৩৬. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ৬

১৩৭. তদেব, ১. ২. ৭

১৩৮. তদেব, ১. ২. ৮

১৩৯. তত্রৈব, কামধেনু টীকা

১৪০. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ৬ কামধেনু টীকা

১৪১. সাহিত্যদর্পণ ৯. ১ ভাবপ্রকাশিকা টীকা।

১৪২. সা ত্রেধা বৈদর্ভী গৌড়ীযা পাঞ্চালী চেতি। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ৯

১৪৩. সাহিত্যদর্পণ ১. ২

১৪৪. ..... সা পুনঃ স্যাচ্চতুর্বিধা।
বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা॥ তদেব, ৯. ১

১৪৫. অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।
তত্র বৈদর্ভগৌড়ীযৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ॥ কাব্যাদর্শ ১. ৪০

১৪৬. অলঙ্কারবদগ্রাম্যমর্থ্যং ন্যায্যমনাকুলম্।
গৌডীযমপি সাধীযো বৈদর্ভমিতি নান্যাথা॥ ভামহ-কাব্যালংকার ১. ৩৫

১৪৭. গৌডীযমিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্।
গতানুগতিকন্যাযান্ননাখ্যেযমমেধসাম্॥ তদেব, ১. ৩২

১৪৮. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ১০

১৪৯. ধ্বন্যালোক ২. ৬

১৫০. তদেব, ২. ৭-১০

১৫১. কাব্যপ্রকাশ ৮. ৬৬

১৫২. রসস্যাঙ্গিত্বমাপ্তস্য ধর্মাঃ শৌর্যাদযো যথা গুণাঃ। সাহিত্যদর্পণ ৮. ১

১৫৩. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৩. ১. ১-২

১৫৪. সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ১. ৫৯

১৫৫. কাব্যপ্রকাশ, অষ্টম উল্লাস, পৃষ্ঠা ৪৭১

১৫৬. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৩. ১. ৪

১৫৭. মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদাখ্যাস্ত্রযস্তে ন পুনর্দশ। কাব্যপ্রকাশ ৮. ৮৯
মাধুর্যমোজ২থ প্রসাদ ইতি তে ত্রিধা। সাহিত্যদর্পণ ৮. ১

১৫৮. মাতৃশতক ৬

১৫৯. কাব্যাদর্শ ১. ৫১

১৬০. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৩. ১. ২১

১৬১. তদেব, ৩. ২. ১১

১৬২. সাহিত্যদর্পণ ৮. ২

১৬৩. মূর্দ্নি বর্গান্ত্যবর্ণেন যুক্তাষ্টঠডঢান্বিনা।
রণৌ লঘু চ তদ্ব্যক্তৌ বর্ণাঃ কারণতাং গতাঃ॥
আবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা মধুরা রচনা তথা। তদেব, ৮. ৩-৪

১৬৪. অভিরাজসপ্তশতী ২

১৬৫. প্রভাতমঙ্গলশতক ৬১

১৬৬. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৯৬

১৬৭. ভারতদণ্ডক ১

১৬৮. সম্বোধনশতক ২৭

১৬৯. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৩. ১. ৫

১৭০. তদেব, ৩. ২. ২

১৭১. কাব্যাদর্শ ১. ৮০

১৭২. রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃষ্ঠা ৮০

১৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫

১৭৪. কাব্যপ্রকাশ ৮. ৬৯

১৭৫. সাহিত্যদর্পণ ৮. ৪

১৭৬. তদেব, ৮. ৫-৭

১৭৭. নব্যভারতশতক ৭৬

১৭৮. প্রভাতমঙ্গলশতক ১৭

১৭৯. মাতৃশতক ২

১৮০. ভারতদণ্ডক ৪

১৮১. সম্বোধনশতক ৯৯

১৮২. কাব্যদর্শ ১. ৪৬

১৮৩. সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ১. ৬৬

১৮৪. কাব্যালংকাসূত্রবৃত্তি ৩. ১. ৬

১৮৫. তদেব, ৩. ২. ৩

১৮৬. চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ॥ সাহিত্যদর্পণ ৮. ৭-৮

১৮৭. নাট্যশাস্ত্র ১৬. ৯৯

১৮৮. গুণঃ সম্প্লবাত্। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৩. ১. ৭

১৮৯. তদেব, ৩. ১. ৯

১৯০. নব্যভারতশতক ৮০

১৯১. মাতৃশতক ২৪

১৯২. নব্যভারতশতক ১৮

১৯৩. সুভাষিতোদ্ধারশতক ২৩

১৯৪. সম্বোধনশতক ৭০

১৯৫. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ১১

১৯৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭

১৯৭. তত্র সমাসা নিঃশেষশ্লেষাদিগুণগুম্ফিতা।
বিপঞ্চীস্বরসৌভাগ্যা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ২. ২৯

১৯৮. সাহিত্যদর্পণ ৯. ২

১৯৯. নব্যভারতশতক ৮০

২০০. মাতৃশতক ৬

২০১. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ১২

২০২. সমস্তত্যুদ্ভটপদামোজঃ কান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌডীযেতি বিজানন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণা॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ২. ৩১

২০৩. সাহিত্যদর্পণ ৯. ৩

২০৪. প্রভাতমঙ্গলশতক ৩৪

২০৫. তদেব, ৪৬

২০৬. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ২. ১৩

২০৭. সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ২. ৩০

২০৮. সাহিত্যদর্পণ ৯. ৪

২০৯. মাতৃশতক ৪৪

২১০. সম্বোধনশতক ৮২

২১১. প্রভাতমঙ্গলশতক ৮৫

২১২. লাটী তু রীতির্বৈদর্ভীপাঞ্চাল্যোন্তরে স্থিতা। সাহিত্যদর্পণ ৯. ৫

২১৩. তত্রৈব, মূলের ব্যাখ্যা

২১৪. মাতৃশতক ৭৮

২১৫. প্রভাতমঙ্গলশতক ৮৬

২১৬. সম্বোধনশতক ৭৬

২১৭. অলংকারবদগ্রাম্যমর্থ্যং ন্যায্যমনাকুলম্।
গৌডীযমপি সাধীযো বৈদর্ভীমিতি নান্যথা॥ ভামহ-কাব্যালংকার ১. ৩৫

২১৮. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *কাব্যবিচার*, পৃষ্ঠা ৫৭

২১৯. সুরেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৭

২২০. ঋগ্বেদ-সংহিতা ৯. ৬৭. ৩২

২২১. লক্ষ্মীরিব বিনা ত্যাগান্ন বাণী ভাতি নীরসা। অগ্নিপুরাণ ১৭৬. ৯

২২২. রুদ্রট কাব্যালংকার ১২. ১-২

২২৩. রসভাবতদাভাসভাবশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঽঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ॥ ধ্বন্যালোক ২. ৩

২২৪. তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবত্॥ তদেব, ২. ৬

২২৫. দশরূপক ৪. ৮৫

২২৬. নিরন্তররসোদ্গারগর্ভসন্দর্ভনির্ভরাঃ।
গিরঃ কবীনাং জীবন্তি ন কথামাত্রমাশ্রিতা॥ বক্রোক্তিজীবিত ৪. ১২

২২৭. চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্য তদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশ্চমৎকারো বিতন্যতে॥ তদেব, ১. ৫

২২৮. নির্দোষং গুণবত্ কাব্যমলংকারৈরলংকৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ১. ২।

২২৯. বক্রোক্তিশ্চ রসোক্তিশ্চ স্বভাবোক্তিশ্চ বাংময়ম্।
সর্বাসু গ্রাহিণীং তাসু রসোক্তি প্রতিজানতে॥ তদেব, ৫. ৮

২৩০. সুরেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৭

২৩১. নাট্যশাস্ত্র ৬. ৩২-৩৩

২৩২. সাহিত্যদর্পণ ৩. ২-৩

২৩৩. তত্রৈব

২৩৪. পানকরসন্যায়েন চর্ব্যমানঃ পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদযমিতি প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীনমিবালিঙ্গন্ অন্যত্ সর্বমিব তিরোদধত্ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবযন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ। কাব্যপ্রকাশ ৪র্থ উল্লাস, পৃষ্ঠা ৯৩

২৩৫. সুরেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৭

২৩৬. নাট্যশাস্ত্র ৬. ৩৬

২৩৭. বিভাবেনাহৃতো যোঽর্থো হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনযৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ তদেব, ৭. ১

২৩৮. সুরেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৮

২৩৯. নাট্যশাস্ত্র ৬. ৩৮

২৪০. তদেব, ৭. ৮

২৪১. রসগঙ্গাধর, ১ম আনন

২৪২. নাট্যশাস্ত্র ৬. ১৭

২৪৩. বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্যাযাঃ। নাট্যশাস্ত্র ৭ম অধ্যায়

২৪৪. নাট্যশাস্ত্র ৭. ৪

২৪৫. রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যযোঃ। সাহিত্যদর্পণ ৩. ২৯

২৪৬. আলম্বনং নাযিকাদিস্তমালোম্ব্য রসোদ্গমাত্। তত্রৈব

২৪৭. উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপযন্তি যে। সাহিত্যদর্পণ ৩. ১৩১

২৪৮. অনুভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয় ইতি। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫৪

২৪৯. সাহিত্যদর্পণ ৩. ১৩২

২৫০. দশরূপক ৪. ৩

২৫১. তদেব, ৪. ৭

২৫২. নাট্যশাস্ত্র ৬. ১৮-২১

২৫৩. তদেব, ৬. ২২

২৫৪. ধ্বন্যালোক ১. ৬

২৫৫. ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত, পৃষ্ঠা ২২

২৫৬. শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভযানকাঃ।
বীভত্সাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ নাট্যশাস্ত্র ৬. ১৫

২৫৭. শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাচ্চ করুণো রসঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোত্পত্তির্বীভৎসাচ্চ ভযানকঃ॥ তদেব, ৬. ৩৯

২৫৮. নির্বেদস্থাযিভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ। কাব্যপ্রকাশ ৪. ৩৫
শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রোবীরোঽদ্ভুতস্তথা।
হাস্যো ভযানকশ্চৈব বীভত্সশ্চেতি তে নব॥ রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃষ্ঠা ৩৫

২৫৯. স্ফুটং চমত্কারিতযা বত্সলং চ রসং বিদুঃ। সাহিত্যদর্পণ ৩. ২৫১

২৬০. শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবত্।
মাধুর্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ॥ ধ্বন্যালোক ২. ৮

২৬১. সম্ভোগশৃঙ্গারাত্ মধুরতরঃ বিপ্রলম্ভঃ, ততঃ অপি মধুরতমঃ করুণঃ। তত্রৈব

২৬২. উত্তররামচরিত ৩. ৪৭

২৬৩. রবিশংকর নাগর সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড) পৃষ্ঠা ২৬৬

২৬৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭০

২৬৫. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৭৩

২৬৬. তদেব, ৩৪

২৬৭. সাহিত্যদর্পণ ৩. ২১৪-২১৬

২৬৮. নাট্যশাস্ত্র ৬. ৪৯-৫০

২৬৯. মনুসংহিতা ৪. ১৫৯

২৭০. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩৫

২৭১. তদেব, ৪৪

২৭২. নব্যভারতশতক ১৬-১৭

২৭৩. সাহিত্যদর্পণ ৩. ২২২-২২৫

২৭৪. নব্যভারতশতক ৫৯, ৬৭, ৭১

২৭৫. তদেব, ৪-৮

২৭৬. প্রভাতমঙ্গলশতক ৪৬-৪৮

২৭৭. সাহিত্যদর্পণ ৩. ২৩২-২৩৩

২৭৮. স চ দানধর্মযুদ্ধৈর্দযযা চ সমন্বিতশ্চতুর্ধা স্যাত্॥ তদেব, ৩. ২৩৪

২৭৯. তদেব, ৩. ২৪২-২৪৫

২৮০. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৯

২৮১. নাট্যশাস্ত্র ৬. ৭৫

২৮২. নব্যভারতশতক ৮৭-৮৯

২৮৩. প্রভাতমঙ্গলশতক ২৫

২৮৪. সুভাষিতোদ্ধারশতক ২৭

২৮৫. তদেব, ৪৬

২৮৬. চতুর্থীশতক ৪০

২৮৬. সাহিত্যদর্পণ ৩. ২৪৫-২৪৯

২৮৭. নব্যভারতশতক ৯৯-১০১

২৮৮. মাতৃশতক ৯

২৮৯. ভারতদণ্ডক ৫

২৯০. সম্বোধনশতক ২২, ২৪

২৯১. ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০. ১৭৪. ৪

২৯২. কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ। ধ্বন্যালোক ১. ২

২৯৩. তদেব, ১. ১১

২৯৪. আলোকার্থী যথা দীপশিখাযাং যত্নবাঞ্জনঃ।
তদুপাযতযা তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥ তদেব,, প্রথম উদ্যোত, কারিকা ৯

২৯৫. তদেব, ১. ১৩

২৯৬. তদেব, প্রথম উদ্যোত, কারিকা ২

২৯৭. তদেব, দ্বিতীয় উদ্যোত, কারিকা ৬

২৯৮. বক্রোক্তিজীবিত ১. ৭

২৯৯. উভাবেতাবলংকার্যৌ তযোঃ পুনরলংকৃতিঃ।

বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে॥ তদেব, ১. ১০

৩০০. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩৪

৩০১. অস্তি ধ্বনিঃ। স চাসাববিবক্ষিতবাচ্যঃ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ।ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত, পৃষ্ঠা ১৩৬

৩০২. কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস, পৃষ্ঠা ৮৪

৩০৩. রসভাবতদাভাসতৎপ্রশান্ত্যদিক্রমঃ।

ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিত॥ ধ্বন্যালোক, দ্বিতীয় উদ্যোত, কারিকা ৩

৩০৪. সম্বোধনশতক ৪৯

৩০৫. ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত, পৃষ্ঠা ৫২

৩০৬. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩০

৩০৭. সম্বোধনশতক ৪৫

৩০৮. তদেব, ২৯

৩০৯. প্রভাতমঙ্গলশতক ৪৬

৩১০. ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত, পৃষ্ঠা ৭৮

৩১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩

৩১২. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৬৭

৩১৩. অর্থান্তরে সংক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্।

অবিবক্ষিতবাচ্যস্য ধ্বনের্বাচ্যং দ্বিধা মতম্॥ ধ্বন্যালোক, দ্বিতীয় উদ্যোত, কারিকা ১

৩১৪. চতুর্থীশতক ৮৮

৩১৫. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৬০

৩১৬. ধ্বন্যালোক, চতুর্থ উদ্যোত, কারিকা ৪

পঞ্চম অধ্যায়

অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার

সাহিত্য সমাজের কথা বলে। মানুষের কথা বলে। যেকোনো সময়ের কাব্যে সমকালীন সমাজের প্রভাব থাকে। মানুষের চিন্তা, চেতনা, জীবনবোধ, ভাবাবেগ সমস্ত কিছুর গভীর অধ্যয়ন করতে হয় একজন কবিকে

সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। লোককথা, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস, কল্পিত কাহিনী প্রভৃতি থেকে সাহিত্যিক উপাদান গৃহীত হলেও সাহিত্যে সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়। মহাকবি কালিদাস *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকে দুষ্যন্তের চরিত্রকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে চিত্রায়িত করেছেন। *মহাভারতের* দুষ্যন্ত একজন হঠকামুক, প্রতারক রাজা ছিলেন। যিনি শকুন্তলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে পরবর্তীকালে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। মহাকবি কালিদাস জানতেন, যে রাজার চারিত্রিক সততা নেই, যে প্রতারক প্রেমিক, তার প্রণয়গাথা চিরস্মরণীয় হতে পারে না। তাই কবি কালিদাস মহর্ষি দুর্বাসা প্রদত্ত শাপ ও স্মারকরূপে অঙ্গুরীয়কের সংযোজন করেন। ফলে দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সামান্য কাহিনী অসামান্য বিশিষ্টতায় উপনীত হয়েছে। একইভাবে ভর্তৃহরির *উত্তররামচরিত* কিংবা ভাসের *রামায়ণ* ও *মহাভারত* আশ্রিত রূপকগুলিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে। তাই মহাকবি ভাস তাঁর *কর্ণভার* রূপকে সূতপুত্র কর্ণকে একজন দানবীর নায়করূপে তুলে ধরেছেন।

কবি কখনও সমাজ থেকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন, কখনও নিজ ক্রান্তদর্শী চেতনার দ্বারা সংকটময় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখান। মানুষের সামাজিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক চেতনার প্রসার ঘটান। তবে সাহিত্য মানুষকে সরাসরি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে না। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে এটি কাব্যের ধর্মও নয়। কাব্য কেবল মানুষকে ভাল-মন্দের উপদেশ দেবে কিন্তু রসই থাকবে কাব্যের মূলভূত বিষয়। অর্থাৎ কাব্যে ব্যবস্থিত সমস্তকিছুই রসের পরিপোষক হবে। তাই মম্মট কাব্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেছেন- *শব্দার্থযোর্গুণভাবেন রসাঙ্গভূতব্যাপারপ্রবণতযা বিলক্ষণং যত্কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণকবিকর্ম তত্কান্তেব সরসতাপাদনেনাভিমুখীকৃত্য রামাদিবদ্বর্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যুপদেশং চ যথাযোগং কবেঃ সহৃদযস্য চ করোতীতি সর্বথা তত্র যতনীযম্*।[১] তাই সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এখানে সততার প্রতিষ্ঠা করতে অসৎকেও তুলে ধরা হয়। মানুষ যেমন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে

নিজের অবয়ব পর্যবেক্ষণ করে স্থানে স্থানে অসৌন্দর্যকে দূর করে সুচারুরূপে নিজেকে সজ্জিত করে। সাহিত্যও একইভাবে সমাজের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ত্রুটি বিচ্যুতি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি প্রভৃতি তুলে ধরে মানুষকে আলোর পথে উত্তরণে উৎসারিত করে।

রাজনীতি, পারস্পরিক মূল্যবোধ, শিক্ষা, স্বদেশ প্রেম, সৌভ্রাতৃত্ববোধ এই সমস্তকিছু নিয়ে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। রাজনীতি গণতান্ত্রিক পরিসরে জনমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পারস্পরিক মূল্যবোধ ছোট ছোট বসতি অঞ্চল থেকে শুরু করে বিশাল দেশের সকল মানুষের পরস্পরের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধাকে টিকিয়ে রাখে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে বোধের জন্ম দেয়, ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শেখায়।

আধুনিক সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে অন্যতম কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের গদ্য, পদ্য তথা নাট্যের বিষয়বস্তুতে বার বার উঠে এসেছে সমাজের কথা, মানুষের কথা। মানুষের পরশ্রীকাতরতা, শঠতা, নীচতা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির সোচ্চার প্রতিবাদ দেখা যায় তাঁর বিবিধ কাব্যে। বর্তমান সংস্কৃত সাহিত্যে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলি অনেক জীবন্ত হয়ে উঠছে। *অভিরাজসপ্তশতীতেও* এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

বর্তমান সময়ে রাজনীতি একটি বহুল চর্চার বিষয়। রাজনীতির দূষণ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুষ, স্বজন পোষণ, ব্যক্তিস্বার্থের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রও কলুষিত হচ্ছে। তাই প্রাচীন কালের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজেন্দ্র মিশ্র এইপ্রসঙ্গে বলেছেন- আজকাল গুরুরা যেহেতু বাচাল, তাই তাদের আদেশ পালনের পূর্বে শিষ্যদেরও বিবেচনা করা উচিত।[২] অর্থাৎ যেখানে আচার্যগণ বিচার-বিবেচনা না করে শিষ্যকে আদেশ দেন, সেখানে শিষ্যদেরও সেই আদেশের গুরুত্ব বিচার করতে হবে। তারপর তা পালন করতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মকে কেন্দ্র করে কবি কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন- গুরু কে? যিনি পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাস করেন। শিষ্য কে? যে গুরুদেবকে বিনামূল্যে বিবিধ দ্রব্য দান করে।[৩] অর্থাৎ এখানে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রির কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে নিয়োগ-দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা। যার ফলে বিভিন্ন কর্মস্থলে যোগ্য প্রার্থীর স্থানে অযোগ্য প্রার্থী অনায়াসে চাকরি লাভ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুর্নীতি প্রসঙ্গে কবি বলেছেন- যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত, তারা সবাই জ্ঞানী (কে বা জ্ঞানী নয়)। কারণ মহান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাথরও দেবত্ব লাভ করে।[৪]

অভিরাজসপ্তশতী শতক সংগ্রহের অধিকাংশ শতকে রাজনীতি তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হয়েছে। *নব্যভারতশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* এবং *সম্বোধনশতকে* রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার বলে অন্যায় সাধন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। *নব্যভারতশতকে* বলা হয়েছে, নির্বাচনে আসন লাভের জন্য নেতারা শঠতার পথ অবলম্বন করছে। তারা স্বদেশকে বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। শুভ্রবস্ত্র ধারণকারী নেতারাই দেশদ্রোহীদের পোষণ করে থাকে। বর্তমানে সকল নেতা সাম্যবাদের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা কেউই সাম্যবাদ চায় না। শুধু নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুর তোষণ করে থাকে। যেখানেই স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ, সেখানেই এদের দেখা মেলে। এরা প্রয়োজনে দল পরিবর্তনে সিদ্ধহস্ত। মিথ্যাভিনয়, উৎকোচ, লাম্পট্য প্রভৃতির দ্বারা তারা সাধারণ মানুষের মত লাভ করে থাকে।[৫] অন্যদিকে অভিনেতা, জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তিরা এই স্বার্থসর্বস্ব নেতাদের অনুসরণ করে থাকে। কবি আরও বলেছেন-

মিথ্যাভিনয়কর্মাণো মিথ্যাপ্রণযদর্শিনঃ

বর্তমানসমাজস্যাভিনেতারো বিধাযকাঃ॥[৬]

অর্থাৎ মিথ্যা অভিনয়ে দক্ষ, মিথ্যায় পারদর্শী বিধায়করা বর্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

রাজেন্দ্র মিশ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশাসনের প্রাচীন নীতিসমূহের প্রশংসা করেছেন। কবির মতে একটি রাষ্ট্র সৈন্যের দ্বারা বা নেতৃমণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা।[৭] প্রাচীন ভারতীয় মহান রাজন্যবর্গ ও তাঁদের রাজ্যশাসন পদ্ধতি সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে অনুসরণীয় হয়েছে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চাণক্যের কূটনীতির দ্বারা মৌর্য সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছে। একইভাবে বৎসরাজ তাঁর হিতৈষী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সহযোগিতায় কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ছত্রপতি শিবাজী শিখ-শক্তির পুনরুত্থানের জন্য তাঁর গুরু রামদাসের শরণাপন্ন হয়েছেন। যুগে যুগে সরস্বতীর বরপুত্র সিদ্ধপুরুষগণ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজেন্দ্র মিশ্রের মতে বর্তমান যান্ত্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব নীতিবিদদের মিথ্যা সম্মান, ধনসম্পদ কিছুই কল্পকাল থাকবে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত পার্থিব কীর্তিও বিলীন হয়ে যাবে।[৮] মৌর্য, গুপ্ত, হর্ষ তথা ভোজরাজাদের কাল গত হয়েছে। তথাপি বর্তমান কালেও একটি আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনব্যাবস্থা জানতে হলে *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়* প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়-

মৌর্যা গতা গতা গুপ্তা হর্ষভোজযুগং গতম্।

ভগবদ্গীতযাঽদ্যাপি রাষ্ট্রং কিন্তু বিভাব্যতে॥[৯]

বর্তমান রাজনীতিতে রূপ-সৌন্দর্যেরও মাহাত্ম্য রয়েছে। চিত্রতারকারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। বিদ্যা, বংশ ইত্যাদির মর্যাদা না থাকলেও একজন ব্যক্তি রাজনীতির বলে যদি বিধায়ক বা বিশেষ পদাধিকারী হয়, তাহলে তার সমস্ত দোষ গুণে পরিণত হয়ে যায়।[১০] *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উক্ত দুটি শ্লোক-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥[১১]

এই শ্লোকদুটির অনুকরণে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র নির্বাচনে নির্বাচিত নেতৃমণ্ডলের চারিত্রিক দোষের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন-

পরিত্রাণায় দস্যূনাং বিনাশায় চ সৎকৃতাম্।

পাপসংবর্ধনার্থায় নেতা জাতো যুগে যুগে॥

যদা যদা হ্যধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতে।

অভ্যুত্থানং চ ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ॥[১২]

কবি আরও বলেছেন- যে ব্যক্তির ব্যবসায় বা অধ্যয়নে সাফল্য আসে না, যার অন্যান্য কোনো বিদ্যায় উদ্যম নেই, তারও সন্তাপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ রাজনীতিতে তাদের জন্য নিশ্চিত সুবিধা রয়েছে। যদি বিমানযাত্রা প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের বাঞ্ছা থাকে, যদি এই পৃথিবী শাসন করার ইচ্ছা থাকে, তবে সহজ সরল পথ ত্যাগ করে রাজনীতির কুটিল পথ গ্রহণ করতে হবে।[১৩]

বর্তমান সময়ে অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে উৎকোচ বা ঘুষ একটি বড় সমস্যা। বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই উৎকোচ বেশ দস্তুর। চাকরিক্ষেত্রে উৎকোচের মাধ্যমে অনেক যোগ্য ব্যক্তির স্থানে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়। ফলে একদিকে যেমন যোগ্য ব্যক্তিরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে, অন্যদিকে অযোগ্য ব্যক্তির কর্মকুশলতার অভাবে যথাযথ কর্ম

সাধিত হয় না। যার প্রভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন নির্মাণশিল্প প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের মূল গ্রন্থ *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত *নব্যভারতশতক* ও *সুভাষিতোদ্ধারশতকে* কবি উৎকোচ, তোষণ প্রভৃতির নিন্দা করেছেন।

নব্যভারতশতকে কবি বলেছেন সত্য আজ প্রতিষ্ঠা (গুরুত্ব) পায় না। কর্মের দ্বারা যথাযোগ্য সাফল্য লাভ হয় না। উপরন্তু কেবল উৎকোচ ও উমেদারির দ্বারা সমস্ত রকম কার্য সম্পাদন করা সম্ভব। এই সমাজে পরিশ্রমীরা ক্ষুধার্ত। যারা ঘুষ দেয়, তারা প্রভূত বিভবাদি লাভ করে। সত্যবাদিরা আজ দিগভ্রান্ত। সাফল্য লাভ করছে ধূর্তরা।[১৪] কবি বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে ঘুষের প্রশংসা করেছেন-

দানে তপসি শৌর্যে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ

উৎকোচগ্রহণে তস্য মন্যে সুনিশ্চিতোন্নতিঃ॥[১৫]

অর্থাৎ দান, তপস্যা বা শৌর্যপ্রভৃতির দ্বারা যাদের যশ প্রতিষ্ঠা পায় না, ঘুষের দ্বারা তার উন্নতি সুনিশ্চিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তর্গত অন্য আর একটি শ্লোক-

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাত্ কুরুতেঽর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাত্ কুরুতে তথা॥[১৬]

অর্থাৎ হে অর্জুন! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক কাঠকে ভস্মীভূত করে, সেইরকম জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে (কর্মের হেতুকে) নাশ করে। এই শ্লোকের অনুকরণে কবি বলেছেন-

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাত্ কুরুতেঽর্জুন।

উৎকোচোঽপি তথাঽনল্পোঽসাফল্যং হন্তি নিশ্চিতম্॥[১৭]

অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন শুকনো কাঠকে ভস্মীভূত করে, সেরকম উৎকোচও মানুষের সবরকম অসাফল্যের বিনাশ করে। অর্থাৎ ঘুষের দ্বারা সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা সম্ভব।

হিতোপদেশে উক্ত *নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিত্ ক্রিয়া ফলবতী ভবেত্*[১৮] ইত্যাদি শ্লোকটিকে কবি এইভাবে বলেছেন-

নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিত্ ক্রিযা ফলবতী ভবেত্।

তস্মাদ্ দ্রব্যং পুরস্কৃত্য বিজ্ঞঃ কার্যাণি সাধযেত্॥[১৯]

দ্রব্য ব্যতীত কোনো কার্য সম্পন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞজন দ্রব্যাদি পুরস্কারের দ্বারা নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করবে। এক্ষেত্রে দ্রব্য বলতে ভেট বোঝাচ্ছে। বিভিন্ন দ্রব্য ভেট দিয়ে, তোষামোদ করে সমস্তরকম অন্যায় কার্যসিদ্ধ হয়ে থাকে।

দেশের শিক্ষিত সমাজ, উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিরা যখন অসৎ পথে বিচরণ করে, তখন সর্বসাধারণের দৃষ্টিকোণও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞজন অসাধু পথ অবলম্বন করলে সাধারণ মানুষের মনে অন্যায় কাজের প্রতি আসক্তি বাড়ে। কারণ সমাজের অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মানুষ জ্ঞানী মানুষদের জীবনচর্যাকে তাদের জীবনদর্শন হিসেবে ধরে নেয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তাই মানুষকে শিখিয়েছে বিদ্বানের সমাদর করতে। বন্ধুপ্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যক্তির চেয়েও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্মান করতে হবে। তাই মনু বলেছেন-

বিত্তং বন্ধুর্বযঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।

এতানি মান্যস্থানানি গরীযো যদ্ যদুত্তরম্॥[২০]

অর্থাৎ বিত্তবান ব্যক্তি, বন্ধুস্থানীয়, বয়োজ্যেষ্ঠ, ব্যক্তির পেশা এবং বিদ্যা- এই পাঁচের মধ্যে পূর্বের পূর্বের ব্যক্তির চেয়ে পরের ব্যক্তি অধিক সম্মাননীয়। অতএব জ্ঞানীর সমাদর সর্বাপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানকালে জ্ঞানীরা আর সম্মানিত হন না। যেহেতু মানুষের জ্ঞানাহরণের ইচ্ছা প্রশমিত হচ্ছে, তাই বিদ্বানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতিও প্রশমিত হচ্ছে। অন্যদিকে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত জ্ঞানীরা আজ অনাদৃত। সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিরাই বিচরণ করছে। রাজেন্দ্র মিশ্র *অভিরাজসপ্তশতীর* একাধিক শতককাব্যে এইপ্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। *নব্যভারতশতকে* কবি বলেছেন-

অদ্য নাদ্রিযতে জ্ঞানী কলাবান্ ন চ পণ্ডিতঃ।

কলহংসা ন পূজ্যন্তে বকপূজৈব বর্ততে॥[২১]

অর্থাৎ বর্তমানে প্রকৃত জ্ঞানীরা সমাদৃত হন না। পণ্ডিতদের মধ্যেও আর পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা নেই। এখন রাজহংস পূজিত হয় না। সর্বত্র বক পূজিত হয়। বস্তুত কবি বিদ্যাহীন পণ্ডিত ও তাদের প্রশস্তিকারী সাধারণ মানুষ- এই উভয়েরই সমালোচনা করেছেন।

কোথাও বিদ্বানের সমাদর নেই। কেউ প্রশংসাও করে না। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিদ্বানেরা আর সমাহুত হন না। তার চেয়ে বকের মতো নির্গুণ উচ্চবিত্তরাই সর্বত্র সমাদৃত হয়। বিভিন্ন সভা, সম্মেলন, বিপণী প্রভৃতিতে এদেরই সম্মান বেশি।[২২] শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাচীনস্থল ভারতবর্ষে শাস্ত্রের সম্ভার অতুলনীয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞানাহরণের সদিচ্ছা নেই। উপরন্তু পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিরা শাস্ত্রাধ্যয়ন না করেই নিজেদেরকে পণ্ডিত বলে ঘোষণা করে। কবি *চতুর্থীশতকে* তাই বলেছেন-

তর্কভাষামহিম্নাঽপি কুতর্কৈরেব ভাষতে।

তর্কাভাসায শপ্তায পণ্ডিতায নমো নমঃ॥[২৩]

কালনেমী যেমন তপস্বীর বেশধারণ করে রামচন্দ্রকে ছলনা করেছেন, তেমনই পণ্ডিতের ভেকধারী ব্যক্তিরা সমাজের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের জ্ঞান পলাশ পুষ্পের মতোই গন্ধহীন। অর্থাৎ পলাশ পুষ্প যেমন শুধু নয়নলোভনীয়, তার কোনো সুবাস থাকে না, তেমনই এখনকার পণ্ডিতদের বাহ্যিক চাকচিক্যই রয়েছে। তাদের জ্ঞানের সুবাস সমাজকে আমোদিত করতে পারে না। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাদের অভ্যুদয়কে ডুমুর ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন-

কদাপি ন শ্রুতং দৃষ্টং যস্য পাণ্ডিত্যবৈভবম্।

উদুম্বরপ্রসূনায নবীনায নমো নমঃ॥[২৪]

অর্থাৎ যার পাণ্ডিত্যের কথা কেউ কখনও শোনেনি বা দেখেনি, সেই ডুমুর ফুল-সদৃশ নবীন কবিকে নমস্কার করি।

যেকোনো সভ্যতায় সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে নৈতিক অধঃপতন। কর্তব্য কর্মের বিচার, জীবনচর্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক চেতনা- এই সমস্তকিছু মানুষের নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়। নীতিগত আদর্শের দ্বারা মানুষের দৃষ্টিকোণ পরিমার্জিত হয়। ফলে তার জীবনচর্যায় সততা আসে। তাই সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের নৈতিক আদর্শ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সাম্প্রতিককালে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। *নব্যভারতশতকে* তিনি বলেছেন বর্তমান যুবসমাজের মধ্যে পৌরুষ নেই, (কর্মে) পটুতা, মনীষা, মাধুর্য, ব্যক্তিত্ব, বৈভব নেই। এরা তৃণের মতো কেবল মিথ্যে জীবনধারণ করে। রাষ্ট্রের কীর্তি বিনাশ করে।[২৫] প্রাচীন শাস্ত্রের বাণী বর্তমান মানুষের কাছে যুগের অনুপযোগী মনে হয়। বস্তুত তারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রোপদেশ পরিহার করে। তাদের পুরাণাদির প্রতি আস্থা নেই,

সদুপদেশ পালনের ইচ্ছা নেই, বৈদিক মন্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধা নেই, জ্ঞানীর সান্নিধ্য লাভে প্রযত্ন নেই।[২৬] কবি বলেছেন-

নিত্যদানী নৃশংসোঽদ্য স্মিতপ্রাণো হি বঞ্চকঃ।

মাযাবী মৃদুভাষী স্যাত্কুটিলো বিনযপারগঃ॥[২৭]

অর্থাৎ যারা সুযোগ পেলেই অন্যের ধন হরণ করে, আজ তারা মহান দাতা। বঞ্চকদের মুখমণ্ডলে স্মিতহাস্য। যারা মায়াবী, আজ তারা স্বল্পভাষী, যারা স্বভাবতই কুটিল, তারাই এখন বিনয়ী। অর্থাৎ এখন মানুষের বাহ্য অবয়ব দেখে স্বভাবের অনুমান করা যায় না। তারা অন্তরের কুটিলতা, অসততা, দুরভিসন্ধি প্রভৃতিকে বাইরের আপাত মার্জিত চেহারার দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে। তাই মানুষ তাদের প্রকৃত চেহারা বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়েছে-

যচ্চেতসি ন তদ্বাণ্যাং যদ্বাণ্যাং তন্ন কর্মণি।

যত্কর্মণি ন তদ্বাণীমনসোর্বিদ্যতে ধ্রুবম্॥[২৮]

অর্থাৎ যা তাদের মনে থাকে, তা বক্তব্যের দ্বারা প্রকটিত হয় না। যা বক্তব্যে প্রকাশিত হয়, তা কর্মের দ্বারা প্রতীত হয় না। আর যা কর্মে থাকে, তা মন ও বাক্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মানুষ নিষ্কামরূপে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা, প্রযত্নাদি ধর্মসম্মত নয়। তারা ধর্মের পথে অর্থোপার্জন করে না। সন্ন্যাসত্বগুণ এখন আকাশকুসুমের মতোই অলীক মনে হয়। মানুষের জীবন নরকে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র মিথ্যার বাতাবরণ। কদাচিত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সত্যের প্রতি মানুষের অভিরুচি নেই। প্রেমে নিষ্ঠা নেই। মনোবৃত্তিতে সারল্য, দাক্ষিণ্য নেই।[২৯] বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন-

স্বাধ্যায়ে ন শ্রমস্তেষাং ন যত্নো লোকমঙ্গলে।

পরোপকারে ন প্রীতিঃ সাহায্যং ন চ সংকটে॥[৩০]

অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অধ্যবসায় নেই, সমাজহিতকর কর্ম, পরোপকার, প্রীতি ও সংকটময় পরিস্থিতিতে সহায়তার প্রবৃত্তি নেই।

কবির মতে ধূর্ত, বঞ্চক, কৃপণ, শঠ, লোভী ব্যক্তিরা কলিযুগে কেবল জীবিতমাত্র জীবনধারণ করে থাকে। এদের জীবনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র ব্যঙ্গাত্মক

ভঙ্গীতে বার বার নীতিহীন সমাজকে তিরস্কার করেছেন। যে দোষগুলির দ্বারা সমাজের ক্ষতি সাধিত হয়, সেগুলি থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। রাজেন্দ্র মিশ্র এমন একটি সমাজ চেয়েছেন, যেখানে অন্যের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার থাকবে। যেখানে উদ্যমী, সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, জ্ঞানপিপাসু যুবসমাজের অভ্যুদয় ঘটবে।

ভারতীয় মানুষের মনে আত্মদৈন্য এক প্রবল সমস্যা। বর্তমান সময়ে অশিক্ষিত, শিক্ষিত সকলের মনেই বদ্ধমূল ধারণা যে, পাশ্চাত্যের সমস্তকিছুই উৎকৃষ্ট। আর প্রাচ্যের শিক্ষা, রুচি, জীবনবোধ, সংস্কৃতি সমস্তকিছুই সেকেলে, কুসংস্কার। তাই তারা ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির সমাদর করে না।

যে বাল্মীকীয় *রামায়ণ* তথা তুলসীদাস প্রণীত *রামচরিতমানস* বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায় পঠিত হয়, সেই *রামায়ণ* আমাদের দেশে আজ সমাদৃত হয় না। ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত *অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* প্রভৃতি রাষ্ট্র-পরিচালনার নীতি নির্ধারণে অদ্যাবধি প্রাসঙ্গিকতা বহন করে চলেছে। কিন্তু দেশীয় রাজনীতিতে এগুলির প্রয়োগ দেখা যায় না। বর্তমানের নিরিখে এই শাস্ত্রগুলির কিছু অপ্রাসঙ্গিকতার জন্য সমগ্র শাস্ত্রকে বর্জন করা হচ্ছে।

বিশ্বজনীন প্রেম, বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বের পূণ্যতীর্থ ভারতভূমি। ভারতের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য জনমানসে বিভেদের সৃষ্টি করেনি। বরং ভারতই বিশ্বকে শিখিয়েছে-

অযং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥[৩১]

কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের সর্বত্র বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা কবিকে ব্যথিত করেছে। কবি বলেছেন-

জগদ্বিভক্তং রাষ্ট্রেষু রাষ্ট্রং প্রান্তেষু খণ্ডিতম্।
প্রান্তো জনপদেষ্বর্ধস্তদপি গ্রামবিস্তৃতম্॥
বর্গভিন্না ইমে গ্রামা মুণ্ডভিন্নাশ্চ মানবাঃ।
সর্বত্রৈব বিভাগোঽস্তি ক্বাপি নৈবাস্তি সংহতিঃ॥[৩২]

অর্থাৎ পৃথিবী রাষ্ট্রের দ্বারা, রাষ্ট্র প্রদেশের দ্বারা, প্রদেশ জনপদের দ্বারা এবং জনপদ গ্রামের দ্বারা বিভক্ত হচ্ছে। গ্রাম আবার বিভিন্ন বর্গের দ্বারা, মানুষ মুণ্ডের দ্বারা বিভক্ত হচ্ছে।

সর্বত্রই কেবল বিচ্ছিন্নতা। জাতীয় স্তরে বা সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি ক্রমশই কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে উচ্চাবচ স্তর-বিন্যাসের কারণে সামাজিক সংহতি বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রাচীন ভারতে চাতুর্বর্ণের উদ্ভাবন হয়েছিল সামাজিক সম্প্রীতির লক্ষ্যে। কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মের ভিত্তিতে বর্ণব্যবস্থা ব্যাহত হয়। বেদ-পরবর্তীকালে বংশানুক্রমিক বর্ণব্যবস্থা শুরু হতে থাকে। বর্তমানে ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়কে ঘৃণা করে। একইভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে, বৈশ্য শূদ্রকে এবং শূদ্র তারও নিম্নবর্ণের মানুষকে ঘৃণা করে।[৩৩] জাতিদ্রোহরূপ অনলে সন্তপ্ত দেশবাসীরা আজ নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের জন্য নিজেরাই নিহত হচ্ছে-

জাতিদ্রোহানলজ্বালাপরিতা রাষ্ট্রসন্ততিঃ।

সাম্প্রতং নিহতা জাতা স্বকীয়ৈরেব কল্মষৈঃ॥[৩৪]

অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মতো যৌতুকও একটি সামাজিক ব্যাধি। কবি যৌতুক-ব্যবস্থার নিন্দা করেছেন।[৩৫] বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রায়শই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ওঠে। চিকিৎসায় গাফিলতি, মৃতব্যক্তিকে জীবিত বলে তার ভুয়ো চিকিৎসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি প্রায়শই ঘটে থাকে। এরকম চিকিৎসকদেরকে কবি বিদ্রুপ করে বলেছেন-

বৈদ্যরাজ! নমস্তভ্যং যমরাজসহোদরঃ!

হরিষ্যতি যমঃ প্রাণাংস্তবাপীতি বিচিত্রকম্॥[৩৬]

অর্থাৎ হে বৈদ্যরাজ! হে যমের সহোদর! তোমাকে নমস্কার। অথচ তোমার প্রাণও একদিন যমই হরণ করবে। কী বিচিত্র!

অক্রোধী, সত্যবাদী, অহিংসাকারী, অনসূয়াপরায়ণ ব্যক্তি বর্তমান সমাজে দীর্ঘজীবি হন না। অর্থাৎ এই সমাজ তাঁদের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। এঁরা যথাযোগ্য সম্মান পান না। জীবন ধারণের সুষ্ঠু পরিবেশ পান না। এর পরিবর্তে বঞ্চক, কপট, ছল-চাতুর্যে পারঙ্গম মানুষই সুখ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে বেঁচে থাকে।[৩৭]

কর্মোদ্যমহীন মানুষ সর্বদা বিত্তবান মানুষকে হিংসা করে। তারা স্বকর্মে উৎসাহ পায় না। অথচ অন্যের সাফল্যে বিরক্ত হয়। রাজেন্দ্র মিশ্র মানুষের এরকম পরশ্রীকাতর মনোবৃত্তির নিন্দা করেছেন-

অক্ষমো নিতরাং দ্বেষী পরোৎকর্ষাবলোকনে।

সুযোধনায পাপায কলংকায নমো নমঃ॥[৩৮]

স্বকর্মে অনুদ্যমী মানুষ অসফলতার কারণরূপে ভাগ্যের নিন্দা করে। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র যাত্রার ক্ষেত্রে বিবিধ কুসংস্কার, রাশি বিচার, হস্তরেখা বিচার, মন্ত্র-তন্ত্র, সনাতন মেষবৃত্তি, ভক্ষ্যাভক্ষ প্রভৃতির উপরে অত্যধিক নির্ভরশীলতার বিরোধিতা করেছেন।[৩৯] তাঁর মতে মানুষকে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে অবিচল থাকতে হবে। তাতেই সাফল্য আসবে। তার জন্য ভাগ্য নয়, ধৈর্য ধারণ করে কর্ম করতে হবে।

কাব্যে সমাজ-চেতনার প্রকাশ বিভিন্ন ভঙ্গিতে হতে পারে, যেমন- বিভিন্ন গল্পের মোড়কে, সামাজিক সমোন্নতির উপদেশের মাধ্যমে অথবা নঞর্থক ভঙ্গিতে অর্থাৎ সরাসরি সামাজিক সমস্যাগুলির সমালোচনার মাধ্যমে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাশ্রিত আখ্যান, উপাখ্যানধর্মী কাব্যের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষার কথা বলা হয়ে থাকে। নীতি-উপদেশমূলক কাব্যে অনুসরণীয় কর্তব্যকর্মের উপদেশ দিয়ে এবং তৃতীয়টি শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাগুলি ব্যক্ত করা হয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর *অভিরাজসপ্তশতী* শতকসংগ্রহে তৃতীয় প্রকারে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ এখানে কবি সাম্প্রতিককালের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছেন। *নব্যভারতশতক, চতুর্থীশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, সম্বোধনশতক* এবং *মাতৃশতকের* অল্প পরিসরে হলেও কবি সমসাময়িক সামাজিক দিকগুলি তুলে ধরেছেন।

অন্ত্যটীকা

---

১. কাব্যপ্রকাশ ১. ২

২. সুভাষিতোদ্ধারশতক ১৪

৩. তদেব, ৭৩

৪. তদেব, ৩২

৫. নব্যভারতশতক ১৮, ২১-২৭

৬. তদেব, ৩২

৭. ন রাষ্ট্রং ধ্রিয়তে সৈন্যৈঃ ন চাপি নেতৃমণ্ডলৈঃ।
বিদ্যযা ধ্রিয়তে রাষ্ট্রং ধ্রিয়তে জ্ঞানরাশিভিঃ॥ তদেব, ৫৬

৮. তদেব, ৫০-৫৫

৯. তদেব, ৫৭

১০. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩০

১১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪. ৭, ৪. ৮

১২. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৫৪-৫৫

১৩. সম্বোধনশতক ৪৮-৪৯

১৪. নব্যভারতশতক ৬৯-৭০

১৫. সুভাষিতোদ্ধারশতক, ২৬

১৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪. ৩৭

১৭. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৫৬

১৮. হিতোপদেশ, প্রস্তাবনা শ্লোক ৪৩

১৯. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৬৭

২০. মনুসংহিতা ২. ১৩৬

২১. নব্যভারতশতক ৩০

২২. ক্বচিন্নাদ্রিয়তে বিদ্বান্ গীয়তে ন প্রশস্যতে।
ক্বচিন্নোত্থাপ্যতে বিদ্বান্ পূজ্যতে ন সমর্চ্যতে॥
সভাযাং পথি মেলাযাং বিদ্যাবেশ্মনি সদ্মনি।
সভাজ্যতে হি সাটোপং কেবলং কাঞ্চনাশ্রযঃ॥
বিপণৌ পণ্যকল্পাশ্চ ক্রেতুং হি তৃণসন্নিভা।
শক্যন্তে শ্রিতসৌভাগ্যৈঃ শ্রেষ্ঠিভির্নু বিপশ্চিতঃ॥ তদেব, ৪৭-৪৯

২৩. চতুর্থীশতক ১১

২৪. তদেব, ৮৮

২৫. নব্যভারতশতক ৩৮-৩৯

২৬. তদেব, ৬৪-৬৫

২৭. তদেব, ৭৩

২৮. তদেব, ৭৪

২৯. তদেব, ৭৬, ৮০

৩০. তদেব, ৮৬

৩১. হিতোপদেশ ১. ৭১

৩২. নব্যভারতশতক ৮৭, ৮৮

৩৩. ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিযশ্চাপি বৈশ্যকম্।
দ্বেষ্টি বৈশ্যোঽপি শূদ্রাখ্যং শূদ্রো দ্বেষ্টি নিজাবরান্॥ তদেব, ৮৯

৩৪. তদেব, ৯১

৩৫. দুরাগ্রহৰহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
মৌঢ্যঞ্চ বংশজাতানাং যৌতুকঞ্চাতিলক্ষকম্॥ সুভাষিতোদ্ধারশতক ১৭

৩৬. তদেব, ৪৬

৩৭. তদেব, ৮৪, ৮৫

৩৮. চতুর্থীশতক ৪০

৩৯. তদেব, ৬১-৭০

উপসংহার

উপসংহার

কবি তাঁর কাব্যে মনোরম শব্দার্থের দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপিত করেন। কাব্যের বাইরে থাকে শব্দ ও অর্থের রমণীয়তা, আর অভ্যন্তরে থাকে ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই গদ্যকাব্যের চেয়ে পদ্যকাব্যের ভাবময়তা কাব্যরসিকদের মনকে অধিক আকর্ষিত করে। আর তার চেয়েও স্বল্প পরিসরের এই মুক্তকশ্লোক থেকে অভিধাকে অতিক্রম করে এক লোকোত্তর আনন্দের অনুভূতি পাওয়া যায়। তাই বিভিন্ন শতককাব্যের সারগর্ভ শ্লোকগুলি কাব্যরসিকদের মনে আনন্দ বিধান করে। বর্তমান সময়ে শতককাব্য বা মুক্তককাব্যের বিষয়বস্তু বা শৈলীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হলেও রচনার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের বহুবিধ কাব্যপ্রতিভার মধ্যে মুক্তককাব্য বা শতককাব্য একটি অন্যতম। আধুনিক শতককারগণের মধ্যে রাজেন্দ্র মিশ্র নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর রচিত (একক ও সংগ্রহ) শতককাব্যের সংখ্যা অদ্যাবধি ষাটটিরও বেশি। *অভিরাজসপ্তশতীও* একটি শতকসংগ্রহ। তবে হালের *গাহাসত্তসঈ* বা গোবর্ধনের *আর্যাসপ্তশতীর* মতো এটি একক কাব্য নয়। অর্থাৎ হাল ও গোবর্ধনের সত্তসঈ বা সপ্তশতী সাতশো শ্লোকের একক সংকলন। আর *অভিরাজসপ্তশতী* হল সাতটি স্বতন্ত্র কাব্যের সংকলন।

আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে পাঁচটি অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীর* মূল্যায়ন করা হয়েছে। অধ্যায়-ভিত্তিক প্রাপ্ত গবেষণার বিষয়গুলি নিম্নরূপ।

প্রথম অধ্যায়ে মূলত শতককাব্যের সামান্য ধারণা প্রদান করা হয়েছে। প্রাচীন সমালোচকগণ শতককাব্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা- ভক্তিমূলক বা প্রশস্তিমূলক, প্রেমমূলক বা শৃঙ্গারমূলক এবং নীতি উপদেশমূলক শতককাব্য। কিন্তু কালক্রমে এই তিনটি ভাগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার কিছু শতককাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে। তাই এই গবেষণা-প্রবন্ধে সমস্ত শতককাব্যগুলির সুসংবদ্ধ শ্রেণী বিন্যাসের জন্য এগুলিকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- স্তোস্ত্রমূলক (Panegyric), নীতি উপদেশমূলক (Didactic), প্রেমমূলক (Erotic), বর্ণনামূলক (Narrative) এবং অন্যান্য (Miscellaneous) শতককাব্য। কিছু কিছু শতককাব্যে ভ্রমণ কাহিনী, বিভিন্ন তীর্থস্থানের বর্ণনা রয়েছে। এগুলিকে বর্ণনামূলক শতককাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার কিছু শতককাব্যে আয়ুর্বেদ, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধের

কবির নিজস্ব মত প্রভৃতি ব্যক্ত হয়েছে। এই শতককাব্যগুলিকে 'অন্যান্য' (Miscellaneous) ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিন্যাস ও রচয়িতা ভেদে কোষকাব্যের সঙ্গে শতককাব্যের পার্থক্য বিদ্যমান। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যের সঙ্গে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শতককাব্যের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে।

সংস্কৃত আলংকারিকগণের একাংশ মুক্তককাব্যকে হেয় করলেও তাঁরা মুক্তকবাব্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকগুলির সর্বজনগ্রাহ্য রসময়তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই স্বল্প পরিসরে তাঁরা যখন কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় কাব্যকে বিশেষিত করতে চেয়েছেন, তখনই বিভিন্ন শতককাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের ব্যক্তি-জীবন ও সারস্বত সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী- এই উভয়প্রকার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার দ্বারা দৃশ্য ও শ্রব্য- এই দুই শ্রেণীর কাব্যই পল্লবিত হয়েছে। তাঁর রচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে রয়েছে নাটক, একাঙ্ক রূপক, নাটিকা প্রভৃতি। শ্রব্যকাব্যের অন্তর্গত গদ্যকাব্যের মধ্যে রয়েছে কথা ও আখ্যায়িকা। পদ্যকাব্যের মধ্যে রয়েছে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিসংগ্রহ, গলজ্জলিকা (গজল) সংগ্রহ। এছাড়া রাজেন্দ্র মিশ্র বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, গবেষণার্থীগণের গবেষণায় তত্ত্বাবধান এবং *অভিরাজযশোভূষণ* শীর্ষক আলংকারিক গ্রন্থ রচনার দ্বারা ভাবয়িত্রী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীর* বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক, ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতকে* প্রতিবিম্বিত বিভিন্ন বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত বিশেষ বিশেষ দিকগুলি হল ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্রের গুরুত্ব ও সাম্প্রতিকালে সেগুলির উপযোগিতা, ধর্ম ভাবনা, সাহিত্য-সম্ভার, বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি, ভারতের ভূ-বৈচিত্র্য, ঋতুভেদে প্রকৃতিরাজ্যের বিবিধ পরিবর্তন, বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিত সহমর্মিতা প্রভৃতি। এই সংকলনে বর্তমান সময়ে সামাজিক, দেশীয় ও বিশ্বব্যাপী অরাজকতা, মানুষের স্বার্থপরতা প্রভৃতির নিন্দা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলির কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষাকর্ম। এই অধ্যায়ে আলোচ্য কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ-রীতি, রস ও ধ্বনির প্রেক্ষিতে কাব্যগুলির কাব্যমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অভিরাজসপ্তশতীতে প্রযুক্ত ছন্দোগুলি হল অনুষ্টুভ, উপজাতি, বসন্ততিলক, শার্দূলবিক্রীড়িত, তোটক, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, বংশস্থবিল, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, শিখরিণী এবং দণ্ডক।

অভিরাজসপ্তশতীতে প্রযুক্ত অলংকারগুলির মধ্যে অর্থালংকারই প্রধানরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। শব্দালংকার হিসেবে একমাত্র অনুপ্রাসের প্রয়োগ আছে। *অভিরাজসপ্তশতীতে* ব্যবহৃত অর্থালংকারগুলি হল উপমা, রূপক, উল্লেখ, পরিসংখ্যা, অনুকূল, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি, বিষম, অর্থাপত্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, কাব্যলিঙ্গ, প্রতিবস্তূপমা, তুল্যযোগিতা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি।

অভিরাজসপ্তশতীতে প্রযুক্ত গুণগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসাদগুণের ব্যবহার দেখা যায়। অনেক শ্লোকে মাধুর্যগুণের প্রয়োগও রয়েছে, কিন্তু তুলনায় খুবই কম। আবার *প্রভাতমঙ্গলশতক* ও *ভারতদণ্ডকে* ওজোগুণের বাহুল্য রয়েছে। একইভাবে রীতির ক্ষেত্রে পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী রীতিই এখানে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

অভিরাজসপ্তশতীর মুখ্যরস হল শান্ত। এই সংকলনের অন্তর্গত কাব্যগুলিতে সর্বাধিক শান্তরসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতের প্রাচীন গৌরব, স্বনামধন্য প্রাচীন রাজন্যবর্গ, ঋষি, দেবপত্নী, ঋষিপত্নী, মহাপ্রাণের চরিত, ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ, তীর্থস্থান, মনোরম পর্যটন ক্ষেত্র, মানুষের ভাষা-খাদ্য-সংস্কৃতি-বাসস্থানগত বৈচিত্র্য প্রভৃতির বর্ণনায় শান্তরসের অন্তর্ভাব ঘটেছে। শান্তরস ছাড়াও হাস্য, করুণ, বীর ও অদ্ভুতরসের প্রয়োগ দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় হল *অভিরাজসপ্তশতীর* সামাজিক মূল্যবিচার। তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, মানবিকতা প্রভৃতি দিকগুলি। *নব্যভারতশতক, চতুর্থীশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক* এবং *সম্বোধনশতকে* রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, স্বার্থপরতা, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, শিক্ষার অবনতি, উৎকোচের দ্বারা কার্যসিদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য, পারস্পরিক সহমর্মিতার অভাব, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি অর্জন, পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ, পণপ্রথা, জ্ঞানী ব্যক্তির অনাদর প্রভৃতি সমস্যাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

কবির বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তাঁর পরিবারে সর্বদাই সংস্কৃত শিক্ষার অনুকূল বাতাবরণ ছিল। এছাড়া পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই আদ্যাপ্রসাদের হাত ধরে কবির সংস্কৃত বিষয় অবলম্বনে উচ্চশিক্ষা শুরু হয়। এই পরিবেশ কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের সংস্কৃত কাব্যরচনার সহায়ক হয়েছিল। *মাতৃশতকের* অন্তিম অংশে (১০৩ নং শ্লোক) স্বয়ং কবি নিজেকে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় সংস্কৃত কবিগণের উত্তরসূরি বলে ঘোষণা করেছেন-

সংসারেঽজনি কালিদাসসুকবির্ভূত্বা য আদৌ ধ্রুবং
শ্রীহর্ষস্য ততোঽভিধামুপযযৌ বৈদর্ভবাচস্পতেঃ।
পশ্চাদ্যো জযদেববিগ্রহধরোভূদ্ বিহ্লণোঽনন্তরং
সোঽযং পণ্ডিতরাজদেহিনিলযো রাজেন্দ্রমিশ্রোধুনা॥

ছন্দো প্রয়োগ: *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত বিবিধ ছন্দের মধ্যে সর্বাধিক অনুষ্টুভের প্রয়োগ দেখা যায়। কবি সম্ভবত কাব্যের অহেতুক কাঠিন্য পরিহার করার জন্য অনতিদীর্ঘ এবং গেয় ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একক ছন্দে, যুগ্ম ছন্দে এবং মিশ্র ছন্দে বিরচিত অনেক শতককাব্য পাওয়া যায়। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধের অন্তর্গত *নব্যভারতশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* এবং *ভারতদণ্ডক* একক ছন্দে নিবদ্ধ শতককাব্য। অন্যদিকে *মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক* এবং *সম্বোধনশতক* মিশ্র ছন্দে বিধৃত শতককাব্য। তবে *সম্বোধনশতকের* মতো এত ছন্দো-বৈচিত্র্যের উদাহরণ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। কেবলমাত্র *সম্বোধনশতকেই* কবি রাজেন্দ্র মিশ্র দশটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। ছন্দোগুলি যথাক্রমে- উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, বংশস্থবিল, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক, বসন্ততিলক, মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত এবং শিখরিণী।

অলংকার প্রয়োগ: শব্দালংকারের যথেচ্ছ প্রয়োগ একাধারে যেমন কাব্যকে দুরূহ করে তোলে, অন্যদিকে এর যথাযথ ব্যবহার কাব্যের চমৎকারিত্বের পরিপোষক হয়। আবার শব্দালংকাহীন কাব্যও কাব্যরসিকগণের কাছে উপাদেয় নয়। *অভিরাজসপ্তশতীতে* শব্দালংকারের তেমন একটা প্রয়োগ দেখা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুপ্রাসের প্রয়োগ রয়েছে। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* সমাসবাহুল্য থাকলেও সেক্ষেত্রেও শব্দালংকারের উৎকৃষ্ট প্রয়োগ নেই।

অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগও কবির এই কাব্যগুলিতে দেখা যায় না। অর্থাৎ অনুপ্রাসের প্রয়োগে রসোত্তীর্ণ শ্লোকও তেমন একটা দেখা যায় না। *অভিরাজসপ্তশতীতে* উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, প্রতিবস্তূপমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অর্থালংকারগুলি ছাড়াও পরিসংখ্যা, বিষম, অর্থাপত্তি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম প্রসিদ্ধ অর্থালংকারগুলির প্রয়োগও দেখা যায়। তবে প্রাচীন ও অর্বাচীন শতককাব্যগুলিতে শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে অলংকার প্রয়োগে তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

গুণ ও রীতির প্রয়োগ: প্রসাদ ও মাধুর্যগুণের প্রয়োগে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলির সারল্য অক্ষুন্ন থাকলেও মাধুর্যগুণের যে সহৃদয়শ্লাঘ্য রসময়তা, তা এক্ষেত্রে অনেকাংশেই বিরল। শতকগুলিতে মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দাবলির প্রয়োগে মাধুর্যগুণের উদাহরণ অনেক রয়েছে। রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। *অভিরাজসপ্তশতীতে* পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। *প্রভাতমঙ্গলশতক* ও *ভারতদণ্ডকে* ওজোগুণের প্রয়োগ রয়েছে।

রসের প্রয়োগ: *অভিরাজসপ্তশতীর* মুখ্যরস হল শান্তরস। এছাড়া বীর, হাস্য, করুণ ও অদ্ভুতরসের প্রয়োগও দেখা যায়। শতককাব্য বা মুক্তককাব্য সাধারণত একক রসের দ্বারা বিন্যস্ত থাকে। মুক্তককাব্যের শ্লোক যেহেতু পরস্পর স্বতন্ত্র, তাই রসোপলব্ধির জন্য পূর্বাপর কোনো শ্লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। তাই শতককাব্যে গৌণরসের ব্যাপার থাকে না। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে একাধিক রসের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন *নব্যভারতশতকে* ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য, খ্যাতকীর্তি রাজাদের বর্ণনা, ভারতের প্রাচীন জ্ঞানবৈভব প্রভৃতির প্রশংসায় কবি শান্তরসের প্রয়োগ করেছেন। আবার ভারতের বর্তমান দুরবস্থা, মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কথা স্মরণ করে কবি ব্যথিত হয়েছেন। ফলে এখানে করুণরসের অভিব্যক্তি ঘটেছে। *মাতৃশতকে* কবি স্বীয় মাতা ও ভারতীয় সভ্যতায় প্রাতঃস্মরণীয়া মাতৃবর্গের স্তুতি করেছেন। এখানেও শান্তরসের অন্তর্ভাত ঘটেছে। অন্যদিকে কবির পিতৃ-বিয়োগের পরে সাংসারিক সমস্ত দায়ভার নির্বাহের জন্য স্বীয় মাতা অভিরাজী দেবীর কঠিন পরিশ্রমের বর্ণনাচ্ছলে ব্যথিত কবি করুণ রসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

সামাজিক গুরুত্ব: কাব্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই যেকোনো কাব্যে সমকালের ছাপ রয়ে যায়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সর্বদাই সমাজ সম্পর্কে সচেতন। তাঁর দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যেও বিভিন্ন সমসাময়িক সমস্যা স্থান পেয়েছে। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

রাজনীতি: স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ, গড়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও তার অন্তর্ভাব দেখা যায়। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যা, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখ কবির দৃশ্যকাব্যে, নাট্যে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতির প্রতিবাদ করা হয়েছে। কবি রাজেন্দ্র মিশ্রও স্বকীয় ভঙ্গিতে রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলের স্বার্থপরতা, চৌর্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির নিন্দা করেছেন। বর্তমান রাজনীতির কদর্যতাকে কবি এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর কাব্য পাঠ করতে করতে পাঠকগণ অনুভব করবেন যেন তাদেরই পারিপার্শিকের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলিকে চাক্ষুষ করছেন। অশিক্ষিত, কর্মোদ্যমহীন, অর্থলিপ্সু মানুষের রাজনীতিতে প্রবেশ এবং তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজ তথা দেশের ক্ষতি সাধন প্রভৃতি *অভিরাজসপ্তশতীতে* স্থান পেয়েছে।

শিক্ষা: শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিও এই সমাজের এক বড় সমস্যা। কবি একাধারে যেমন শিক্ষার প্রতি ছাত্রসমাজকে আগ্রহী করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে বর্তমান শিক্ষার ক্রমশ অনতির সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। কবি শিক্ষার প্রতি যুবসমাজের অনিহা, বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতি অবহেলা, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের দ্বারা বেষ্টিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতির কথা বার বার বলেছেন।

সংস্কৃতি: ভারতীয়দের একটি বড় সমস্যা হল আত্ম-অবমাননা। ঔপনিবেশিকতার প্রভাব ভারতীয়গণের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতীয়রা ভাবতে শিখেছে, যা কিছু আধুনিকতা, যা কিছু যুক্তিসঙ্গত, তার সমস্ত কিছুই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে রয়েছে। তাদের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। কবি তাঁর শতককাব্যগুলিতে জাতীয় সংস্কৃতির এই অভাবকে তুল্ ধরেছেন। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কবি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য অনুকরণমোহের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সমস্ত বিষয়কে নির্ভুল বলে প্রমাণ করতেও চান নি। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রগুলিতে প্রতিফলিত বিধানগুলির সময়োপযোগি ব্যবহারের পক্ষপাতি। তাঁর দৃষ্টিতে মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র

প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব। কবি বস্তুত প্রাচীনতা ও আধুনিকতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধ: সমাজ ব্যবস্থা, জাতীয়তাবোধ, পারস্পরিক সম্প্রীতি তথা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের মূলে রয়েছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধের দ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষ দেখে জগৎ ও জীবনকে। তাই কবি *অভিরাজসপ্তশতীতে* মূল্যবোধের প্রতি জোর দিয়েছেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎকোচ প্রদান, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, জিঘাংসা, চৌর্য, কপটতা, ছল, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতির নিন্দার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধনের চেষ্টা করেছেন।

রাজেন্দ্র মিশ্র *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে সমসাময়িক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলির সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিরসনের উপায়রূপে কবির কোনো সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না। একই সামাজিক সমস্যা বিভিন্ন শতককাব্যে প্রায় একই রকম ভাষায় বারংবার উক্ত হয়েছে। ফলে একই বিষয়ের পুনরুক্তি ঘটেছে।

কবি নিজের পারিবার সম্বন্ধে সচেতন। তিনি *নব্যভারতশতকের* ৯৪ নং শ্লোকে এবং মাতৃশতকের অনেকাংশ জুড়ে বাল্যকালে পিতৃ-বিয়োগ, বিকলাঙ্গ ভ্রাতা সুরেন্দ্রের কথা, মাতা অভিরাজীর কঠোর আত্মোৎসর্গের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। মাতৃশতক তথা অন্যান্য কাব্যগুলিতে অভিরাজী দেবীর উল্লেখ প্রসঙ্গে কবির মাতৃভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি নিজ বংশগৌরব সম্বন্ধেও অত্যন্ত সচেতন।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিগনির্দেশ: *অভিরাজসপ্তশতীর* কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনার ভূমিকা অংশে পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে হয়েছে যে, এই গবেষণা-প্রবন্ধে কেবল কাব্যগুলির ছন্দো, অলংকার, গুণ-রীতি, রস ও ধ্বনির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিশদ গবেষণার ক্ষেত্রে এই কাব্যগুলির বক্রোক্তিবাদ, ঔচিত্যবাদ পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

কাব্যে ব্যবহৃত ভাষার মূল্যায়ন একটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয়। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলির ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা যেতে পারে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র প্রণীত শতককাব্যের সংখ্যা অনেক। শতককাব্য সম্বন্ধে উৎসাহী গবেষকগণ তাঁর অন্যান্য শতককাব্যগুলি অবলম্বনে গবেষণা করতে পারেন। এছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য অবলম্বনে গবেষণা করা যেতে পারে।

বঙ্গপ্রদেশেও কিছু আধুনিক শতককাব্য রচিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল- শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রণীত *সারস্বতশতক*, রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্যের *বিদ্যাশতক*, শ্রীশ্বর বিদ্যালংকার প্রণীত *শক্তিশতক* ও *সূর্যশতক*, কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম রচিত *দেবীশতক*, নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের *গণেশশতক*, *চৈতন্যশতক* এবং *ওঙ্কারনাথশতক*, মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির *ভগবচ্ছতক* ইত্যাদি। বঙ্গপ্রদেশের কবিগণের বিষয়ে আগ্রহী গবেষকগণ এই শতককাব্যগুলি অবলম্বনেও গবেষণাকার্য করতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জি

অগ্নিপুরাণম্। সম্পা. বলদেব উপাধ্যায়। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০০৫ (তৃতীয় সংস্করণ)।

অথর্ববেদ। সম্পা. গঙ্গাসহায় শর্মা। নিউ দিল্লী: সংস্কৃত সাহিত্য প্রকাশন, ২০১৫।

অমরু। *অমরুশতকম্*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬।

আনন্দবর্ধন। *ধ্বন্যালোকঃ*। সম্পা. পট্টাভিরাম শাস্ত্রী। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৪০।

অবতারকবি। *ঈশ্বরশতকম্*। সম্পা. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত, বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী। কাব্যমালা সিরিজ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

উদ্ভট। *কাব্যালংকারসারসংগ্রহ*। সম্পা. নারায়ণ দাস বনহট্টি। পুনা (পুনে): ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯২৫।

উপনিষদ সমগ্র। সম্পা. জগদীশ শাস্ত্রী। দিল্লী: মোতিলাল বনারসীদাস, ২০১৭ (সপ্তম পুনর্মুদ্রণ; প্রথম সংস্করণ ১৯৭০)।

উপাধ্যায়, বলদেব। *সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস*। শারদা নিকেতন, বারাণসী ২০০১।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (প্রথম ভাগ)। সম্পা. সুধাকর মালব্য। বারাণসী (বেনারস): বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

ঋগ্বেদ-সংহিতা (চতুর্থ ভাগ), নবম ও দশম মণ্ডল। সম্পা. এন্. এস্. সোনটক্কে, সি. জি. কাশীকার। পুনা (পুনে): বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, ১৯৪৬।

—। সম্পা. ধর্মেন্দ্র কুমার, প্রদ্যুম্ন চন্দ্র। নিউ দিল্লী: দিল্লী সংস্কৃত অকাদেমী, ২০১৩।

কাংকর, নারায়ণ। *অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতী*। রাজস্থান (ত্রিপোলিয়া বাজার, জয়পুর): রমেশ বুক ডিপো, ১৯৮৭।

কাব্যমালা (চতুর্থ গুচ্ছক)। সম্পা. দুর্গার্সাদ শাস্ত্রী, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৭ (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)।

—, (প্রথম গুচ্ছক)। সম্পা. দুর্গার্সাদ শাস্ত্রী, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৯ (তৃতীয় সংস্করণ)।

কালিদাস। *কুমারসম্ভবম্*। সম্পা. নারায়ণ রাম আচার্য। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৫৫।

কালিদাস। *শ্রুতবোধ*। সম্পা. নারায়ণ পণ্ডিত, ব্রজরত্ন ভট্টাচার্য। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৯।

কুন্তক। *বক্রোক্তিজীবিতম্*। সম্পা. সুশীলকুমার দে। ক্যালকাটা (কলকাতা): ফার্মা কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পাবলিশার, ১৯৬১।

কেদারভট্ট। *বৃত্তরত্নাকর*। সম্পা. কেদারনাথ শর্মা। বেনারস: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৫৪।

গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলিকাতা (কলকাতা): সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪ (দ্বাদশ পরিমার্জিত সংস্করণ)।

গোকুলনাথ। *শিবশতকম্*, কাব্যমালা সিরিজ (তৃতীয় খণ্ড)। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৯৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

গোবর্ধন। *আর্যাসপ্তশতী*। সম্পা. বিষ্ণু প্রসাদ ভাণ্ডারী, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত। বেনারস: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৫।

—।—। সম্পা. পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৪।

চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। *কাব্য-মীমাংসা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০।

ছান্দোগ্যোপনিষদ। সম্পা. গঙ্গানাথ ঝা। পুনা (পুনে): ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৪২।

জগন্নাথ। *রসগঙ্গাধর*। সম্পা. মথুরানাথ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪৭ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

জয়দেব। *গীতগোবিন্দম্*। সম্পা. মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলং, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৯৯।

জয়দেব। *চন্দ্রালোক*। সম্পা. নন্দিকেশোর শর্মা। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৬০।

ঝা, বিষ্ণুকান্ত। *সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতকম্*। ঝাড়খণ্ড (বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর): বন্দনা প্রকাশন, ২০০৬।

ঝা, মহেশ। *শ্রীচণ্ডিকাশতকম্*। বিহার (কলায়তন, শাস্ত্রীনগর, মুঙ্গের): ভগবতী প্রকাশন, ১৯৯১।

—, —। *বসন্তশতকম্*। বিহার (বেকাপুর, মুঙ্গের): ন্যাশনাল্ কমার্সিয়াল ইন্সটিটিউট, ২০১০।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্। সম্পা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কলিকাতা (কলকাতা): বাপটিষ্ট মিশন প্রেস, ১৮৭১।

দণ্ডী। *কাব্যাদর্শ*। সম্পা. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা (কলকাতা): পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫।

দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *কাব্য-বিচার*। কলিকাতা (কলকাতা): মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১৯৩৯।

দাস, শ্রীধর। *সদূক্তিকর্ণামৃত*। সম্পা. রামাবতার শর্মা। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১২।

ধনঞ্জয়। *দশরূপক*। সম্পা. বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৭।

_, *দশরূপক*। সম্পা. রবিকান্ত মণি। রাজস্থান (জয়পুর): রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সাহিত্য কেন্দ্র, ২০২১।

ধোয়ী। *পবনদূতম্*। সম্পা. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। কলিকাতা (কলকাতা): সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯২৬।

নায়ক, প্রমোদকুমার। *দারিদ্র্যশতকম্*। কলিকাতা (কলকাতা): কথাভারতী, ২০১৩।

পানিণীয় শিক্ষা। সম্পা. কমলাপ্রসাদ পাণ্ডে। বারাণসী (বেনারস): বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০০৩।

পিঙ্গল। *ছন্দঃসূত্র*। সম্পা. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। কলিকাতা (কলকাতা): গণেশ প্রেস, ১৮৭৬।

বোপদেব। *বোপদেববৈদ্যশতকম্*। সম্পা. ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস। মুম্বই: ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৯৬।

ভরত। *নাট্যশাস্ত্রম্*। সম্পা. রবিশংকর নাগর, কে. এল জোশী। দিল্লী: পরিমল পাবলিকেশন, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ)।

--। -- (প্রথম ভাগ)। সম্পা. রামকৃষ্ণ কবি, রামস্বামী শাস্ত্রী। বরোদা: ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, ১৯৫৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

--। -- (প্রথম ভাগ)। সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা (কলকাতা): নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪ (ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০)।

ভর্তৃহরি। *ভট্টিকাব্যম্*। সম্পা. বিনায়ক নারায়ণ শাস্ত্রী, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২০ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

ভর্তৃহরি। *শতকত্রয়*। যূথিকা ঘোষ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

ভবভূতি। *উত্তররামচরিত*। সম্পা. টি. আর. রত্নম. আইয়ার, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ভামহ। *কাব্যালংকার*। সম্পা. সি. শংকররাম শাস্ত্রী। শ্রীবালমনোরমা সিরিজ নং ৪, মহীশূর (মাদ্রাজ): বালমনোরমা প্রেস, ১৯৫৬।

ভোজ। *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* । সম্পা. কেদারনাথ শর্মা, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মনুসংহিতা। সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা: ১৯৯৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. বামনাচার্য রামভট্ট ঝালকীকার। নিউ দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০২১ (পুনর্মুদ্রণ)।

ময়ূরভট্ট। *সূর্যশতকম্*। সম্পা. ত্রিভুবন পাল। দিল্লী: মোতিলাল বনারসীদাস. ১৯৮৩ (পুনর্মুদ্রণ)।

—। —। সম্পা. ভুবনেশ্বর কর। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ২০০৪।

মিশ্র, রাজেন্দ্র। *অকিঞ্চনকাঞ্চনম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭৪।

—, —। *অভিরাজযশোভূষণম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৬।

—, —। *অভিরাজসপ্তশতী*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৭।

—, —। *অরণ্যানী*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৯৯।

—, —। *আর্যান্যোক্তিশতকম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭৬।

—, —। *চতুষ্পথীয়ম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৩।

—, —। *ধর্মানন্দচরিতম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৯৩।

—, —। *নবাষ্টকমালিকা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭৬।

—, —। *নাট্যনবগ্রহম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৬।

—, —। *নাট্যনবরত্নম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৬।

—, —। *নাট্যনবার্ণবম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০১০।

—, —। *নাট্যপঞ্চগব্যম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭২।

—, —। *নাট্যপঞ্চামৃতম্*। এলাহাবাদ: অক্ষয়বট প্রকাশন, ১৯৭৭।

—, —। *নাট্যসপ্তপদম্*। দিল্লী: ইস্টার্ন বুক লিঙ্কার্স, ১৯৯৬।

—, —। *পরাম্বাশতকম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮২।

—, —। *প্রমদ্বরা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৬১।

—, —। *প্রশান্তরাঘবম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৮।

—, —। *মধুপর্ণী*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০০।

—, —। *মৃদ্বীকা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৫।

—, —। *রূপরূদ্রীয়ম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৬৩।

—, —। *বাগ্বধূটী*। এলাহাবাদ: অক্ষয়বট প্রকাশন, ১৯৭৮।

—, —। *বামনাবতরণম্*। এলাহাবাদ: অক্ষয়বট প্রকাশন, ১৯৯৪।

—, —। *বিদ্যোত্তমা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৯২।

—, —। *শতাব্দীকাব্যম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৭।

—, —। *শ্রুতিম্ভরা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

—, —। *সমীক্ষাসৌরভম্*। বারাণসী (বেনারস): সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

যাস্ক। *নিরুক্তম্* (তৃতীয় ভাগ)। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলতাকা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ; প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫)।

রবীন্দ্রনাথ। *কাহিনী*। কলিকাতা (কলকাতা): বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) ১৯৭৩।

রসিকানন্দ মুরারী। *শ্যামানন্দশতকম্*। গোপাল গোবিন্দানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ): গৌরাব্দ ৫০০ (খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৬)।

রুদ্রট। *কাব্যালংকার*। সম্পা. পণ্ডিত রামদেব শুক্লা। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৫।

বাণভট্ট। *চণ্ডীশতকম্*। সম্পা. ফতহ সিংহ। রাজস্থান (যোধপুর): রাজস্থান প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৮।

বাণভট্ট। *হর্ষচরিত*। সম্পা. রঙ্গনাথ শাস্ত্রী। অনন্তশয়ন সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ১৮৭। কেরল: কেরলা বিশ্ববিদ্যালয়, শকাব্দ ১৮৮০ (খ্রিস্টাব্দ ১৯৫৮)।

বামন। *কাব্যালংকারসূত্র*। সম্পা. হরগোবিন্দ শাস্ত্রী। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৫।

বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ*। সম্পা. যোগেশ্বরদত্ত শর্মা পরাশর। দিল্লী: নাগ পাবলিশার্স প্রথম খণ্ড ১৯৯৯। দ্বিতীয় খণ্ড ২০০০। চতুর্থ খণ্ড ২০০০।

বিশ্বেশ্বর। *অলংকারকৌস্তুভ*। শিবদত্ত, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৯৮।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ। সম্পা. কুপ্পুস্বামি শাস্ত্রী। আলমোড়া: অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৫০ (তৃতীয় সংস্করণ)।

শতপথব্রাহ্মণ। সম্পা. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়। দিল্লী: মহালক্ষ্মী পাবলিশিং হাউস, ১৯৭০।

শর্মা, কেশবরাম। *শতকচতুষ্টয়ম্*। হিমাচল প্রদেশ: মনীষিমণ্ডল প্রকাশন, ২০০৫।

শুক্লা, নলিনী। *বাণীশতকম্*। উত্তরপ্রদেশ (কানপুর): কৃষ্ণা প্রেস, ১৯৯৬।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অনু. ভাবঘনানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার। সম্পা. জ্যোতিভূষণ চাকী, তারাপদ ভট্টাচার্য, রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীধর্মপাল। কলিকাতা (কলকাতা): নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

হাল। *গাহাসত্তসঈ*। সম্পা. জগন্নাথ পাঠক। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৯।

—, —। সম্পা. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। কলিকাতা (কলকাতা): জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ...

হেমচন্দ্র। *কাব্যানুশাসন*। সম্পা. শিবদত্ত, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০১।

ক্ষেমেন্দ্র। *সুবৃত্ততিলকম্*। সম্পা. বেদপ্রকাশ ডিণ্ডোরিয়া। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০২২।

Kane, P. V. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi: Motilal Banarsidass, 2002 (4th Edition, Reprint).

The Subhāṣitaratnakoṣa, Eds. D. D. Kosambi, V. V. Gokhle. Harvard University Press, 1957.

Sharma, Narayan. *The Hitopodeśa*. Ed. M.R. Kale. Delhi: Motilal Banararidass 2004 (6th Edition, Reprint).

Keith, A.B. *A History of Sanskrit Literature*. London: Oxford University Press, 1953 (Reprint; First Edition 1920).

Katyayana. *Sarvānukramanī of The Rgveda*. Ed. A.A Macdonell. entitled Vedārthadīpikā with Critical notes and appendices. Oxford University Press, 1886.

De, S.K. *History of Sanskrit Literature: Prose, Poetry and Drama.* Calcutta (Kolkata): University of Calcutta, 1947.

Dasgupta, S.N and De, S.K. *A History of Sanskrit Literature: Classical Period.* Delhi: Motilal Banarsidass, 2017 (First Published: University of Calcutta, 1947).

শতককাব্য বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ:

The Sanskrit Poems of Mayūra. Ed. A.V. Williams Jackson. Columbia University, 1917.

Ramamurti K.S. *Śatakas in Sanskrit Literature.* Sri Venkateshwar University Journal, vol-I, 1958.

Bhattacharji, Sukumari. *A survey of Śataka Poetry.* Sahitya Akademi Journal, vol. 23, No. 5, 1980.

Chakraborty, Aparna. *A Critical Study of Govardhana's Āryāsaptaśatī.* University of Burdwan, 1982.

Paraddi, M.B. *Satak in Sanskrit Literature.* Karnataka University, 1983.

রাই, নারায়ণ। *গাথাসপ্তশতী অউর বিহারী সতসই: প্রেরণা অউর প্রভাব সাম্য কী দৃষ্টি সে তুলনাত্মক অধ্যয়ন*। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

মণ্ডল, রণবীর। *হালের গাথাসপ্তশতী: একটি সমীক্ষা*। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

মিশ্র, রুদ্রনারায়ণ। *শ্রীজগন্নাথসম্বন্ধানাং শতককাব্যানাং সমীক্ষণম্*। তিরুপতি: রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ২০১৬।